# হেমেন্দ্র
# কুমার রায়
# রচনাবলী

প্রথম প্রকাশ ঃ
আষাঢ় ১৭, ১৩৮৩
জুলাই ১, ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ
শ্রাবণ ১২, ১৩৮৩
জুলাই ২৮, ১৯৭৬
তৃতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৫, ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর ১, ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
চতুর্থ মুদ্রণ
বৈশাখ ১, ১৩৮৯
এপ্রিল ১৫, ১৯৮২
পঞ্চম মুদ্রণ
আষাঢ় ৩০, ১৩৮৯
জুলাই ১৫, ১৯৮২

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বাঁধাই
মালক্ষ্মী বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অলংকরণ
সুব্রত ত্রিপাঠী

দাম
ত্রিশ টাকা

# হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

আমার বয়স তখন বারো-তেরো বছর, গল্পের বই পড়তে ভালবাসি। বারো-মাসের বাঁধানো 'মৌচাক' পেলাম হাতে; পড়তে শুরু করলাম 'যখের ধন'। 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকে শুরু করে ইতিমধ্যে অনেক বই পড়েছিলাম, কিন্তু এমন গল্প আর পড়িনি। একদিনেই গল্পটি শেষ করি, কিন্তু করালী ও কঙ্কালের কথাটা মনের মধ্যে জেগে থাকে—আজও আছে। তখনই শিখেছিলাম লেখক ধরে বই পড়তে হয়। তাই লেখকের নামটাও মনে রেখেছিলাম—হেমেন্দ্রকুমার রায়। পরে দোকানে তাঁর অন্য বই খুঁজেছিলাম কিন্তু তখন পাইনি, পেয়েছিলাম পরে, যখনই তাঁর লেখা যে বই পেয়েছি পড়েছি, আজও পেলে পড়ি।

একখানি উপন্যাসে ছোটদের মন এমনভাবে জয় করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁর সে গুণ থাকে তিনি প্রতিভাবান এবং তাঁর রচনাও কালজয়ী। ছোটদের সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমারও সেইভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

হেমেন্দ্রকুমারকে প্রথম দেখি সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে। বি.এ. পাস করেছি' কিছু কিছু গল্প ও প্রবন্ধ লিখছি। বিদেশী ফিল্ম সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে একটা প্রবন্ধ লিখলাম। তখনকার দিনের সিনেমা-থিয়েটারের সেরা সাময়িকী ছিল 'নাচঘর', সম্পাদনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, লেখাটি দিতে গেলাম তাঁর কাছে।

সকাল দশটা হবে। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের উপর পশ্চিমমুখী একখানি পুরানো বাড়ি। নম্বর মিলিয়ে কড়া নাড়তেই একটি ছোট মেয়ে এসে বললো—দাঁড়ান, বাবা এখনি বেরুবেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক উজ্জ্বল-শ্যাম শৌখীন ভদ্রলোক, পরনে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো দিশি-কাপড়, পায়ে চকচকে নিউকাট জুতো, মাথায় সিঁথির দুপাশে ঢেউ খেলানো চুল, একবারে কলকাতার পুরানো বনেদী চালের মানুষ। নমস্কার করতেই বললেন—কি চাই?

—নাচঘরের জন্য একটা লেখা এনেছিলাম।

—দিয়ে যাও।

লেখাটি নিয়ে শিরোনামটি দেখলেন, প্রথম কয়েকটি লাইন পড়ে নিলেন পথে দাঁড়িয়েই, তারপর বললেন—তোমার লেখা? বেশ, পড়ে দেখবো, ভাল লাগলে ছাপা হবে। আরেক দিন এসো, আমি এখন একটু কাজে বেরুচ্ছি।

সেদিন ছিল সোমবার, সেই শুক্রবারের নাচঘরে দেখি লেখাটির অর্ধেক ছাপা হয়েছে, বাকি অর্ধেক পরের সংখ্যায় ছাপা হবে।

লেখা দিয়েছিলাম, ছাপা হয়ে গেল। আরেকটা লেখা না হওয়া অবধি আর তাঁর কাছে যাওয়ার কারণ নেই এবং অকারণে বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের কাছে যাবার ভরসাও আমার ছিল না। কাজেই এই প্রথম সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় উত্তীর্ণ হলো না দীর্ঘকাল। ইতিমধ্যে 'নাচঘর' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

হেমেনদা'র সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হলো আরো কয়েক বছর পরে।

আমার তখন তিন-চারখানি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস বেরিয়েছে। সব কয়খানি অ্যাডভেঞ্চারের বই। খেয়াল হলো অ্যাডভেঞ্চারের অদ্বিতীয় লেখক হেমেন্দ্রকুমারের একখানা 'সার্টিফিকেট' যোগাড় করতে হবে। ঠিকানা যোগাড় করলাম। বাগবাজারের গঙ্গার ধারের এক ঠিকানা। বাড়িটি এক সরু গলির মধ্যে। নিচে চাকর ছিল, বললো—বরাবর তিনতলায় উঠে যান।

তিনতলায় উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সামনে গঙ্গা, একেবারে বালিপুল অবধি দেখা যায়। সেই বারান্দার শেষ অংশটা ঘরের মতো ঘেরা, সেখানে টেবিল-চেয়ারে হেমেন্দ্রবাবু বসে লিখছেন, অতি সাধারণ মানুষ, গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই। বললেন—বসো।

একখানি ছোট বেঞ্চি ছিল, বসলাম। বইখানি দিলাম, উদ্দেশ্যও বললাম। হেসে বললেন—তোমার লেখা আমি পড়েছি। তুমি কাল এসো, দু-চার লাইন আমি লিখে দেবো।

দেখলাম লিখছেন, তাই বেশিক্ষণ আর বসলাম না। চলে এলাম।

পরদিন বিকালে আবার গেলাম। মনে হলো আমার জন্যই যেন তিনি বসে আছেন, গঙ্গার পানে তাকিয়ে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন, বললেন—বলো, কি লিখে দেবো?

—আমি আপনাকে বলবো আপনি লিখবেন!

—কি লিখলে তুমি খুশী হবে?

—আপনি যা লিখে দেবেন, তাতেই হবে।

একখানি পুরানো ডায়েরি খুলে তার এক পাতায় তিনি কয়েক লাইন লিখলেন, তারপর পাতাখানি ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। পড়ে দেখলাম আমার লেখার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

হেসে বললেন—তোমার লেখার মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তবে সে কথা বললে তোমাদের উপর অবিচার করা হবে। তোমাদের বয়স কম, সবে লিখতে শুরু করেছো, যত নজর তৈরি হবে, নিজের লেখার দোষ-ত্রুটি ততো নিজেরই নজরে পড়বে। সেইটাই দরকার। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার প্রথম বইটা তুমি আফ্রিকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছ, ওটা সাহেবদের পক্ষে চলতে পারে। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে রাজ্য করছে, আমাদের তো সে সুযোগ নেই। আমাদের দেশের মধ্যেই তোমাকে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে নিতে হবে, তাতে সারা দেশের সঙ্গে ছোটরা পরিচিত হবে, দেশের কথাও জানবে। আর তার সঙ্গেই দেবে দেশপ্রেম, ছোটরা যেন এই দেশের মানুষ বলে গর্ব করতে পারে। তাতে তোমার লেখা ভালো হোক আর না-হোক, যারা পড়বে তাদের চরিত্র ও আদর্শ তৈরি হবে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের উদ্দেশ্যই হলো, দুঃসাহসী দৃঢ় চরিত্রের ছেলেমেয়ে গড়ে তোলা।

এই কথাগুলির মধ্যে দিয়েই সেদিন হেমেনদা'র মানসিকতা আমার কাছে ধরা পড়েছিল।

হেমেন্দ্রকুমার প্রথম জীবনে বয়স্কদের জন্য লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর পায়ের ধুলো, ফুলশয্যা, ঝড়ের যাত্রী, জলের আল্পনা, পাঁকের ফুল, মণি-কাঞ্চন, মালাচন্দন প্রভৃতি উপন্যাস ইতিপূর্বেই বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। ওমরখৈয়াম-এর অনুবাদও তাঁকে কবিখ্যাতি দিয়েছিল। তাছাড়া তিনি বহু গান লিখে নিজে সুর দিয়েছিলেন। নাট্যাচার্য শিশির-কুমার ভাদুড়ির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, বহু নাটকের নৃত্য পরিকল্পনা হেমেন্দ্রকুমারের। তার উপর মঞ্চ ও সিনেমা সম্পর্কিত পত্রিকা 'নাচঘরের' তিনি সম্পাদনা করতেন। সে-যুগের নাম-করা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তাছাড়া তিনি ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি ছিলেন আর্ট স্কুলের পাস-করা ছাত্র।

এই খ্যাতির পরে যখন তিনি একাগ্র মনে শিশু-সাহিত্য রচনায় নামলেন,

যে সাহিত্যে পয়সা পাওয়া যায় অতি অল্প, তখন যে তিনি একটা আদর্শের জন্যই সেই দিকে এসেছিলেন, এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর শিশু-সাহিত্য করে গেছেন সেই উদ্দেশ্যেই,—এ সম্পর্কে কোন ভিন্নমত থাকার কথা নয়। তাঁর সেই আদর্শবাদের কথাই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন আমার কাছে, তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের আলাপে।

সেই আলাপ থেকেই হেমেন্দ্রকুমার আমার কাছ হেমেনদা হয়ে গেলেন।

হেমেন্দ্রকুমারের আসল নাম হলো প্রসাদ রায়। কবে ও কিজন্য নাম বদলে হেমেন্দ্রকুমার হয়ে তিনি সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করলেন তা আমার জানা নেই।

আমি তখন এক ইস্কুলে শিক্ষকতা করতাম উত্তর-কলকাতার প্রান্ত সীমায়। শনিবার বেলা দু'টোয় ছুটি হতো, তারপর বেলা তিনটা নাগাদ ফেরার পথে মাঝে মাঝে যেতাম হেমেনদা'র বাড়ি। বাড়িতে তখন কেউ থাকত না, শুধু হেমেনদা ও এক ভৃত্য। হেমেনদা'র পত্নীবিয়োগ হয়েছিল কয়েক বছর আগেই, তারপর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, দুটি ছেলেই অবিবাহিত এবং তাদের দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা কাটে খেলার মাঠে। কাজেই তিনতলায় হেমেনদা আর একতলায় ভৃত্য। বরাবর তিনতলায় উঠে গিয়ে যখন গঙ্গার ধারে বসতাম, হেমেনদা সিগারেট খেতে খেতে দু-চার কথা বলতেন। তখন বালি-ব্রিজ অবধি গঙ্গার পানে তাকিয়ে থাকতাম। অপূর্ব এক স্নিগ্ধতায় দেহ-মন হালকা হয়ে যেত, ঘণ্টা দুয়েকের আগে আর উঠতে মন চাইত না। হেমেনদাও বলতেন—বসো বসো, এখন আর তোমার ব্যস্ততা কিসের? গঙ্গার হাওয়া ভাল লাগছে না?

কাজেই বসতে হতো।

হেমেন্দ্রকুমার জীবনের শেষ দিকে বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। চিরদিনের মজলিশী মানুষ, সমবয়সী কবি ও লেখকদের মধ্যে মেলামেশা ছিল খুবই। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজলিশ ভেঙে গেল। একা হয়ে পড়লেন। মাঝে মাঝে মৌচাক কার্যালয়ে যেতেন, সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে বসে গল্প করতেন, আরো দু'একজন বন্ধু আসতেন, প্রাক্তন মজলিশের রেশ কিছুটা তখন পাওয়া যেতো। কিন্তু সে তো আর নিয়মিত ছিল না। সাহিত্যিক জীবনে সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো সমবয়সীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সমধর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন নিঃসঙ্গতা সাহিত্যিককে বিষণ্ণ করে তোলে।

শুধু বই পড়া আর বই লেখা সব সময় তো ভাল লাগে না। হেমেন্দ্রকুমারের শেষ জীবনে এই নিঃসঙ্গতা অনিবার্য হয়েই দেখা দিয়েছিল।

হেমেন্দ্রকুমার প্রথম জীবনে কয়েক বছর চাকরিও করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব একটা সংগ্রহশালা ছিল। তিনতলার দু'খানি ঘর ভরতি ছিল দুষ্প্রাপ্য বই, নানা মূর্তি ও কিছু বিশিষ্ট চিত্রকরের আঁকা ছবি। শিল্পকলা সম্পর্কে এমন সব বই ছিল, যা এদেশে দুর্লভ।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশক বাংলা শিশু-সাহিত্যে একটা গৌরবের যুগ। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় প্রমুখ লেখকেরা ছড়া, কবিতা, রূপকথা, ঐতিহাসিক গল্প ও সামাজিক গল্প রচনা করে সব দিক থেকে শিশু-সাহিত্য পুষ্ট করে তুলেছেন, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার গল্পের অভাব ছিল। সেই দিকে প্রথম আবির্ভূত হলেন ১৩৩০ সালে 'মৌচাক' মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় হেমেন্দ্রকুমার, তাঁর রোমাঞ্চকর উপন্যাস 'যখের ধন' রচনায়। একটা নতুন দিকের তিনি উদ্বোধন করলেন, শিশুমহলে সাড়া পড়ে গেল।

তারপর লিখলেন, 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন'।

পরের বছর 'ময়নামতীর মায়াকানন।'

সরল সহজ রচনায় রোমাঞ্চ ও রহস্য জমিয়ে তোলার তাঁর অসামান্য দক্ষতা তখনই স্বীকৃতি পেল। হেমেন্দ্রকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্যসাধারণ রচনাশৈলী সম্পর্কে আর দ্বিমত রইল না।

হেমেন্দ্রকুমার সেই থেকে শিশু-সাহিত্যিকই হয়ে গেলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছোটদের জন্যই লিখলেন।

ডক্টর আশা দেবী এই রচনাশৈলী সম্পর্কে লিখছেন—"ভাষার সাহিত্যিক সৌন্দর্য এবং গল্প জমাইয়া তুলিবার কুশলতায় হেমেন্দ্রকুমার যেন শিশুরাজ্যে এইচ. জি. ওয়েলস এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের দ্বৈতভূমিকা গ্রহণ করলেন। বর্তমান বাংলা শিশু-সাহিত্যে গোয়েন্দা-কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চারের সাহিত্যের পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার এবং পরিণত বার্ধক্যেও এখনো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন।"

আমি এর সঙ্গে আরো দু'টি লেখকের নাম যুক্ত করতে চাই, তাঁরা হলেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও এডগার এলেন পো। এই চারজন বিদেশী লেখক

রচনার যে মাধুর্যের জন্য আজ সারা বিশ্বের পাঠক-সমাজে শ্রদ্ধেয় এবং আদৃত হেমেন্দ্রকুমারের রচনা তাঁদের কারও চেয়ে কোন দিকে ন্যূন নয়।

প্রবীণ লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রসঙ্গতঃ লিখেছেন—"বাংলার শিশু-সাহিত্যে কত সাহিত্যিক কত রকমের 'অ্যাডভেঞ্চার' করেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সম্ভব অসম্ভব বহুদেশ ঘুরেছেন, বহু সম্ভব অসম্ভব কর্মে পাঠক-পাঠিকাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ কর্মে সম্রাটের আসন দেওয়া হয় হেমেন্দ্র-কুমার রায়কে।...অ্যাডভেঞ্চারের দিকে হেমেন্দ্রকুমারের যা দান তাকে পথিকৃতের দান বললেও ভুল হয় না। কারণ, তাঁরই পাশাপাশি সমসাময়িক আরও অনেকে বাংলার শিশু-সাহিত্যকে এই দিকে সমৃদ্ধ করতে তৎপর হন, সম্ভবতঃ তাঁরই রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে।...একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে, হেমেন্দ্রকুমারের রচনার অত্যধিক জনপ্রিয়তার মূলে কি ছিল—উপজীব্য অথবা রচনাশৈলী? আমাদের মত উভয়ই। কিন্তু উপজীব্যগুলি যে সব সময় তাঁর আশপাশ থেকে সংগৃহীত হতো, এমন কথা বলা যায় না। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক মহানগরের নাগরিক ছিলেন। তার প্রভাব মানসিকতায় থাকাই স্বাভাবিক যা থেকে অনেকেই মুক্ত নন।

হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন রক্ষণশীল। তার রচনায় আদর্শ-বিচ্যুতির সামান্য ইঙ্গিতও প্রকাশ পায় না। সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সংশোধনবাদ বা কোন রকমের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বাদানুবাদ তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে, এমন কিছু তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি।"

হেমেন্দ্রকুমারের কোন রচনাতেই সমকালীন কোন মতবাদের বাদানুবাদের যে কোন ইঙ্গিত নেই, ছোটদের কাছে ছোটদের মতো মন নিয়ে সরলভাবে যে তিনি গল্প বলে গেছেন এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে—
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"

সাহিত্যে সমকালীন যুগচিন্তার ইঙ্গিত থাকলে যুগচিন্তা যখন ভিন্ন ধারায় বইতে শুরু করে তখন সে সাহিত্যের মূল্যমানও হ্রাস পায়। হেমেন্দ্রকুমারের রচনায় সে ভয় নেই। তাঁর বই এক যুগ থেকে আরেক যুগের পাঠক-পাঠিকা অনায়াসে পড়বে ও আনন্দ আহরণ করবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে লেখককে সহজ ও সরল হবার কথাটাই বলেছেন : "সহজ হওয়ার সাধনা শিল্পীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনা ও সবচেয়ে কঠিন সাধনা। এই সাধনায় উৎরাতে পারলে তবেই শিল্পী বস্তুর ও ঘটনার প্রাণের রঙ ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাঁর সৃষ্টিতে।" হেমেন্দ্রকুমার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সাধনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর কোন নায়ক কোন বড় কথা নিয়ে কোন সময়েই বাক্‌জাল সৃষ্টি করেনি। কিশোর-মন নিয়েই তিনি কিশোরদের জন্য গল্প লিখতেন। পরিণত বয়সে এই কিশোর-মনের পর্যায়ে নেমে আসা মোটেই সহজ নয়, সবাই এ কাজটা পারে না, সে জন্য বয়স্ক-সাহিত্য যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেকে শিশু-বা কিশোর-সাহিত্য লিখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

রসোত্তীর্ণ কিশোর-সাহিত্যের পাঠক শুধু ছেলেমেয়েই নয় তাদের অভিভাবকেরাও। বিশিষ্ট ইংরাজ সমালোচক লিউইস্ সাহেব লিখেছেন : No book is really worth reading at the age of ten, which is not equally (and often far more) worth reading at the age of fifty.

এই দু'শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দিতে পারলেই শিশু-সাহিত্য দীর্ঘদিনের সার্থকতা লাভ করে, বয়স্ক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না, তা শুধু একটি শ্রেণীর জন্যই।

নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শ সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার এক চিঠিতে লিখেছেন : "মানুষ হয়েছি আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাম্রাজ্যের মধ্যেই।...সাহিত্য-মার্গে একমাত্র তাঁকেই বিরাট আদর্শের মতন, দ্যুতিমান ধ্রুবতারার মতন সামনে রেখে পথ চলার চেষ্টা করেছি। শক্তির দীনতার জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি, তবু ত্যাগ করিনি তাঁকে অনুসরণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা।" হেমেন্দ্র-কুমারের সেই চেষ্টা যে সাফল্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এবং বহুকাল দীপ্যমান থাকবে সে সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নেই।

হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার গল্পগুলি সব বয়সের পাঠক-পাঠিকার মন ভোলায়, তার একটা সর্বকালীন রূপ রয়ে গেছে।

হেমেন্দ্রকুমারের ছোটদের জন্য প্রায় শতাধিক বই আছে। তার মধ্যে সবই যে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তা নয়, ভূতের গল্পও আছে, ঐতিহাসিক গল্পও আছে, এবং হাসির গল্পও আছে।

যখের ধন, আবার যখের ধন, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর, পদ্মরাগ বুদ্ধ, ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন, নীলসায়রের অচিনপুরে, নৃমুণ্ড শিকারী, যক্ষপতির রত্নপুরী, সুর্যনগরীর গুপ্তধন, হিমাচলের স্বপ্ন, রত্নপুরের যাত্রী, বজ্রভৈরব মন্ত্র, মোহনপুরের শ্মশান, বিশালগড়ের দুঃশাসন, সোনার আনারস, আফ্রিকার সর্পদেবতা, ফিরোজা মুকুট রহস্য, ময়নামতির মায়াকানন প্রভৃতি হেমেন্দ্রকুমারের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

যাদের নামে সবাই ভয় পায়, অমাবস্যার রাত, রাত্রে যারা ভয় দেখায়, ভূত আর অদ্ভুত, ভয় দেখান ভয়ানক প্রভৃতি হেমেন্দ্রকুমারের ভৌতিক গল্পের বই।

পঞ্চনদীর তীরে, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে, হে ইতিহাস গল্প বল, ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে প্রভৃতি হেমেন্দ্রকুমারের ঐতিহাসিক গল্প।

বিদেশী কয়েকখানি বইয়ের তিনি ভাবানুবাদও করেছিলেন: অদৃশ্য মানুষ, আজব দেশে অমলা, কিংকং, মানুষের গড়া দৈত্য, জেরিনার কণ্ঠহার প্রভৃতি।

তিনি কিশোরদের জন্য হাসির গল্পও লিখেছিলেন—দেড়শো খোকার কাণ্ড। এই গল্পটি পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

হেমেন্দ্রকুমারের গল্প সংকলনও আছে: সব সেরা গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, গল্প সঞ্চয়ন, ভালো ভালো গল্প ও কিশোর সঞ্চয়ন।

এই তালিকার বাইরেও আরো বই আছে। সব আমার মনে নেই।

কোন লেখকের সব লেখা সমভাবে চিত্তাকর্ষক হয় না। হেমেন্দ্রকুমারের ক্ষেত্রেও তা সত্য, তবে, তাঁর কোন লেখা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না, এইটাই তাঁর সম্পর্কে বড় কথা। এবং এই জন্য বাংলা কিশোর-সাহিত্যে তাঁর নাম চিরদিনের স্মরণীয়।

বর্তমানে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির শ্রীমৃণাল দত্ত হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর-রচনার সমগ্র সংগ্রহ সংকলন করার উদ্যোগী হয়েছেন। ছোটদের কাছে এই বই মহা উপাদেয় হবে—আনন্দসৃষ্টির এক মহা উৎস। প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে, এটি দ্বিতীয় খণ্ড। এতে অ্যাডভেঞ্চার, ভূতের গল্প, ছড়া-কবিতা ছাড়াও হেমেন্দ্রকুমারের স্মৃতিকথা রয়েছে। এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। বইগুলি দেখে আজ শুধু একটা কথাই মনে উঠে, আমাদের ছেলেবেলায় যদি এই সব লেখা এমনভাবে ছাপিয়ে বাঁধিয়ে আমাদের হাতে কেউ দিত! কিন্তু সে বয়সে আর তো ফেরা যায় না!

কলকাতা
৭/৭/৭৬

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

## এক

### খবরের কাগজের রিপোর্ট

"বঙ্গদেশ" হচ্ছে একখানি সাপ্তাহিক পত্র। তাতে এই খবরটি বেরিয়েছে—

'সুন্দরবনের নিকট মানসপুর। মানসপুরকে একখানি বড়সড়ো গ্রাম বা ছোটখাটো শহর বলা চলে। কারণ সেখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বসবাস।

সম্প্রতি মানসপুরের বাসিন্দারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে সেখানে এক অলৌকিক বিভীষিকার আবির্ভাব হয়।

আসল ব্যাপারটা যে কি, কেহই সেটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে না। পুলিশ প্রাণপণে তদন্ত করিয়াও বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। গ্রামের চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়াছে। বন্দুকধারী সিপাহীরা সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথাপি প্রতি অমাবস্যার রাত্রে মানসপুর হইতে এক-একজন মানুষ অন্তর্হিত হয়।

আজ এক বৎসর কাল ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। গত বারোটি অমাবস্যার রাত্রে বারোজন লোক অদৃশ্য হইয়াছে। প্রতি দুর্ঘটনার রাত্রেই একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ করা গিয়াছে। মানসপুর সুন্দরবনের কাছাকাছি হইলেও, তাহার ভিতরে এতদিন ব্যাঘ্রের উৎপাত বড়ো-একটা ছিল না। কিন্তু দুর্ঘটনার আগেই এখন ঘটনাস্থলের চারিদিকে ঘন ঘন ব্যাঘ্রের চীৎকার শোনা যায়। ঠিক অমাবস্যার রাত্রি ছাড়া আর কোনোদিনেই এই অদ্ভুত ব্যাঘ্রের সাড়া পাওয়া যায় না! এ ব্যাঘ্র যে কোথা হইতে আসে এবং কোথায় অদৃশ্য হয় কেহই তা জানে না। আজ পর্যন্ত কেহই তাকে চোখে দেখে নাই।

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যারা অদৃশ্য হইয়াছে তাদের মধ্যে একজনও পুরুষ নাই! প্রত্যেকেই স্ত্রীলোক এবং প্রত্যেকেরই গায়ে ছিল অনেক টাকার গহনা।

পুলিশ প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, এ-সমস্ত অনিষ্টেরই মূল হইতেছে কোনো নরখাদক ব্যাঘ্র। কিন্তু নানাকারণে পুলিশের মনে এখন অন্যরকম সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সুন্দরবনের ভিতরে আছে ভুলু-ডাকাতের আস্তানা এবং তার দল ও-অঞ্চলে প্রায়ই অত্যাচার করিয়া থাকে। অনেক চেষ্টা ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও পুলিশ আজ পর্যন্ত ভুলু-ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিশের বিশ্বাস, মানসপুরের সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য ঐ ভুলু-ডাকাতই দায়ী।

কে যে দায়ী এবং কে যে দায়ী নয়, এ-কথা আমরা জানি না বটে, কিন্তু এটা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানসপুরের দুর্ঘটনার মধ্যে

আশ্চর্য কোনো রহস্য আছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষ না হইলে এ-সব ব্যাপারকে হয়তো ভুতুড়ে কাণ্ড বলিয়া মনে করিতাম। ডাকাত করে ডাকাতি, ঠিক অমাবস্যার রাত্রেই চোরের মতোন আসিয়া তারা কেবল এক-একজন স্ত্রীলোককে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে কেন? আর এই ব্যাঘ্র রহস্যটাই বা কি? এ কোন্ দেশী ব্যাঘ্র। এ কি পাঁজি পড়িতে জানে? পাঁজি-পুঁথি পড়িয়া ঠিক অমাবস্যার রাত্রে মানসপুরের আসরে গর্জন-গান গাহিতে আসে? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?'

## দুই

### বাঘার বিপদ

খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কুমার নিজের মনেই বললে, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব, আমি।... 'বঙ্গদেশ'-এর রিপোর্টার ঠিক আন্দাজ করেছেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে—হ্যাঁ, আশ্চর্য কোনো রহস্য! উপরি-উপরি বারোটি মেয়ে অদৃশ্য, অমাবস্যার রাত, অদ্ভুত বাঘের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, তার ওপরে আবার ভুলু-ডাকাতের দল। কারুর সঙ্গে কারুর কোনো সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক কাণ্ড।...এ-সময়ে বিমল যদি কাছে থাকত! কিন্তু আজ সাত আট দিন ধরে রামহরিকে নিয়ে সে যে কোথায় ডুব মেরে আছে, শিবের বাবাও বোধ হয় তা জানেন না!'

একখানা পঞ্জিকা নিয়ে তার ভিতরে চোখ বুলিয়ে কুমার আবার ভাবতে লাগল, 'হুঁ, পরশু আবার অমাবস্যার রাত আসবে, মানসপুর থেকে হয়তো আবার এক অভাগী নারী অদৃশ্য হবে! আমার যে এখনি সেখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! এমন একটা 'অ্যাড্‌-ভেঞ্চার'-এর সুযোগ তো ছেড়ে দিলে চলবে না, বিমলের কপাল খারাপ, তাই নিজের দোষেই এবারে সে ফাঁকে পড়লো, আমি কি করবো?...বাঘা, বাঘা!'

বাঘা তখন ঘরের এককোণে ব'সে একপাল মাছির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করছিলো। মাছিদের ইচ্ছা, বাঘার গায়ের উপরে তারা মনের আনন্দে খেলা করে বেড়ায়, কিন্তু তার দেহটা যে মাছিদের বেড়াবার জায়গা হবে, এটা ভাবতেও বাঘা রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলো। বড়ো-বড়ো হাঁ-করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে এক-একবারে একাধিক মাছিকে গ্রাস করে ফেলছিলো—কিন্তু মাছিরাও বিষম নাছোড়বান্দা, প্রাণের

আয়া ছেড়ে ভন্ ভন্ ভন্ ভন্ করতে করতে বাঘার মাথা থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত বার-বার তারা ছেয়ে ফেলছিলো। যে-বাঘা আজ জলে-স্থলে-শূন্যমার্গে কত মানব, দানব ও অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে, বিমল ও কুমারের সঙ্গে যার নাম এই বাংলাদেশে বিখ্যাত, তুচ্ছ একদল মক্ষিকার আক্রমণ আজ তাকে যেরকম কাবু করে ফেলেছে তা দেখলে শত্রুরও মায়া হবে! এমনি সময়ে কুমারের ডাক শুনে সে গা ও ল্যাজ ঝাড়তে ঝাড়তে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কুমার বললে, 'বাছা বাঘা! বিমলও নেই রামহরিও নেই—খালি তুমি আর আমি! অমাবস্যার রাত, বাঘের গর্জন, ডাকাতের দল, মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য! শুনে কি তোমার ভয় হচ্ছে?'

বাঘা কান খাড়া করে মনিবের সব কথা মন দিয়ে শুনলে। কি বুঝলে জানি না, কিন্তু বললে, 'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

—'বাঘা, এ বড়ো যে-সে ব্যাঘ্র নয়, বুঝেছো? এ তোমার চেয়েও চালাক! এ তিথি-নক্ষত্র বিচার করে কাজ করে! এর সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারবো কি?'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'

—'তার ওপরে আছে ভুলু-ডাকাতদের দল। পুলিশও তাদের কাছে হার মেনেছে, খালি তোমাকে আর আমাকে তারা গ্রাহ্য করবে কি?'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ!'—বলেই বাঘা টপ্ করে মুখ ফিরিয়ে ল্যাজের ডগা থেকে একটা মাছিকে ধরে গপ্ করে গিলে ফেললে!

একখানা খাম ও চিঠির কাগজ বার করে কুমার লিখতে বসলো,—

'ভাই বিমল,

একবার এক জায়গা থেকে দলে দলে মানুষ অন্তর্হিত হচ্ছিল শুনে সে ব্যাপারটা আমরা দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেই

কৌতূহলের ফলে বন্দী হয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল পৃথিবীর ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে।

এবারেও মানসপুরে মানুষের পর মানুষ ( কিন্তু কেবল স্ত্রীলোক ) অদৃশ্য হচ্ছে। শুনেই আমার চড়্‌ চড়্‌কে পিঠ আবার সড়্ সড়্ করছে। আমি আর বাঘা তাই ঘটনাস্থলে চললুম। জানি না এবারেও আমাদের আবার পৃথিবী ছাড়তে হবে কি না!

খবরের কাগজের রিপোর্টও এই খামের ভিতরে দিলুম। এটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারলুম না। আসছে পরশু অমাবস্যা, আজ যাত্রা না করলে যথাসময়ে মানসপুরে গিয়ে পৌঁছতে পারবো না।

বিমল, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। এবারের 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এ তুমি বেচারি ফাঁকে পড়ে গেলে। কি আর করবে বলো, যদি প্রাণ নিয়ে ফিরি, আমার মুখে সমস্ত গল্প শুনো তখন। ইতি—

তোমার

কুমার'

## তিন

### পটলবাবু, চন্দ্রবাবু ও মোহনলাল

পরদিন কুমার মানসপুরে গিয়ে হাজির হলো।

সেখানে তখন ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

আসছে কাল সেই কাল-অমাবস্যা আসছে এবং সেই অজানা শত্রু কাল আবার কোন্ পরিবারে গিয়ে হানা দেবে কেউ তা জানে না। সকলে এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে, ধনীরা বাড়ির চারিদিকে ডবল করে পাহারা বসাচ্ছে, সাধারণ গৃহস্থদের কেউ কেউ সপরিবারে স্থানান্তরে পালাচ্ছে এবং কেউ কেউ বাড়ির মেয়েদের গ্রামান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে—কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি কেবল মেয়েদের দিকেই।

শহরের যুবকরা নানা স্থানে "পল্লী-রক্ষা-সমিতি" গঠন করেছে এবং কি ক'রে এই আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তাই নিয়ে তাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা ও তর্কাতর্কির অন্ত নেই।

চারিদিকে এখন থেকেই সরকারী চৌকিদারের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ।

কুমার আগে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মানসপুরের অবস্থাটা ভালো করে দেখে নিলে।

অধিকাংশ স্থানেই একটি লোকের মূর্তি বার বার তার চোখে পড়লো।

সে-লোকটি খুব সপ্রতিভ ও ব্যস্তভাবেই সর্বত্র ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, এবং কোন্ দিক দিয়ে বিপদ আসবার সম্ভাবনা, সে-সম্বন্ধে "পল্লী-রক্ষা-সমিতি"র যুবকগণকে নানান রকম পরামর্শ দিচ্ছে।

একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে কুমার জানলে যে, তাঁর নাম পটলবাবু। ধনী না হলেও গাঁয়ের একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা মাতব্বর ব্যক্তি এবং "পল্লী-রক্ষা-সমিতি"র প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু পটলবাবুর চোখে কুমার এমন একটি বিশেষত্ব আবিষ্কার করলো, যা সে আর কোনো মানুষের চোখে দেখেনি।

পটলবাবুর গায়ের রং মোষের মতো কালো, তাঁর দেহখানি লম্বায় খুব খাটো কিন্তু আড়ে বেজায় চওড়া, মাথায় ইস্পাতের মতোন চকচকে টাক, কিন্তু ঠোঁটের উপরে ও গালে জানোয়ারের মতো বড়ো-বড়ো চুল—যেন তিনি বিপুল দাড়ি-গোঁফের দ্বারা মাথার কেশের অভাবটা পূরণ করে নিতে চান!

কিন্তু পটলবাবুর চেহারার মধ্যে আসল দ্রষ্টব্য হচ্ছে তাঁর দুই চোখ! পটলবাবুর হাত-পা খুব নড়ছে, তাঁর মুখ অনবরত কথা কইছে, কিন্তু তাঁর চোখদুটো ঠিক যেন মরা-মানুষের চোখ! শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিট্-মিট্ করে তাকিয়ে দেখছে—পটলবাবুর চোখ দেখে এমনি-একটা ভাবই কুমারের মনকে নাড়া দিতে লাগলো।

চারিদিকে দেখে-শুনে কুমার, মানসপুর থানার ইন্‌স্পেক্টর চন্দ্রবাবুর সন্ধানে চললো। কলকাতাতেই সে খবর পেয়েছিলো যে, চন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে সে একসঙ্গে অনেককাল ধরে পড়াশুনা করেছিলো। অশোক এখন কলকাতায়। কিন্তু এখানে আসবার আগে সে বুদ্ধি করে অশোকের কাছ থেকে চন্দ্রবাবুর নামে নিজের একখানি পরিচয়-পত্র আনতে ভোলেনি। কারণ সে বুঝেছিলো যে মানসপুরের রহস্য সমাধান করতে হলে চন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই সব চেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

থানায় গিয়ে সে নিজের পরিচয়-পত্রখানি ভিতরে পাঠিয়ে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই তার ডাক এলো।

চন্দ্রবাবু তখন টেবিলের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর বয়স হবে পঞ্চান্ন, বেশ লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মূর্তি, মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল,—দেখলে পুরাতন পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হয় না।

কুমারকে দেখেই চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে তার একখানি হাত ধরে বললেন, 'তুমিই অশোকের বন্ধু কুমার? এই বয়সে তুমি এত নাম কিনেচো? তোমার আর তোমার বন্ধু বিমলের অদ্ভুত সাহস আর বীরত্বের কথা শুনে আমি তোমাদের গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়েছি। এসো, এসো, ভালো করে বোসো—ওরে চা নিয়ে আয় রে!'

কুমার আসন গ্রহণ করলে পরে চন্দ্রবাবু বললেন, 'তার পর। হঠাৎ এখানে কি মনে করে? নতুন 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'-এর গন্ধ পেয়েছো বুঝি?'

কুমার হাসতে হাসতে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

চন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময়, বড়োই আশ্চর্য! জীবনে এমন সমস্যায় কখনো পড়িনি! কে বা কারা এ-রকম ভাবে মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে? বাঘ? না ভুলু-ডাকাতের দল? সবাই সাবধান হয়ে আছে, চারিদিকে কড়া পাহারা, তার ভিতর থেকেই বারো-বারোটি মেয়ে চুরি গেলো, অথচ চোর ধরা পড়া দূরের কথা—তার টিকিটি পর্যন্ত কারুর চোখে পড়লো না। এও কি সম্ভব?—ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়িয়েছে, আমার চাকরি বুঝি আর টেকে না! আসছে কাল অমাবস্যা, আমিও সেজন্যে যতটা-সম্ভব প্রস্তুত হয়ে আছি,—কাল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো! কিন্তু কালও যদি চোর ধরতে না পারি, তা হলে আমার কপালে কি আছে জানি না—উপরওয়ালারা নিশ্চয়ই ভাববেন, আমি একটি প্রকাণ্ড অপদার্থ!'

কুমার শুধোলে, 'অমাবস্যার রাতে ঠিক কোন্ সময়ে মেয়ে চুরি যায়, তার কি কিছু স্থিরতা আছে?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ-ব্যাপারের সবটাই আজগুবি! বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য বাঘটি শুধু পাজি-পুঁথি পড়তেই শেখেনি,—কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে কাজ করতেও শিখেছে! প্রতিবারেই ঠিক রাত দুপুরের সময়ে তার প্রথম চীৎকার শোনা যায়।'

—'কিন্তু এ বাঘটা কি সত্যিই আসল বাঘ, না, সবাইকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্যে কোনো 'হরবোলা', মানুষ অবিকল বাঘের ডাক নকল করে ?'

—'সে-সন্দেহ করবারও কোনো উপায় নেই। প্রতিবারেই বাঘের অগুন্তি পায়ের দাগ আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

কুমারের চা এলো। চা পান করতে করতে নীরবে সে ভাবতে লাগলো।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'রহস্যের উপর রহস্য! আজ দিন-কয় হলো মানসপুরে কে-একজন অচেনা লোক এসে বাসা বেঁধেছে; তাকে সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু সে যে কে, তা কেউ জানে না! লোকটার সমস্ত ব্যবহারই সন্দেহজনক! এখানকার মুরুব্বি পটলবাবু বলেন, নিশ্চয়ই সে ভুলু-ডাকাতের চর! আপাতত ইচ্ছা থাকলেও আমরা তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ-খবর নিতে পারছি না, কারণ এই মেয়ে-চুরির হাঙ্গামার জন্যে আমার আর কোন দিকেই ফিরে তাকাবার অবসর নেই। তবে তার ওপরেও কড়া পাহারা রাখতে আমি ভুলিনি।'

কুমার বললে, 'লোকটার নাম কি ?'

—'মোহনলাল বসু। শুনলুম, সে কোথাকার জমিদার, এখানে এসেছে বেড়াতে। যদিও এখানে সমুদ্রের হাওয়া বয়, কারণ খানিক তফাতেই সমুদ্র আছে,—কিন্তু এটা কি বেড়াতে আসবার জায়গা, বিশেষ এই বিভীষিকার সময়ে?···তার পর শুনলুম সে কাল গাঁয়ের অনেকের কাছে গল্প করে বেড়িয়েছে যে, তার বাড়িতে নাকি নগদ অনেক হাজার টাকা আছে! এমন বোকা লোকের কথা কখনো শুনেছো ? আশপাশে প্রায়ই ভুলু-ডাকাত হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা জেনেও এ-কথাটা প্রকাশ করতে কি তাঁর ভয় হলো না?··· ভুলু-ডাকাতের কানে এতক্ষণ মোহনলালের টাকার কথা গিয়ে পৌঁচেছে, আর পটলবাবুর সন্দেহ যদি ভুল হয়, অর্থাৎ মোহনলাল

যদি ভুলু-ডাকাতের চর না হয়, তাহলে আসছে কাল অমাবস্যার গোলমালে ভুলু যে তার বাড়িতে হানা দেবে, এটা আমি মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি।'

খানিকক্ষণ চিন্তিতভাবে নীরব থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এখন বুঝেছো, আমি কিরকম মুশ্‌কিলে ঠেকেছি? একেই এই মেয়ে-চুরির মামলা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, তার ওপরে কাল ঐ মোহনলালের বাড়ির আনাচে-কানাচেই আমাকে রাত কাটাতে হবে, কারণ শ্রীমান ভুলু-বাবাজী কাল হয়তো দয়া করে ওখানে পায়ের ধুলো দিলেও দিতে পারেন।'

কুমার বললে, 'চন্দ্রবাবু, আপনি আমার একটি কথা রাখবেন?'

—'কি কথা? তুমি যখন অশোকের বন্ধু তখন তুমি আমারও ছেলের মতো। সাধ্যমতো আমাকে তোমার আব্‌দার রাখতে হবে বৈকি!'

কুমার বললে, 'যতদিন-না এই মামলার কোনো নিষ্পত্তি হয়, ততদিন আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবেন কি?'

চন্দ্রবাবু খুব খুশিমুখে বললেন, 'এ কথা আর বলতে? তোমার মতোন সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে তো আমি বর্তে যাই! তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তাহলে আমি হয়তো খুব শীঘ্রই এ-মামলাটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারবো।'

## চার

### আধুনিক ব্যাঘ্র

অমাবস্যার রাত!

নিঝুম রাত করছে ঝাঁ ঝাঁ, নিরেট অন্ধকার করছে ঘুট ঘুট!

তার ওপরে বিভীষিকাকে আরো ভয়ানক করে তোমার জন্যেই যেন কালো আকাশকে মুড়ে আরো-বেশি-কালো মেঘের পর মেঘের সারি দৈত্যদানবের নিষ্ঠুর সৈন্যশ্রেণীর মতো শূন্যপথে ধেয়ে চলেছে, দিশেহারা হয়ে!

মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করে বিদ্যুতের পর বিদ্যুৎ জ্বলে জ্বলে উঠছে—সে যেন জ্বালামুখী প্রেতিনীদের আগুন-হাসি!

বন জঙ্গল, বড়ো-বড়ো গাছপালাকে দুলিয়ে, ধাক্কা মেরে নুইয়ে দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে কারা যেন পৃথিবীময় পাগলের কান্না কেঁদে ছুটে ছুটে আর মাথা কুটে কুটে বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে!

…মানসপুর যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। সেখানে যে ঘরে ঘরে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হাতে করে সজাগ হয়ে বসে আছে, বাহিরে থেকে এমন কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না!

…খুব-উঁচু একটা বটগাছের ডালে বসে কুমার নিজের রেডিয়মের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে আর মোটে দশ মিনিট দেরি আছে!

বন্দুকটা ভালো করে বাগিয়ে ধরে কুমার গাছের ডালের উপরে যতটা-পারে সোজা হয়ে বসলো। সে নিজেই এই গাছটা পছন্দ করে নিয়েছে। যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয়, তাই তার জন্যে চন্দ্রবাবু গাছের নিচেই এক চৌকিদারকে মোতায়েন রেখেছেন।… এই গাছ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট দূরেই সেই নির্বোধ মোহনলালের

বাসাবাড়ি। চন্দ্রবাবু নিজেও কাছাকাছি কোনো ঝোপঝাপের ভিতরে সদলবলে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কুমার নিজের মনে মনেই বললে 'আর আট মিনিট! আঃ, এ মিনিটগুলো যেন ঘড়ির কাঁটাকে জোর করে টেনে রেখেছে—এরা

যেন তাকে এগুতে দিতে রাজি নয়।...আর ছ মিনিট! চন্দ্রবাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে বারোটা বাজলেই সেই আশ্চর্য বাঘের চিৎকার শোনা যাবে। একেলে বাঘগুলোও কি সভ্য হয়ে উঠলো, ঘড়ি না দেখে মানুষের ঘাড় ভাঙতে বেরোয় না?...হাওয়ার রোখ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, গাছটা বেজায় দুলছে—শেষটা ধুপাস্ করে পপাত ধরণীতলে না হই!...আর চার মিনিট!...আর তিন মিনিট...

'আর দু মিনিট!'—কুমারের হৃৎপিণ্ডটা বিষম উত্তেজনায় যেন লাফাতে শুরু করলে—ছিদ্রহীন অন্ধকারের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আগ্রহদীপ্ত চোখ দু'টোকে ক্রমাগত বুলিয়ে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল—যে মূর্তিমান আতঙ্ক এখনি এখানে এসে আবির্ভূত হবে! কিন্তু তার কোনো খোঁজই মিললো না!

—'আচ্ছা, বাঘ যদি এদিকে না এসে অন্যদিকে যায়? কিন্তু যেদিকেই যাক, বাঘের ডাক তো আর সেতারের মিন্‌মিনে আওয়াজ নয়, তার গর্জন আমি শুনতে পাবোই! আর বাঘের বদলে যদি এদিকে আসে ভুলু-ডাকাতের দল, তা হলেও বড় মন্দ মজা হবে না! —আর আধ মিনিট!'

গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ করে আচম্বিতে ঝড় জেগে উঠে বটগাছটার উপরে ভীষণ একটা ঝাপ্‌টা মারলে—পড়তে পড়তে কুমার কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলো!

—'ঠিক রাত বারোটা!'

—সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো এক ব্যাঘ্রের গর্জন! বাঘের ডাক যে এমন ভয়ানক আর অস্বাভাবিক হতে পারে, কুমারের সে-ধারণাই ছিলো না—তার সমস্ত শরীর যেন শিউরে শিউরে মূর্ছিত হয়ে পড়বার মতো হলো!

আবার সেই গর্জন—একবার, দুইবার, তিনবার, সে গর্জন শুনে ঝড়ও যেন ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

আকাশের কালো মেঘের বুক ছিঁড়ে ফালাফালা করে সুদীর্ঘ এক বিদ্যুতের লকলকে শিখা জ্বলে উঠলো—

এবং নিচের দিকে তাকিয়ে কুমার স্পষ্ট দেখলে, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র সামনের জঙ্গলের ভিতর থেকে তীরের মতো বেরিয়ে এলো—

এবং অমনি তার বন্দুক ধ্রুম করে অগ্নিবৃষ্টি করলে!

—তার পরেই প্রথমে ব্যাঘ্রের গর্জন এবং সেই সঙ্গে মানুষের করুণ আর্তনাদ।

## পাঁচ

## মানুষ শিকার

বাঘের ডাক আর মানুষের আর্তনাদ থামতে-না-থামতেই সারি সারি লণ্ঠনের ও বিজলী-মশালের (ইলেক্‌ট্রি টর্চ) আলোতে চারিদিকের অন্ধকার যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো! ঝোপ্‌ঝাপের ভিতর থেকে দলে দলে পুলিশের লোক গোলমাল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

কুমারও তর্‌ তর্‌ করে গাছের উপর থেকে নেমে এলো। কিন্তু নেমে এসে গাছের নীচে চৌকিদারকে আর দেখতে পেলে না। নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনেই পৈত্রিক প্রাণটি হাতে করে সে চম্পট্‌ দিয়েছে।

মুখ তুলেই দেখে, চন্দ্রবাবু একহাতে রিভলভার আর এক হাতের বিজলী-মশাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে তার দিকেই আসছেন।

কাছে এসেই চন্দ্রবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'কুমার, তুমিই কি বন্দুক ছুঁড়েছো?'

কুমার বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি, কিন্তু আর্তনাদ করে উঠলে একজন মানুষ!'

'বাঘটাকে তুমি কোন্‌খানে দেখেছ!'

'খুব কাছেই। ঐ যে, ঐখানে!'

চন্দ্রবাবু সেইদিকে বিজলী-মশালের আলো ফেলে বললেন, 'কই, ওখানে তো বাঘের চিহ্নও নেই! কিন্তু মাটির ওপরে ওখানে কে বসে আছে?'—দু-পা এগিয়েই তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'আরে এ যে আমাদের পটলবাবু!'

কুমার এগিয়ে দেখলে পটলবাবু মাটিতে বসে গায়ের চাদরখানা দিয়ে নিজের ডান পা-খানা বাঁধবার চেষ্টা করছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'এ কি পটলবাবু, আপনি এখানে কেন? আপনার পায়ে কি হয়েছে, চাদর জড়াচ্ছেন যে!'

পটলবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'যে-জন্যে আপনারা এখানে, আমিও সেইজন্যেই এখানে এসে লুকিয়েছিলুম! কিন্তু ঐ ভদ্রলোক যে গুলি করে আমার একখানা পায়ের দফা একেবারে রফা করে দেবেন, তা তো জানতুম না! গুলিটা যদি আমার মাথায় কি বুকে লাগত তা হলে কি হোত বলুন?'

কুমার অপ্রস্তুত স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি। আপনার পায়ে কেমন করে গুলি লাগলো কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

ক্রুদ্ধস্বরে পটলবাবু বললেন, 'বাঘকে দেখে বন্দুক ছুঁড়েছেন না, ঘোড়ার ডিম করেছেন! কাছেই কোথায় একটা বাঘ ডেকেছিল বটে, কিন্তু এখানটায় কোনো বাঘ আসেনি। এখানে বাঘ এলে আমি কি দেখতে পেতুম না? আপনি স্বপ্নে বাঘ দেখে আঁৎকে উঠেছেন!'

ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছ থেকে কে বলে উঠল, 'না, কুমারবাবু সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছেন—আমিও সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছি! পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বাঘটা ঠিক ঐখানেই এসে দাঁড়িয়েছিলো!'

সকলে আশ্চর্য হয়ে উপর পানে তাকিয়ে দেখলে, গাছের গুঁড়ি ধরে একজন লোক নিচে নেমে আসছে!

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'একি, মোহনলালবাবু যে! গাছের ওপরে চড়ে আপনি এতক্ষণ কী করছিলেন!'

কুমারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মোহনলাল বললে, 'গাছে বসে ঐ ভদ্রলোকও যা করছিলেন, আমিও তাই করছিলুম। অর্থাৎ দেখছিলুম বিপদ কোন্‌দিক দিয়ে আসে!'

মোহনলালের বয়স হবে প্রায় চুয়াল্লিশ, মাথায় কাঁচা-পাকা

বাবরি-কাটা চুল, মুখেও কাঁচা-পাকা গোঁফ ও ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, রং শ্যামবর্ণ, দেহখানি খুব লম্বা-চওড়া—দেখলেই বোঝা যায়, বয়সে প্রৌঢ় হলেও তাঁর গায়ে রীতিমতো শক্তি আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি বাঘের কথা কি বলছিলেন না?'

মোহনলাল বললে, 'হ্যাঁ। পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বিদ্যুতের আলোতে ঠিক ঐখানেই আমি একটা মস্তবড় বাঘকে স্বচক্ষে দেখেছি। তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ হল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাঘের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ! তারপরে এখন দেখছি, এখানে বাঘের বদলে রয়েছেন পটলবাবু।'

পটলবাবুর মরা মানুষের-চোখের মতো চোখদুটো হঠাৎ একবার জ্যান্তো হয়ে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তারপর তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'এখানে যে বাঘ-টাঘ কিছু আসেনি, তার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছি আমি নিজে। বাঘটা এখানে এলে আমি এতক্ষণ জ্যান্তো থাকতুম না।'

চন্দ্রবাবুও সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, পটলবাবুর এ যুক্তি মানতে হবে। আপনারা দুজনেই ভুল দেখেছেন!'

পটলবাবু বললেন, 'দুজনে কেন, একশো জনে ভুল দেখলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সত্যি-সত্যি বন্দুক ছোঁড়াটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।...এঃ, আমার ঠ্যাংখানার দফা একেবারে রফা হয়ে গেছে—উঃ! আমি যে আর উঠতেও পারছি না।'

কুমার বেচারী একদম হতভম্বের মতোন হয়ে গেল! সে যে বাঘটাকে দেখেছে এবং তাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছে, এ-বিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, অথচ অন্যের সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যে কোনো প্রমাণই তার হাতে নেই।

মোহনলাল একটা বিজলী-মশাল নিয়ে মাটির উপরে ফেলে বলে উঠল, 'এই দেখুন, চন্দ্রবাবু, বাঘ যে এখানে এসেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখুন! এই দেখুন, কাঁচামাটির ওপরে বাঘের থাবার দাগ!

এই দেখুন, ঐ ঝোপটার ভেতর থেকে থাবার দাগগুলো এইখানে এগিয়ে এসেছে! কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখুন চন্দ্রবাবু দেখুন!'

চন্দ্রবাবুও বাঘের পায়ের দাগগুলো দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার! পায়ের দাগ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাঘটা এদিক পানেই এসেছে বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে আবার ফিরে গেছে, পায়ের দাগ দেখে সেটা মনে হচ্ছে না তো!'

আশেপাশে যে-লোকগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা প্রত্যেকেই চমকে উঠল এবং সভয়ে বারংবার চারিদিকে তাকাতে লাগল —কি-জানি বাঘটা যদি কাছেই কোনো জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে!

পটলবাবু বললেন, 'বন্দুকের শব্দ শুনেই বাঘটা হয়তো লম্বা একটা লাফ মেরে পাশের কোনো ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়েছে! কিন্তু এখানে কোনো বাঘ এসেছে বলে এখনো আমি মানতে রাজি নই,—কারণ আমি নিজে কোনো বাঘ দেখিনি!'

বাঘের পায়ের দাগগুলো আরো খানিকক্ষণ পরখ করে মোহনলাল বললে, 'না বাঘ যে এখানে এসেছিল, সে-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই! এখান থেকে সবচেয়ে কাছের ঝোপ হচ্ছে অন্তত চল্লিশ হাত তফাতে। কোনো বাঘই এক-লাফে অতদূর গিয়ে পড়তে পারে না! কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘটা তবে গেল কোথায়?'

পটলবাবু বললেন, 'সে-কথা নিয়ে পরে অনেক মাথা ঘামাবার সময় পাবেন। আপাতত আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন দেখি,—আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই! এঃ, ঠ্যাংখানার দফা একেবারে রফা করে দিয়েছে দেখছি! কুমারবাবু, মস্ত শিকারী আপনি! বাঘ মারতে এসে মারলেন কিনা মানুষকে! আর মানুষ বলে মানুষ—একেবারে আমাকেই!'

লজ্জায়, অনুতাপে কুমার মাথা না হেঁট করে পারলে না।

মোহনলাল কোনো দিকেই না চেয়ে আপনমনে তখনো বাঘের পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল।

পটলবাবু টিটকিরি দিয়ে বললেন, 'বাঘের পা থেকে ধুলোয় দাগ হয় বটে, কিন্তু সে দাগ থেকে আর আস্ত বাঘ জন্মায় না মোহনলালবাবু! মিছেই সময় নষ্ট করছেন!'

মোহনলাল মাথা না তুলেই বললে, 'আমার যেন মনে হচ্ছে, এই বাঘের পায়ের ভেতর থেকেই আসল বাঘ আমাদের কাছে ধরা দেবে!'

পটলবাবুর মরা চোখ আবার জ্যান্তো হয়ে উঠল—ক্ষণিকের জন্যে তিনি বললেন, 'বলেন কি মশাই? দাগ থেকে জন্মাবে আস্ত বাঘ, এ কোন্ যাদুমন্ত্রে?'

মোহনলাল বললে, 'যে-যাদুমন্ত্রে মাটিতে পায়ের দাগ রেখে বাঘ শূন্যে উড়ে যায়!'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। চলুন, পটলবাবু, আপনি জখম হয়েছেন, আপনাকে আমরা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি!'

—ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে সুতীক্ষ্ণ ফুটবল-বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল।

চন্দ্রবাবু সচমকে বলে উঠলেন, 'আমার গুপ্তচরের বাঁশি। সবাই ঝোপের ভিতর লুকিয়ে পড়—সবাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়! শিগগির আলো নিবিয়ে দাও!'

কুমার সুধোলে, 'ব্যাপার কি চন্দ্রবাবু? এ বাঁশির আওয়াজের মানে কি?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার গুপ্তচর বাঁশির সঙ্কেতে জানিয়ে দিলে যে, ভুলু-ডাকাতের দল এইদিকেই আসছে! তারা আসছে নিশ্চয় মোহনলালবাবুর বাড়ি লুঠ করতে!……কিন্তু মোহনলালবাবু কোথায় গেলেন?……পটলবাবুই বা কোথায়?'

মোহনলাল ও পটলবাবু একেবারে অদৃশ্য!

কুমার বললে, 'বোধ হয় ভুলু-ডাকাতের নাম শুনেই ভয়ে তাঁরা চম্পট দিয়েছেন।'

—'তাই হবে। এসো কুমার, আমরাও এই ঝোপটার ভেতর গিয়ে অদৃশ্য হই'—বলেই কুমারের হাত ধরে টেনে চন্দ্রবাবু পাশেই একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বিপদের উপরে বিপদ! ঠিক সেই সময়ে আকাশের অন্ধকার মেঘগুলো যেন ছ্যাঁদা হয়ে গেল—ঝুপ-ঝুপ করে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে নিরানন্দের মাত্রা যেন পূর্ণ করে তুললে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার বন্দুকে টোটা পুরে নাও—এবারে আর বাঘ নয়, হয়তো আমাদের মানুষ শিকারই করতে হবে!'

কুমার বললে, 'সে-অভ্যাস আমার আছে। এর আগেও আমাকে মানুষ-শিকার করতে হয়েছে।'

## ছয়

## কালো কালো হাত

সেকি বৃষ্টি!—ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, অন্ধকার শূন্যের ভিতর থেকে যেন এক বিরাট প্রপাত হুড় হুড় করে জল ঢালছে আর ঢালছে।

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে কুমার যে-ঝোপটার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেটা ছিল ঢালু জমির উপরে। অল্পক্ষণ পরেই তাদের প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে কলকল আওয়াজে জলধারা ছুটতে লাগল।

চন্দ্রবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন,—'কপাল যাদের নেহাৎ পোড়া, তারাই পুলিসে চাকরি নেয়! শ্যাল-কুকুররাও আজ বাইরে নেই, আমরা তাদেরও অধম!'

কুমার তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, 'কি মুশকিল! সাপের মতোন কি-একটা আমার গায়ের ওপর দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল!'

—'খুব সাবধান কুমার! বর্ষাকালে সুন্দরবনে সাপের বড় উৎপাত! একটা ছোবল মারলেই ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ!··· দেখ, দেখ, ঐ দেখ! মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রিক টর্চ জ্বালিয়ে কারা সব এই দিকেই আসছে! নিশ্চয়ই ভুলু-ডাকাতের দল!'

কুমার বললে, 'ভুলু-ডাকাতকে আপনি কখনো দেখেছেন?'

—'কেউ কোনোদিন তাকে দেখেনি। সে নিজে দলের সঙ্গে থাকে না। দলের সঙ্গে থাকে কালু-সর্দার, সে ভুলুর হুকুম-মতো দলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কালু-সর্দারকে আমি দেখেছি, সে যেন এক মাংসের পাহাড়, মানুষের দেহ যে তেমন বিপুল হতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। কালুর গায়ে জোরও তেমনি। শুনেছি, সে নাকি শুধু-হাতে এক আছাড়ে একটা বাঘকে

বধ করেছিল। একবার সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রাত্রিবেলায় হাজত-ঘরের দেওয়াল থেকে আস্ত জানলা উপড়ে ফেলে সে চম্পট দেয়।

চন্দ্রবাবুর কথা শুনতে শুনতে কুমার দেখতে লাগল, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত তফাৎ দিয়ে ডাকাতের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের কারুকে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু বিজলী-মশালগুলোর আলো দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাদের গতি কোন্ দিকে!

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দু-একটা আশ্চর্য রহস্যের কোনো কিনারাই আমি করতে পারছি না। ভুলু-ডাকাতের দল ডাকাতি করতে বেরোয় কেবল অমাবস্যার রাত্রে। আর যে-অঞ্চলেই তার দল ডাকাতি করতে যায়, সেইখানেই বাঘের বিষম অত্যাচার হয়! বাঘের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই তারা যেন ডাকাতি করতে যায়! একবার একজন সাহেব-গোয়েন্দা ভুলুকে ধরতে এসেছিল। কিন্তু শেষটা বাঘের কবলেই তার প্রাণ যায়। লোকের মুখে শুনি বাঘই নাকি ভুলুর ইষ্টদেবতা, রোজ সে বাঘ-পুজো করে!'

—'বাঘ-পুজো?'

—'হ্যাঁ। সুন্দরবনে এটা কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই এখানে বাঘকে পুজো করে।'

—'দেখুন, দেখুন! ডাকাতের দল অন্য দিকে যাচ্ছে!'

—'হুঁ, ঐ দিকেই মোহনলালের বাসায় যাবার পথ। ওরা যে মোহনলালের বাসার দিকেই যাবে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। পটলবাবুর সন্দেহ ভুল—মোহনলাল যদি ভুলুর দলের লোক হোত, তাহলে ডাকাতরা কখনোই তার বাড়ি লুঠ করতে আসত না।'

কুমার বললে, 'এখন আপনি কি করবেন?'

পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'এইবারে আমি বাঁশি বাজাব। ডাকাতরা জানে না, ওরা আজ

কী ফাঁদে পা দিয়েছে! আমি বাঁশি বাজালেই আমার দলের লোকরা ওদের ঘেরাও করে ফেলবে। কুমার প্রস্তুত হও!'—চন্দ্রবাবু বাঁশি বাজাতে উদ্যত হলেন।

সেই মুহূর্তেই তীব্র স্বরে একটা ফুটবল-বাঁশি বেজে উঠল—কিন্তু সে চন্দ্রবাবুর বাঁশি নয়!...ডাকাতদের বিজলী মশালগুলো এক পলকে নিবে গেল!

চন্দ্রবাবু এক লাফে ঝোপের বাইরে এসে বললেন, 'ও বাঁশি কে বাজালে? ডাকাতদের কে সাবধান করে দিলে?'—বলতে বলতে তিনিও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন—একবার, দুবার, তিনবার!

জঙ্গলের চারিদিকে পুলিশের লণ্ঠন জ্বলে উঠল, চারিধারে ঝোপঝাপ থেকে দলে দলে পুলিসের লোক বেরিয়ে এল—তাদের কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে লাঠি!

চন্দ্রবাবু চীৎকার করে বললেন, 'ডাকাতরা পালাচ্ছে, ওদের আক্রমণ কর! ঐদিকে—ঐদিকে—শিগগির!' চন্দ্রবাবু ও কুমার রিভলভার ও বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে ডাকাতরা যেদিকে ছিল সেইদিকে ছুটতে লাগলেন!

কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রবাবু ডাকাতদের কারুর টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। দারুণ বৃষ্টিতে মাটির উপর দিয়ে যেন বন্যা ছুটছে, এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় বনজঙ্গল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে দুলছে, বিজলী-মশালের সীমানার বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে, এর মধ্যে ডাকাতরা যে কোথায়, কোন্‌দিকে গা ঢাকা দিয়েছে তা স্থির করা অসম্ভব বললেই চলে।

চন্দ্রবাবু হতাশ ভাবে বললেন, 'নাঃ আজও খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল দেখছি। কিন্তু কোন্ রাস্কেল বাঁশি বাজিয়ে তাদের সাবধান করে দিলে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

কুমার বললে, 'বোধ হয় ডাকাতদের কোনো চর বনের ভেতরে লুকিয়ে থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল!'

—'সম্ভব। কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমরা—' চন্দ্রবাবুর কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ পাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে তু-খানা বড়ো বড়ো কালো হাত বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল এবং পরমুহূর্তে তারা কুমারকে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, কুমার একটা চীৎকার করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কুমার নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মহা-বলবান অজ্ঞাত শত্রু তার দেহ ধরে এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলে যে, তার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল।

## সাত

### বাঘের গর্তে

নীচে কল কল করে জলের বন্যা ছুটে চলেছে, উপরেও ঝড়ের তোড়ে নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে যেন শব্দের বন্যা ডেকে ডেকে উঠছে এবং এ-সমস্তকেই গ্রাস করে নীরবে বয়ে যাচ্ছে যেন অন্ধকারের বন্যা!

এরই মধ্যে কুমার কখন জ্ঞান ফিরে পেলে।

অনুভবে বুঝলে, তার দেহটা দুমড়ে কার কাঁধের উপরে পড়ে রয়েছে।

সে একটু নড়বার চেষ্টা করতেই একখানা লোহার মতো শক্ত হাতে তাকে টিপে ধরে কে কর্কশ স্বরে বললে 'চুপ। ছটফট করলেই টুঁটি টিপে মেরে ফেলব!'—তার হাতের চাপেই কুমারের কোমরটা বিষম ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল!

ভীমের মতোন গায়ের জোর,—কে এই ব্যক্তি? কাঁধে করে কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কুমারের ইচ্ছা হল, তার মুখখানা একবার দেখে নেয়। কিন্তু যা ঘুটঘুটে অন্ধকার!

পায়ের শব্দে বুঝলে, তার আশে-পাশে আরো অনেক লোক আছে। কে এরা? ভুলু-ডাকাতের দল? কিন্তু এত লোক থাকতে এরা তাকে বন্দী করলে কেন? তাকে নিয়ে এরা কি করতে চায়?

অন্ধকারের ভিতর থেকে কে বললে, 'বাপরে বাপ, এত অন্ধকার তো কখনো দেখি-নি! পথ চলা যে দায় হয়ে উঠল, আলো জ্বালব নাকি?'

যে তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে বললে, 'খবরদার নিশে, আলো জ্বালবার নাম মুখেও আনিস নে! পুলিসের লোক যদি পিছু নিয়ে

থাকে, তাহলে আলো জ্বাললেই ধরা পড়বি। তার ওপরে এই ছোকরাকে আমি আমার মুখ দেখাতে চাই না।'

আর একজন বললে, 'ওকে মুখই বা দেখাব কেন, আর অমন করে বয়েই বা মরছ কেন? দাও না এক আছাড়ে সাবাড় করে।'

—'ভোঁদা ব্যাটার বাপ ছেলের ঠিক নামই রেখেছিল। ভোঁদা নইলে অমন বুদ্ধি হয়! ওরে গাধা, আমি কি শখ করে এ ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে করে বয়ে মরছি?'

—'ওকে নিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে?'

—'ওরে ব্যাটা ভোঁদা, তোর চেয়ে ভোঁদড়ও চালাক দেখছি! এ ছোঁড়াকে নিয়ে কি করব, এতক্ষণে তাও বুঝিস নে? শোন্ তবে! আপাতত এ ছোঁড়া আমাদের আড্ডায় বন্দী থাকবে। আসছে অমাবস্যায় ডাকাতি করতে বেরুবার আগে মা-কালীর সামনে একে বলি দেব। মা বোধহয় আমাদের ওপরে রেগেছেন। তিনি মুখ ফিরিয়েছেন বলেই এ-যাত্রা আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল। এমন তো কখনো হয় না। মা নিশ্চয় নরবলি চান!'

লোকটার মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই ভীষণ এক ব্যাঘ্রের গর্জনে আকাশের মেঘ আর অরণ্যের অন্ধকার যেন থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—বার বার তিনবার! তারপরেই সব চুপচাপ।

মহা-আতঙ্কে কম্পিতকণ্ঠে কে বললে, 'সর্দার!'

—'হুঁ।'

—'বাঘ!'

—'না, আমাদের মা বাঘাই-চণ্ডী! বললুম তো, মায়ের ক্ষিদে পেয়েছে, মা নরবলি চান! তোরা তো মাকে খেতে দিলি-নে, মা তাই নিজেই ক্ষিধে মেটাতে এসেছেন!'

—'কিন্তু মা যে আমাদেরই কাকে ধরে নিয়ে গেলেন! এ কি-রকম মা, নিজের পেটের ছেলেকে পেটে পুরবেন?'

—'ক্ষিধের সময়ে আত্ম-পর জ্ঞান থাকে না রে ভোঁদা আত্মপর জ্ঞান থাকে না! আর কে-ই বা মায়ের ছেলে নয়,—মা তো জগৎজননী, সবাই তো মায়ের ছেলে!'

কুমার চুপ করে সব কথা শুনে যাচ্ছিল। নিজের পরিণামের কথাও শুনলে। বলির পশুর মতোন তাকে মরতে হবে। তার মনটা যে খুব খুশি হয়ে উঠল না, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সর্দার বলে যাকে ডাকা হচ্ছে, তাকে যে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে এই লোকটা? এই কি ভুলু ডাকাত? না তার প্রধান অনুচর কালু-সর্দার?

হঠাৎ বিমলের কথা তার মনে হলো। সে এখন কলকাতায়। তার বন্ধু যে আজ মরণের পথে এগিয়ে চলেছে, এ-কথা সে জানেও না। কুমারের মনে এখন অনুতাপ হতে লাগল, কেন সে বিমলের জন্যে অপেক্ষা করেনি? কেন সে একলা এই বিপদের রাজ্যে এল? বিমল যদি আজ এখানে থাকত, তাহলে নিশ্চয় সে প্রাণপণে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করত—আর খুব-সম্ভব তাকে উদ্ধার করতে পারতও। হয়তো—

আচম্বিতে কি যে হল, কেবল এইটুকুই তার মনে হল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হুস করে সে নীচের দিকে নেমে গেল, তারপরেই ঝপাং করে একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে, সে আর মাটির উপরে নেই, জলের ভিতরে গিয়ে পড়েছে!

—একেবারে এক গলা জল! যে লোকটার কাঁধে চড়ে এতক্ষণ সে যাচ্ছিল, সেও এখন জলের মধ্যে!·········নিজেকে সামলে নিয়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তার সঙ্গের লোকটা একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

উপরপানে তাকিয়ে দেখলে খালি ঘুটঘুটে করছে অন্ধকার। তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

আবার চারিদিক হাতড়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তারা একটা

গভীর গর্তের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের বাসিন্দারা বাঘ ধরবার জন্যে বনের মাঝে মাঝে গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখটা ঘাস-পাতা-গাছপালা দিয়ে ঢেকে রাখে। এটা নিশ্চয়ই সেই রকম কোনো গর্ত।

কুমার কান পেতে শুনতে লাগল। ডাকাতের কোন সাড়াশব্দ নেই। তাদের সর্দার যে মা বাঘাই-চণ্ডীর বলি নিয়ে গর্তের মধ্যে কুপোকাৎ, এ-কথা নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে অন্ধ হয়ে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটু পরেই তো তারা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারবে! তখন আবার তারা সদলবলে ফিরে আসবে!

যদি পালাতে হয় তো এই হচ্ছে পালাবার সময়।

কিন্তু চারিদিককার দেওয়ালে হাত বুলিয়ে কুমার বুঝলে, দেওয়াল খাড়াভাবে উপরে উঠেছে—সাপ আর টিকটিকি না হলে তা বেয়ে উপরে ওঠা অসম্ভব।

সে হতাশ হয়ে পড়ল।

…হঠাৎ উপরে কার দ্রুত পায়ের শব্দ হল,—মাত্র একজনের পায়ের শব্দ!

কে এ? ডাকাতরা কি আবার ফিরে এল? কিন্তু তারা এলে তো দল বেঁধে ফিরে আসবে!

তবে কি এ পুলিসের চর? ডাকাতদের পিছু নিয়েছে?

যা থাকে কপালে—এই ভেবে কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে, 'কে যায়? আমি গর্তের ভেতরে পড়ে গেছি, আমাকে বাঁচাও!'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কুমার আবার চেঁচিয়ে বললে, 'আমি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি—আমাকে বাঁচাও!'

তখনো জবাব নেই।

কিন্তু হঠাৎ কুমারের মুখের উপরে কি একটা এসে পড়ল,—ঠিক একটা সাপের মতো।

কুমার সভয়ে চম্‌কে উঠল—কিন্তু তার পরে ই বুঝলে, উপর থেকে গর্তের ভিতরে একগাছা মোটা দড়ি ঝুলছে!

কুমার বিস্মিত হবারও অবকাশ পেলে না—তাড়াতাড়ি দড়িগাছা চেপে ধরতেই উপর থেকে কে তাকে টেনে তুলতে লাগল।

পাতাল ছেড়ে পৃথিবীর উপরে এসে দড়ি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে কুমার উল্লসিত কণ্ঠে বললে, 'কে তুমি ভাই, আমাকে যমের মুখ থেকে বাঁচালে?'

কারুকে দেখা গেল না—খালি অন্ধকার! কোন জবাব এল না,—খালি শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ! কে যেন সেখান থেকে চলে গেল। যেন ভৌতিক কাণ্ড।

কে এই অজ্ঞাত ব্যক্তি? কেন সে তার সঙ্গে কথা কইলে না, কেন সে পরিচয় দিলে না, কেন সে তাঁকে বাঁচিয়ে এমন করে চলে গেল? এ কী আশ্চর্য রহস্য!

খানিক তফাৎ থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।...ডাকাতরা ফিরে আসছে! তারা বুঝতে পেরেছে, সর্দার আর তাদের দলে নেই!

কুমার বেগে অন্য দিকে দৌড় দিলে।

# আট

## পটলবাবুর বাড়ি



অমাবস্যার রাতে সেই রোমাঞ্চকর 'অ্যাডভেঞ্চারে'র পর কুমারের গায়ের ব্যথা মরতে গেল এক হপ্তারও বেশি।

সেদিন সকাল-বেলায় থানার সামনের মাঠে পায়চারি করতে করতে কুমার নানান কথা ভাবছিল।

নানান ভাবনার মধ্যে তার সবচেয়ে-বড় ভাবনা হচ্ছে, বাঘের গর্তের ভিতর থেকে যে তাকে সেদিন উদ্ধার করলে, কে সেই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই সে ডাকাতদের দলের কেউ নয়। গাঁয়ের ভিতরও কুমারের এমন কোনো বন্ধু নেই (একমাত্র চন্দ্রবাবু ছাড়া), তার জন্যে যার এতটা মাথাব্যথা হবে! এই রহস্যময় ব্যক্তি তার প্রাণরক্ষা করলে, অথচ তাকে দেখাই বা দিলে না কেন?

সে-রাতের সব ব্যাপারের সঙ্গেই গভীর রহস্যের যোগ আছে! সে স্বচক্ষে বাঘ দেখলে, বন্দুক ছুঁড়লে, অথচ জখম হলেন পটলবাবু! বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে, অথচ পটলবাবু বলেন, সেখানে বাঘ আসেনি!

কুমার মনে মনে এমনি সব নাড়াচাড়া করছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, পথ দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলেছে মোহনলাল।

মোহনলালও তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'এই যে কুমারবাবু, নমস্কার! শুনলাম নাকি আপনি মস্ত বিপদে পড়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ যেমন বিপদে পড়েছিলুম, তেমনি হঠাৎ উদ্ধারও পেয়েছি!'

মোহনলাল বললে, 'আমি বরাবরই দেখে আসছি কুমারবাবু বিপদের যারা তোয়াক্কা রাখে না, বিপদও যেন তাদের এড়িয়ে চলে।'

—'তবে ?'

—'আপনার ভয়েই তিনি বোধ হয় একটিমাত্র ঠ্যাঙে ভর দিয়েই লম্বা দিয়েছিলেন।'

—'আমার ভয়ে ?'

—'হ্যাঁ। আপনার লক্ষ্যভেদ করবার শক্তির ওপরে হয়তো তাঁর মোটেই বিশ্বাস নেই। একবার বাঘ বধ করতে গিয়ে আপনি তাঁর পা খোঁড়া করে দিয়েছিলেন, তারপর আবার ডাকাত মারতে গিয়ে আপনি যে তাঁরই প্রাণপাখিকে খাঁচাছাড়া করতেন না, সেটা তিনি ভাবতে পারেন নি। কাজে কাজেই 'যঃ পলায়তি স জীবতি' ! পটলবাবু বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন।'

কুমার অপ্রতিভ হয়ে মাথা হেঁট করলে।

মোহনলাল তার পর যেন নিজের মনে-মনেই বললে, 'কিন্তু এ কিরকম কথা ? বাঘের গায়ে লাগল গুলি, বাঘ হল জখম, তবে পটলবাবুর পা কেমন করে খোঁড়া হল ?'

তাই তো, এ কথাটা তো কুমার এতক্ষণ ভেবে দেখেনি ! এও বা কেমন করে সম্ভব হয় ?

এখানকার সমস্ত কাণ্ডই যেন আজগুবি, এ বিপুল রহস্যের সমুদ্রে যেন কিছুতেই থই পাবার জো নেই !

তারা পটলবাবুর বাড়ির মুখে এসে হাজির হল।

পটলবাবুকে প্রথম দেখে কুমারের যেমন মনে হয়েছিল—শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে দেখছে, তেমনি পটলবাবুর বাড়িখানাকেও দেখে কুমারের মনে হল—এ যেন কার বিজন সমাধি-ভবন !

চারি ধারে ঝোপঝাপ, ঘন বাঁশঝাড়, পোড়ো জমি ; এক-কোণে একটা পচা ডোবা ; মাঝখানে একটা পানা-ধরা পুকুর—এক সময়ে তার সব দিকেই বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন তার একটাও টিঁকে নেই।

সেই পুকুরেরই পূর্বদিকে পটলবাবুর জীর্ণ, পুরোনো ও প্রকাণ্ড বাড়িখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভাবছে, এইবারে কবে সে একেবারে হুড়্‌মুড়্ করে ভেঙে পড়বে। এ বাড়িকে কেবল বাড়ি বললেই ঠিক বলা হবে না, একে অট্টালিকা বলাই উচিত—সাত-মহলা অট্টালিকা! কিন্তু তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ চালিয়ে খালি দেখা যায়, লোনা-ধরা, ক্ষয়ে-যাওয়া, বালি-খসা ইটগুলো যেন ছাল-ওঠা ঘায়ের মতন লাল হয়ে আছে! অজগর সাপের মতন শিকড় দিয়ে দেওয়ালকে জড়িয়ে বড়ো-বড়ো সব গাছ হাওয়ার ছোঁয়ায় শিউরে আর্তনাদ করে উঠছে,—এক-একটা গাছ এত বড়ো যে, তার ডাল বেয়ে আট-দশজন মানুষ উঠলেও তারা নুয়ে পড়বে না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'এ তো বাড়ি নয়, এ যে শহর! পটলবাবুর পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় খুব ধনী ছিলেন?'

মোহনলাল বললে, 'জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, এ বাড়ি পটলবাবুর পূর্বপুরুষের নয়। পটলবাবু এ গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছেন মোটে তিন বছর। এই পোড়ো বাড়ি আর জমি তিনি জলের দরে কিনে নিয়েছেন।'

—'বাড়িখানাকে কিনে এর এমন অবস্থা করে রেখেছেন কেন?'

—'এত বড়ো বাড়ি মেরামত করতে গেলেও কত হাজার টাকার দরকার, তা কি বুঝতে পারছেন না? বাড়িখানার একটা মহলই পটলবাবুর পক্ষে যথেষ্ট। সেই অংশটুকু মেরামত করে নিয়ে পটলবাবু সেইখানেই থাকেন।'

—'কিন্তু এ বাড়ি আগে কার ছিল, আপনি কি জানেন?'

—'সে খোঁজও আমি নিয়েছি। বাংলা দেশের অনেক বড়ো-বড়ো জমিদারের পূর্বপুরুষ ডাকাত ছিলেন। প্রায় তিনশো বছর আগে এমনি এক ডাকাত-জমিদার এই বাড়িখানা তৈরি করিয়েছিলেন। এরকম সেকেলে বাড়ির ভেতরে অনেক রহস্য থাকে। আমরা খোঁজ নিলে আজও তার কিছু-কিছু পরিচয় পেতে পারি।'

বাড়ির সদর দরজা এমন মস্ত যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতি ঢুকতে পারে। এতকাল পরেও দরজার লোহার-কিল-মারা পুরু পাল্লা দুখানা একটুও জীর্ণ হয়ে পড়ে নি!

মোহনলালের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে কুমার বললে, 'পটলবাবু কোন অংশে থাকেন, আপনি জানেন তো?'

—'জানি। কিন্তু তার আগে বাড়ির অন্য অন্য মহলগুলো একবার বেড়িয়ে এলে আপনার কষ্ট হবে কি?'

কুমার পরম উৎসাহিত হয়ে বললে, 'কিছু না—কিছু না! বলতে কি, আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। কিন্তু, পটলবাবুকে আগে তো সেটা একবার জানানো দরকার?'

—'কোনো দরকার নেই; পটলবাবুর মহল একেবারে আলাদা, তার দরজাও অন্য দিকে। এ মহলগুলোয় জনপ্রাণী বাস করে না, এগুলো এমনি খোলাই পড়ে থাকে, এর মধ্যে যে কেউ ঢুকতে পারে—কত শেয়াল-কুকুর আর সাপ যে এর ভেতরে বাসা বেঁধে আছে, কে তা বলতে পারে?'

একে একে তারা তিন-চারটে মহল পার হল—বাড়ির ভেতরের অবস্থাও তথৈবচ! বড়ো-বড়ো উঠান, দালান, চক-মিলানো ঘর, কারু-কাজ করা খিলান, কার্নিশ, থাম ও দরজা—কিন্তু বহুকালের অযত্নে আর কোথাও কোন শ্রী নেই! ঘরে ঘরে বাদুড় ঝুলছে, চামচিকে উড়ছে, কোলাব্যাঙ লাফাচ্ছে, পথ দিয়ে চলতে গেলে জংলা গাছপালা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা দেয়, ঘুমন্ত সাপ জেগে রেগে ফোঁস্ করে ওঠে, তফাতে তফাতে পলাতক জানোয়ারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়!··· মাঝে মাঝে সব অলিগলি, শুঁড়িপথ—তাদের ভেতরে কষ্টিপাথরের মতন জমাট-বাঁধা ঘুটঘুটে অন্ধকার! কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, সেই-সব অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে যেন ভীষণ সব চোখের আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে—সে হিংসুক, ক্ষুধিত দৃষ্টিগুলো যেন মানুষের রক্তপান করবার জন্যে দিবারাত্র সেখানে জাগ্রত হয়ে

আছে !···আর সে কী স্তব্ধতা ! সে স্তব্ধতাকে যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায় !

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, 'দেখুন মোহনবাবু, মাটির দিকে চেয়ে দেখুন !'

মাটির পানে তাকিয়েই একটি লাফ মেরে মোহনলাল বলে উঠল, অ্যাঃ ! আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি যে, এটা দেখতে না পেয়ে বোকার মতো এগিয়ে চলেছি ! ভাগ্যিস আপনি দেখতে পেলেন !' —বলেই সে আগ্রহ-ভরে মাটির উপরে হেঁট হয়ে পড়ল !

মাটির উপর দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলেছে বাঘের বড়ো-বড়ো থাবার চিহ্ন !

সেই পায়ের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে মোহনলাল আর কুমার গিয়ে দাঁড়াল একটা শুঁড়িপথের সামনে। সেখানে আবার নূতন ও পুরাতন অসংখ্য পায়ের দাগ—দেখলেই বেশ বোঝা যায়, ব্যাঘ্র মহাশয় সেখানে প্রায়ই বেড়াতে আসেন।

মোহনলাল বললে, 'পটলবাবুর এই রাজপ্রাসাদে যে এত-বেশি বাঘের আনাগোনা, গাঁয়ের কেউ তো সে খবর জানে না।'

চিড়িয়াখানার বাঘের ঘরে যেরকম দুর্গন্ধ হয়, শুঁড়িপথের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠিক সেইরকম একটা বিশ্রী, বোট্‌কা গন্ধ বাইরে বেরিয়ে আসছে !

মোহনলাল একবার সেই ভয়াবহ শুঁড়িপথের ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর ফিরে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমারবাবু, এর ভেতরে ঢোকবার সাহস আপনার আছে ?'

কুমার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

—'তা হলে আমার সঙ্গে আসুন'—বলেই মোহনলাল বিনা দ্বিধায় সেই অন্ধকারে অদৃশ্য বিপদ ও রহস্যে পূর্ণ শুঁড়িপথের ভিতরে প্রবেশ করল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এগুল কুমার—অটল পদে, নির্ভীক প্রাণে।

## নয়

### মরণের সামনে

মোহনলাল যে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান ও রহস্যময় ব্যক্তি, আজকে তার সঙ্গে ভালো করে কথা কয়ে কুমার এটা তো বেশ বুঝতে পারলেই, তার উপরে তার বুকের পাটা দেখে সে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কুমার আর একজন মাত্র লোককে জানে, এরকম মরিয়ার মতো সে এমনই মৃত্যুভয়-ভরা অজানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভালোবাসে। সে হচ্ছে তার বন্ধু বিমল। ছেলেবেলা থেকেই বিপদের পাঠশালায় সে মানুষ।

কিন্তু মোহনলাল কেন যে যেচে এই মৃত্যু খেলায় যোগ দিয়েছে, কুমার সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না। সেও কি তাদেরই মতো সখ করে নিরাপদ বিছানার আরাম ছেড়ে চারি দিকে বিপদকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, না নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অমাবস্যার রাতের এই ভীষণ গুপ্তকথাটা সে জানতে চায়?

কিন্তু এখন এ-সব কথা ভাববার সময় নয়। কী ভয়ানক শুঁড়িপথ এ? কয়েক পা এগিয়েই কুমার দেখলে, গলির মুখ দিয়ে বাইরের একটুখানি যে আলোর আভা আসছিল, তাও অদৃশ্য হয়ে গেছে! এখন খালি অন্ধকার আর অন্ধকার—সে নিবিড় অন্ধকারের প্রাচীর ঠেলে কোনো মানুষের চোখই কোনো দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

শুঁড়িপথের দু দিকের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল এত বেশি স্যাঁৎসেঁতে যে, হাত দিতেই কুমারের হাত ভিজে গেল! আর সেই জানোয়ারি বোঁটকা গন্ধ! নাকে খুব কষে কাপড়-চাপা দিয়েও

কুমারের মনে হতে লাগল, তার পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত আজ বোধ হয় উঠে আসবে!

মোহনলালের হাতে, সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটা ছোটো ইলেক্‌ট্রিক্ লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কুমার বুঝলে, মোহনলাল রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু, আপনার কাছে কোনো অস্ত্র-টস্ত্র আছে?'

—'না।'

—'আপনি দেখছি আমার চেয়েও সাহসী! নিরস্ত্র হয়ে এই ভীষণ স্থানে ঢুকতে ভয় পেলেন না?'

—'আপনিও তো এখানে ঢুকেছেন, আপনিও তো বড়ো কম সাহসী নন!'

—'কিন্তু আমার কাছে রিভলভার আছে।' বলেই মোহনলাল ফস্ করে হাতের আলোটা নিবিয়ে ফেললে।

—'ও কি, আলো নেবালেন কেন?'

—একবার খালি দেখে নিলুম, পথটা কিরকম। অজানা পথ না হলে এখানে আলো জ্বালতুম না—শত্রুর দৃষ্টির আকর্ষণ করে লাভ কি?'

—'শত্রু?'

—'হ্যাঁ। এই পথের মাটির ওপর আলো ফেলে এই মাত্র দেখলুম যে, এখানে খালি বাঘের পায়ের দাগই নেই, মানুষের পায়ের দাগও রয়েছে!'

—'একসঙ্গে বাঘের আর মানুষের পায়ের দাগ? বলেন কি!'

—'চুপ! আর কথা নয়। হয়তো কেউ আমাদের কথা কান পেতে শুনছে।'

অত্যন্ত সতর্কভাবে পা টিপে টিপে দুজনে এগুতে লাগল—অন্ধকার যেন হাজার হাত বাড়িয়ে ক্রমেই বেশি করে তাদের চেপে

ধরছে, বদ্ধ-বাতাস দুর্গন্ধে যেন ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে, কি-একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক যেন তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে! কুমারের মনে হল, সে যেন পৃথিবী ছেড়ে কোনো ভুতুড়ে জগতের ভিতরে প্রবেশ করছে—এ পথ যেন যমালয়ের পথ, প্রেতাত্মা ছাড়া আর কেউ যেন এ পথে কোনোদিন পথিক হয় নি!

আচম্বিতে মাথার উপর দিয়ে বদ্ধ-বাতাসের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার চঞ্চল তরঙ্গ তুলে ঝট্‌পট্‌ করে কারা সব চলে গেল! সমাধির নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ সেই শব্দ শুনে কুমারের বুকের কাছটা ধড়্‌ফড়িয়ে উঠল,—কিন্তু তার পরেই বুঝলে, এই মৃত জগতে জীবন্তের সাড়া পেয়ে বাদুড়েরা দলে দলে উড়ে পালাচ্ছে!

আরো কিছুদূর এগিয়েই মোহনলাল চুপি চুপি বললে, 'এখানে একটা দরজা আছে বোধ হয়'—বলেই সে আবার এগিয়ে গেল।

অন্ধকারে হাত বুলিয়ে কুমারও বুঝলে, দরজাই বটে! তার পাল্লা দুটো খোলা। সেও চৌকাঠ পার হয়ে গেল। তার পর দুদিকে হাত বাড়িয়েও আর দেওয়াল খুঁজে পেলে না। শুঁড়িপথ তা হলে শেষ হয়েছে!

কিন্তু তারা কোথায় এসেছে? এটা ঘর, না অন্য-কিছু? এখানেও দুর্গন্ধের অভাব নেই, উপর-পানে চাইলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—কিন্তু কুমার অনুভব করলে যে শুঁড়িপথের থমথমে বদ্ধ-বাতাস আর এখানে স্তম্ভিত হয়ে নেই।

তারা দুজনেই সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে খানিকক্ষণ কান পেতে রইল এবং অন্ধকারের মধ্যে দেখবার কোনো-কিছু খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছু দেখাও যায় না, কিছু শোনাও যায় না! যেন দেহশূন্য মৃতের রাজ্য!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মোহনলাল আবার তার ইলেকট্রিক লণ্ঠনটা জ্বাললে।

এটা প্রকাণ্ড একটা হল-ঘরের মতো, কিন্তু এটা ঘর নয়, কারণ

ঘর বলতে যা বোঝায়, এ-জায়গাটাকে তা বলা যায় না। এটা একটা প্রকাণ্ড উঠোনের চেয়েও বড়ো জায়গা, কিন্তু মাথার উপরে রয়েছে ছাদ। মাঝে মাঝে থাম—ছাদের ভার রয়েছে তাদের উপরেই।

হঠাৎ মোহনলাল সবিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে উঠল! তার পরেই কুমারের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, 'দেখুন কুমারবাবু, দেখুন!'

কী ভয়ানক!···কুমার রুদ্ধশ্বাসে আড়ষ্ট নেত্রে দেখলে, তাদের কাছ থেকে হাত-দশেক তফাতেই পড়ে রয়েছে একটা মড়ার মাথা। এবং সেই মাথাটার পাশেই মাটির উপরে এলানো রয়েছে স্ত্রীলোকের মাথার একরাশি কালো চুল!

খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে মোহনলাল বললে, 'ঐ মড়ার মাথা থেকেই ও-চুলগুলো খসে পড়েছে। ও-মাথাটা নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোকের!'

কুমার বললে, 'হ্যাঁ। এখনো ও-মাথাটার আশে-পাশে কিছু-কিছু চুল লেগে রয়েছে। যার ঐ মাথা, নিশ্চয়ই সে বেশিদিন মরে নি!'

মোহনলাল দুঃখিত স্বরে বললে, 'অভাগীর মৃত্যু হয়েছে হয়তো কোনো অমাবস্যার রাতেই!

কুমার সচমকে প্রশ্ন করলে, 'কী বলছেন আপনি?'

মোহনলাল বিরক্তভাবে বললে, 'কুমারবাবু, অমাবস্যার রাতের রহস্য বোঝবার জন্যে আপনার এখানে আসা উচিত হয় নি! আপনি নিজের চোখকে যখন ব্যবহার করতে শেখেন নি, তখন এ রহস্যের কিনারা করবার শক্তিও আপনার নেই! আপনি জানেন যে, বাঘের কবলে পড়ে এখানে অনেক স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়েছে। আমাদের সামনে যে মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে, ওটা যে কোনো স্ত্রীলোকের মাথা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।···তার উপরে, আপনি কি এও দেখতে পাচ্ছেন না যে, এ জায়গাটার নরম মাটির উপরে চারিদিকেই রয়েছে বাঘের থাবার দাগ? দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে

কি হয় তা জানেন তো? চার! এ মড়ার মাথাটা হচ্ছে, দুই! আর বাঘের থাবার দাগ হচ্ছে, দুই! এই দুই আর দুইয়ে যোগ করুন, চার ছাড়া আর কিছুই হবে না! অমাবস্যার রাতে এখানে বাঘের উপদ্রব না হলে আমরা আজ ঐ মড়ার মাথাটাকে কখনোই এ-জায়গায় দেখতে পেতুম না।'

অপ্রতিভ কুমার মাথা হেঁট করে মোহনলালের এই বক্তৃতা নীরবে সহ্য করলে। মোহনলালের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে আজ সে হার না মেনে পারলে না।

মোহনলাল লণ্ঠনটা সামনের দিকে এগিয়ে আবার বললে, 'কুমারবাবু, ওদিকটাও দেখেছেন কি?'

খানিক তফাতে দেখা গেল, একরাশ হাড়ের স্তূপ! মানুষের হাতের হাড়, পায়ের হাড়, বুকের হাড়, মাথার খুলি! কত মানুষের হাড় যে ওখানে জড় করা আছে, তা কে জানে!—দেখলেই বুক ধড়াস্ করে ওঠে!—এ যে মড়ার হাড়ের দেশ! যাদের ঐ হাড়, তাদের অশান্ত প্রেতাত্মারাও কি আজ এই অন্ধকার কোটরের আনাচে-কানাচে আনাগোনা করছে, নিজেদের দেহের শুকনো হাড়গুলোকে আবার ফিরে পাবার জন্যে?

কেন সে জানে না, কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলোক-রেখার ওপারে গাঢ় কালো অন্ধকার যেখানে এই চিররাত্রির আলোকহীন গর্তের মধ্যে থমথম করছে, সেখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মানুষের চোখে অদৃশ্য হয়ে কারা সব প্রেতলোকের নিঃশব্দ ভাষায় ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে!—

—এতক্ষণ ঐ বীভৎস অস্থি-স্তূপের চার পাশে সার বেঁধে বসে যেন তারা নিজেদের মৃতদেহের হাড়গুলো খুঁজে বার করবার জন্যে হাতড়ে দেখছিল, এখন মানুষের হাতের আলোর ছোঁয়া লাগবার ভয়ে তারা সবাই অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে!

কুমার আর থাকতে না পেরে, দুই হাতে মোহনলালের দুই কাঁধ প্রাণপণে চেপে ধরে বললে, 'মোহনবাবু! আর নয়, এখানে আর আমি থাকতে পারছি না—আকাশের আলোর জন্যে প্রাণ আমার ছট্‌ফট্ করছে, চলুন—বাইরে যাই চলুন!'

মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু, আমারও মনটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে। মনে হচ্ছে যেন ভগবানের চোখ কখনো এই অভিশপ্ত অন্ধকারের ভিতরে সদয় দৃষ্টিপাত করে নি, জ্যান্ত মানুষ যেন কখনো এখানে আসতে সাহস করে নি!...আমিও আপনার মতো বাইরে যেতে পারলেই বাঁচি—কিন্তু তার আগে, একবার ওদিকটায় কি আছে, দেখে যেতে চাই।...আসুন!'

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার পর, হাত-ত্রিশ জমি পার হয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুমার আশ্চর্য নেত্রে দেখলে, সেখানেও উপরে ছাদ রয়েছে, কিন্তু সামনের দিকে নীচে আর মাটি নেই, থই থই করছে জল আর জল!

বাঁ দিকে দেওয়াল এবং সামনের দিকেও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট পরে আর-একটা খাড়া দেওয়াল। তারই ভিতরে একটা জলে পরিপূর্ণ দীর্ঘ খাল ডান দিকে সমান চলে গিয়ে অন্ধকারের ভিতরে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনো পাত্তা পাবার জো নেই!

কুমার অবাক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পিছন দিকে কেমন একটা অস্ফুট শব্দ হল।

মোহনলাল বিদ্যুতের মতো ফিরে হাতের লণ্ঠনটা সুমুখে এগিয়ে ধরলে! এবং তার পরেই লণ্ঠনের আলোটা নিবিয়ে দিল!

সে কী দৃশ্য! অনেক দূরে—শুঁড়িপথের যে-দরজা দিয়ে তারা এখানে এসেছে, সেই দরজার ভিতর দিয়ে দলে দলে কারা সব হল-

ঘরের ভিতর এসে ঢুকছে! তাদের অনেকের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, কারুর হাতে বন্দুক এবং কারুর কারুর হাতে চকচক করছে বর্শা বা তরোয়াল! তাদের চেহারা কালো-কালো, গা আদুড় এবং চোখ দিয়ে ঝরছে যেন হিংসার অগ্নিশিখা!

কিন্তু মোহনলাল ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন নিবিয়ে ফেলবার আগেই আগন্তুকরা তাদের দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হাতের সমস্ত আলো নিভে গেল! তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ হল—গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম!

কুমার ও মোহনলালের আশপাশ দিয়ে তিন-চারটে বন্দুকের গুলি সোঁ-সোঁ করে চলে গেল!

মোহনলাল বলে উঠল, 'কুমারবাবু, লাফিয়ে পড়ুন—লাফিয়ে পড়ুন!'

—'কোথায়?'

—'এই খালের জলে! বাঁচতে চান তো লাফিয়ে পড়ুন' —বলেই মোহনলাল লাফ মারলে, সঙ্গে সঙ্গে কুমারও দিলে মস্ত এক লাফ।

ঝপাং, ঝপাং করে দুজনেই জলের ভিতর গিয়ে পড়ল!

মোহনলাল ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠনটা আর একবার জ্বালিয়ে বললে, 'এ জলে দেখছি স্রোতের টান। নিশ্চয়ই কোন নদীর সঙ্গে এর যোগ আছে! সাঁতার দিয়ে স্রোতের টানের সঙ্গে ভেসে চলুন!'

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই হাত কয়েক তফাতে জল তোলপাড় করে প্রকাণ্ড কি-একটা ভেসে উঠল!

কুমার সভয়ে বললে, 'কুমির, কুমির!'

## দশ

### রহস্য বাড়ছে

অন্ধকার !

সামনে দপ্ দপ্ করে দু-টুকরো আগুন জ্বলছে ! সে দুটো কুমিরের চোখ, না সাক্ষাৎ মৃত্যুর চোখ ?

ওপাশ থেকে মোহনলালের স্থির, গম্ভীর অথচ দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুমারবাবু ! টপ্ করে ডুব দিন। ডুব-সাঁতার দিয়ে যতটা পারেন ভেসে যান। আবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়ে ডুব দিয়ে অন্য দিকে এগিয়ে যান। এইভাবে একবার ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলুন !'

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই সামনের আগুন-চোখদুটো নিবে গেল। কুমার বুঝলে, কুমির শিকার ধরবার জন্যে ডুব দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেও দিলে ডুব। নিঃশ্বাস বন্ধ করে জলের তলা দিয়ে ডান দিকে যতটা পারলে সাঁতরে এগিয়ে গেল। তারপর ভেসে উঠে নিঃশ্বাস নিয়েই আবার ডুব দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেল। এমনি করেই বারংবার ভেসে এবং বারংবার ডুবে এঁকেবেঁকে কুমার অনেকক্ষণ সাঁতার দিলে ! সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে লাগল, মোহনলাল বিপদেও কী অটল ! কী তার স্থির বুদ্ধি। সামনে ভীষণ কুমির দেখে সে যখন ভয়ে ভেবড়ে পড়েছে, মোহনলালের মাথা তখন বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করছে ! মোহনলাল যে-কৌশল তাকে শিখিয়ে দিলে সেটা সেও জানত, কিন্তু কুমিরের মুখে পড়ে তার কথা সে স্রেফ ভুলে গিয়েছিল !

কুমিররা লক্ষ্য স্থির করে জলের উপরে ভেসে উঠেই তারপর ডুব দিয়ে ঠিক লক্ষ্য স্থলে গিয়ে শিকার ধরে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাকে সে ধরবে, সে যদি স্থান-পরিবর্তন করে, তা হলে কুমির তাকে আর ধরতে পারে না !

খানিকক্ষণ পরেই কুমার দেখলে যে সামনের দিকে দূরে দিনের ধবধবে আলো দেখা যাচ্ছে! তা হলে ঐটেই হচ্ছে সুড়ঙ্গ-খালের মুখ?

কিন্তু পিছনে কালো জল তোল্‌পাড় করে যে নির্দয় মৃত্যু তখনো এগিয়ে আসছে, তার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাকে তখনি আবার ডুব দিতে হল, আলো দেখে খুশি হবার বা মোহনলালের খোঁজ নেবার অবসর কুমারের এখন নেই!···

সুড়ঙ্গ-খাল শেষ হল, কুমার বাইরের উজ্জ্বল সূর্য কিরণে এসে দেখলে, অদূরেই মোহনলালও নদীর উপরে ভেসে উঠল!···কুমার বুঝলে, খাল কেটে গাঁয়ের কাজলা-নদীর জলই সেই প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এ-সব হচ্ছে সেকেলে ডাকাতদের কাণ্ড।

পিছনে তাকিয়েই দেখলে, সে একগুঁয়ে কুমিরটাও জলের উপরে জেগে উঠল, মোহনলালের খুব কাছেই।

মোহনলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'ভারি তো জ্বালালে দেখছি! এ আপদ যে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না!' কুমির ও মোহনলাল আবার জলের তলায় অদৃশ্য হল।

এবারে কুমার আর ডুব দিলে না, কারণ সে বুঝে নিলে, কুমিরের লক্ষ্য এখন মোহনলালের দিকেই।

আবার মোহনলাল খানিকটা তফাতে গিয়ে ভেসে উঠল এবং কুমিরটাও ভেসে উঠল ঠিক সেইখানেই, একটু আগেই মোহনলাল যেখান থেকে ডুব মেরেছিল! আবার শিকার ফস্‌কেছে দেখে কুমিরটা নিষ্ফল আক্রোশে জলের ওপরে ল্যাজ আছড়াতে লাগল—মানুষ খেতে এসে তাকে এমন বিষম পরিশ্রম বোধ হয় আর কখনো করতে হয় নি!

মোহনলাল বললে, 'না, এ লুকোচুরি খেলা আর ভালো লাগছে না—দেখি, এতেও ব্যাটা ভয় পায় কি না!'—বলেই সে কুমিরের

চোখ টিপ করে উপরি-উপরি তিনবার রিভলভার ছুঁড়ে স াঁৎ করে জলের তলায় নেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে কুমিরও অদৃশ্য!

রিভলভারের গুলিতে কুমির যে মরবে না, কুমার তা জানত। যত বড়ো জানোয়ারই হোক সাধ করে কেউ রিভলভারের গুলি হজম করতে চায় না। তাই এবার মোহনলাল ভেসে ওঠবার পরেও কুমিরটার ল্যাজের একটুখানি ডগা পর্যন্ত দেখা গেল না।

মোহনলাল বললে, 'মানুষ খাবার চেষ্টা করলে যে সব-সময়ে আরাম পাওয়া যায় না, কুমিরটা বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছে! অন্তত তার একটা চোখ যে কাণা হয়ে যায় নি, তাই-বা কে বলতে পারে? ....চলুন, কুমারবাবু, আমরা ডাঙায় গিয়ে উঠি।'

তীরে উঠে মোহনলাল বললে, 'এসেছিলুম পটলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু আপনি কি বলেন কুমারবাবু, এ-অবস্থায় আমাদের কি আর কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত?'

কুমার বললে, 'পটলবাবুর সঙ্গে আর একদিন দেখা করলেই চলবে। আর সত্যিকথা বলতে কি, পটলবাবুর ওপরে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে।'

—'কেন?'

—'পটলবাবুর বাড়ির ভেতরে আজ যা দেখলুম, তার সঙ্গে তাঁর যে যোগ নেই—এটা কি বিশ্বাস করা যায়?'

—'না, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু পটলবাবু তো অনায়াসেই বলতে পারেন যে, এই সেকেলে প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভাঙা ইটের রাশির ভেতরে কোনো মানুষ ভরসা করে পা বাড়ায় না। তিনি এর বার-মহলটাই মেরামত করে নিয়েছেন, এর ভেতরে তিনিও কোনোদিন ঢোকেন নি, সুতরাং এর মধ্যে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তা তিনি কেমন করে জানবেন?'

—'তিনি বললেই আমরা কি মেনে নেব?'

—'অগত্যা। না মেনে উপায় কি? আমাদের প্রমাণ কোথায়?'

বাড়ির ভাঙা মহলগুলো তো দিন রাতই খোলা পড়ে থাকে, বাইরের যে কোনো লোক যখন খুশি তার ভেতরে ঢুকতে পারে—যেমন আজ আমরা ঢুকেছিলুম, অথচ পটলবাবু কিছুই টের পান নি। ডাকাত বা অন্য কোনো বদমাইসের দল কোনো অজানা গুপ্তপথ দিয়ে তার মধ্যে ঢুকে কখন কোথায় আস্তানা পাতে, সে কথা তিনি কি করে জানবেন? ভাঙা বাড়ির ভেতরে যে বাঘের আড্ডা আছে, এটাও তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর বুনো বাঘ যদি মানুষ ধরে খায়, সেজন্যে কেউ পটলবাবুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে না। আর এ হচ্ছে আশ্চর্য বুনো বাঘ—পোড়ো-বাড়িতে থাকে, তিথি-নক্ষত্রের খবর রাখে, অমাবস্যার রাত না হলে তার ক্ষিদে হয় না, গয়না-পরা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কারুকে সে ধরে না, আবার সঙ্গে করে আনে ডাকাতের দল?'

কুমার সন্দেহ পূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'প্রতি অমাবস্যার রাতে এখানে এসে যে দেখা দেয়, সে কি সত্যিসত্যিই বাঘ, না আর কিছু?'

—'আপনি তো স্বচক্ষেই বাঘটাকে দেখেছেন। আমিও দেখেছি। এ যে আসল বাঘই বটে, তারও প্রমাণ আজ পেয়েছি। পোড়ো-বাড়ির অন্ধকার গহ্বরে মানুষের হাড়ের স্তূপ তো দেখেছেন! যাদের রক্ত-মাংস গেছে বাঘের জঠরে, সেই অভাগাদেরই হাড়ের রাশি সেখানে পড়ে রয়েছে।'

কুমার ভাবতে ভাবতে বললে, 'এ বাঘ কি মায়া-বাঘ, না এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড?'

—'গাঁয়ের লোকরাও বলে, এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ আইনের কাছে ভুতুড়ে কাণ্ড বলে কোন কাণ্ডই নেই। আমরা একালের সভ্য লোক, ভূত তো কোন ছার, ভগবানকেই আমরা উড়িয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই! কিন্তু যাক সে কথা। এখন আপনি কি করবেন?'

—'থানায় ফিরে যাব?'

—'কিন্তু সাবধান, আজ যা দেখেছেন, থানার কারুর কাছে তা প্রকাশ করবেন না।'

—'অমাবস্যার রাতের রহস্য যদি জানতে চান, তাহলে একেবারে মুখ বন্ধ করে রাখবেন। পুলিসের কাছে এখন কিছু জানালেই তারা বোকার মতো গোলমাল করে সব গুলিয়ে দেবে। আজ যা দেখলুম তাতে মনে হয়, আপনি চুপচাপ থাকলে আসছে অমাবস্যাতেই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। আজ আর এর বেশি কিছু বলব না। নমস্কার।' মোহনলাল তার বাসার দিকে চলে গেল।

কুমার চিন্তিত মুখে থানার দিকে এগিয়ে চলল। বাসার কাছ-বরাবর এসেই সে দেখলে, চন্দ্রবাবু একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে থানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

কুমারকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললেন, 'এই যে কুমার! তোমার জন্যে আমার বড়ো ভাবনা হয়েছিল।'

—'কেন চন্দ্রবাবু?'

—'আমি শুনলুম তুমি আর মোহনলাল নাকি নদীতে কুমিরের মুখে পড়েছ! এখন তোমাকে দেখে আমার সকল ভাবনা দূর হল। —যাক এ যাত্রা তা হলে তুমি বেঁচে গিয়েছ।'

—'এ যাত্রা কেন চন্দ্রবাবু, অনেক যাত্রাই এমনি আমি বেঁচে গেছি। তবে একদিনের যাত্রায় মরণকে যে আর ফাঁকি দিতে পারব না, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

'কুমিরটা কি মোহনলালের রিভলভারের গুলি খেয়েই পালিয়ে গেছে?'

—'গাঁয়ের চারিদিকেই আমার গুপ্তচর আছে, এ-কথা তো তুমি জানো!...কিন্তু মোহনলাল কোথায়?'

—'তিনি বাসায় গিয়েছেন।'

—'তুমি থানায় গিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো বদলে ফেল, ততক্ষণে আমি মোহনলালের বাড়িটা একবার ঘুরে আসি।'

—'কেন, সেখানে আবার কি দরকার ?'

চন্দ্রবাবু এগুতে এগুতে বললেন, 'আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।'

## এগারো

### এই কি ভুলু-ডাকাত ?

চন্দ্রবাবু যাচ্ছেন মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে ! কেন ?

থানার ভিতরে গিয়ে এখন ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে কুমারের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কিন্তু চন্দ্রবাবুর কথা শুনে কুমার বিশ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেল ; তাড়াতাড়ি চন্দ্রবাবুর পিছনে ছুটে গিয়ে কুমার জিজ্ঞাসা করলে, 'মোহনলালবাবু কি করেছেন ? আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন কেন ?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তুমি তো জানো কুমার, মোহনলালের ওপরে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ আছে। কে সে, কোথাকার লোক, এত বেড়াবার জায়গা থাকতে মানসপুরেই-বা তার বেড়াতে আসবার শখ হল কেন, এ-সব কিছুই আন্দাজ করবার উপায় নেই। তার সবই যেন রহস্যময়। আমার গুপ্তচর দেখেছে, সে প্রায়ই নিশুতি রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেবে দেখ, মানসপুরে সন্ধে হলে যখন সবাই দরজায় খিল এঁটে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মোহনলাল তখন সুন্দরবনের ঝোপে-ঝাপে ঘুরে বেড়ায় ! তাই তো পটলবাবু সন্দেহ করেন যে, মোহনলাল হচ্ছে ভুলু-ডাকাতদেরই দলের লোক।'

কুমার বললে, 'কিন্তু এ-সব তো খালি সন্দেহের কথা ! মোহনলালবাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, এমন কোন প্রমাণ তো আপনি পান নি !'

—'এতদিন তা পাই নি বলেই গ্রেপ্তার করিনি, তবে, মোহনলাল যে সাংঘাতিক লোক এবারে সে-প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

—'প্রমাণ ? কি প্রমাণ ?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার গুপ্তচর এসে কিছুদিন আগে খবর

দিয়ে গিয়েছিল যে, মোহনলালকে সে একটা রিভলভার সাফ করতে দেখেছে। জানো তো, রিভলভার ব্যবহার করলে লাইসেন্স নিতে হয়? আমি কলকাতায় তার করে জেনেছি যে, মোহনলালের নামে কোনো রিভলভারের লাইসেন্স নেই। এ একটা কত-বড়ো অপরাধ, তা কি বুঝতে পারছ কুমার? লাইসেন্স নেই, মোহনলাল তবু রিভলভার ব্যবহার করছে! বিপ্লববাদী কি ডাকাত ছাড়া এমন কাজ আর কেউ করে না। আপাতত এই অপরাধেই আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।'

কুমার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, তবে কি মোহনলাল সত্যি-সত্যিই দোষী? সে কি ডাকাত? মানুষ খুন করাই কি তার ব্যবসা? কিন্তু তা হলে অমাবস্যার রাতের রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে তার এত বেশি আগ্রহ কেন? আর মোহনলাল যদি ডাকাতদেরই কেউ হয়, তবে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ডাকাতদের দেখে ভয়ে পালিয়ে এল কেন? এ-সব কি ছলনা? তার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে চন্দ্রবাবু ও পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে কুমার এগিয়ে চলল এবং ক্রমে অশ্বত্থ-বট ও তাল-নারিকেলের ছায়া-খেলানো আঁকাবাঁকা মেটে পথ দিয়ে কুমার মোহনলালের বাসার সুমুখে গিয়ে পড়ল।

খানিকটা খোলা জমি। মাঝখানে একখানা ছোটো তেতলা বাড়ি। ডান পাশে মস্ত একটা বাঁশঝাড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে এবং বাম পাশ দিয়ে বর্ষায়, কাজলা নদীর ঘোলা জল নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে।

চন্দ্রবাবু ও কুমার বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। চন্দ্রবাবু দুজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, 'বাড়ির পেছনে একটা খিড়কির দরজা আছে। তোমরা সেই দরজায় গিয়ে পাহারা দাও।'

পাহারাওয়ালারা তাঁর হুকুম তামিল করতে ছুটল। চন্দ্রবাবু দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন, কিন্তু কোনোই সাড়া পাওয়া গেল না।

চন্দ্রবাবু কড়া নাড়তে নাড়তে এবারে চিৎকার শুরু করলেন, 'মোহনলালবাবু, ও মোহনলালবাবু!'

সাড়াশব্দ কিছুই নেই। আরো কিছুক্ষণ কড়া নেড়ে ও চিৎকার করে চন্দ্রবাবু শেষটা ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, 'মোহনলালবাবু এ ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইবারে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলব!'

এতক্ষণে দরজাটা খুলে গেল। মস্ত-বড়ো একমুখ পাকা দাড়ি-গোঁফ নিয়ে একটা খোট্টা চাকর দরজার উপরে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকে খোঁজা হচ্ছে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলালবাবু কোথায়?'

সে জানালে, বাবু তেতলার ছাদের উপর আছেন।

তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চারজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে চন্দ্র-বাবু বেগে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকলেন, কুমারও পিছনে পিছনে গেল।

সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সকলে দ্রুতপদে একেবারে তেতলার ছাদে গিয়ে উঠল। তেতলার ছাদের উপরে একটা চিলে ছাদ। মোহনলাল পরম নিশ্চিন্ত মুখে সেই ছাদের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল, তবু মশাইয়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না কেন?'

মোহনলাল গম্ভীরভাবে শান্ত স্বরে বললে, 'আমি যে গান গাইছিলুম! গান গাইতে গাইতে সাড়া দেব কেমন করে?'

চন্দ্রবাবু চটে-মটে বললেন, 'আবার ঠাট্টা হচ্ছে? এখন লক্ষ্মী-ছেলের মতো সুড়সুড় করে ওখান থেকে নেমে এস দেখি, তারপর দেখা যাবে, তুমি কেমন গান গাইতে পার।'

মোহনলাল একগাল হেসে বললে, 'আমাকে এত আদর করে নীচে নামতে বলছেন কেন চন্দ্রবাবু?'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমাকে দিল্লীর লাড্ডু খাওয়াব কি না, তাই এত সাধাসাধি করছি?'

মোহনলাল খুব ফুর্তির সঙ্গে দুইহাতে তুড়ি দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে গান ধরে দিলে—

'লাড্ডু যদি এনে থাকো, গিয়ে দাদা দিল্লী
ঢেকেঢুকে রেখো, যেন খায় নাকো বিল্লী!
কিবা তার তুল্য?
শুনে মন ভুল্লো!
খেলে যেন বোলো নাকো—কেন সব গিল্লি?'

চন্দ্রবাবু রেগে টং হয়ে বললেন, 'আবার আমার সঙ্গে মস্করা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমায় মজাটা!'

মোহনলাল তেমনি হাসিমুখে বললে, 'মজা দেখাবেন? দেখান না চন্দ্রবাবু! আমি মজা দেখতে ভারি ভালোবাসি!'

—'হ্যাঁ, দু-হাতে যখন লোহার বালা পরবে, মজাটা তখন ভালো করেই টের পাবে বাছাধন!'

বিস্মিত স্বরে মোহনলাল বলল, 'লোহার বালা? সে কি দাদা? আপনাদের দেশে সোনার বালা কেউ পরে না?'

চন্দ্রবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ফের ঠাট্টা? তবে রে পাজি! তবে রে ডাকু! চৌকিদার! যাও, চিলের ছাদে উঠে ও-বদমাইসটাকে কান ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে এস তো।'

পাহারাওয়ালারা অগ্রসর হল, কিন্তু মোহনলাল একটুও দমল না! হো হো করে হেসে উঠে ডানহাতখানা হঠাৎ মাথার উপর তুলে সে বললে, 'আমার ডানহাতে কি রয়েছে, সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো?'

মোহনলালের ডানহাতে কালো রঙের গোলাকার কি-একটা জিনিস রয়েছে বটে! চন্দ্রবাবু সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ওটা?'

'বোমা।'

শুনেই পাহারাওয়ালারা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল! মোহনলাল বললে, 'আমার দিকে কেউ আর এক পা এগিয়ে এলেই আমি এই বোমা ছুঁড়ব—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়িখানা উড়ে যাবে!'

চন্দ্রবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'কিন্তু তা হলে তুমিও বাঁচবে না!'

—'না, আমিও বাঁচব না, আপনারাও বাঁচবেন না!'

চন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মোহনলাল, আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি পালাতে পারবে না। কর্তব্যের জন্যে যদি আমাকে মরতে হয়, তা হলে আমি মরতেও রাজি আছি।'

আচম্বিতে ভীষণ চীৎকার করে মোহনলাল বললে, 'তবে মর!'—বলেই হাতের সেই বোমাটা সে সজোরে চন্দ্রবাবুর দিকে নিক্ষেপ করলে!

পর-মুহূর্তে কুমারের মনে হল চোখের সামনে সারা পৃথিবীর আলো দপ্ করে নিবে গেল এবং ভয়ংকর একটা শব্দের সঙ্গে রাশীকৃত ভাঙা ইঁট-কাট ধুলো-বালি ও রাবিশের ফোয়ারার মধ্যে তার দেহটা হাড়গোড় ভাঙা দ-এর মতোন আকাশের দিকে ঠিক্‌রে উঠে গেল!

—এবং তার পরে বিস্ময় আর আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা সামলে দেখলে,—না, তারা আকাশে উড়ে যায় নি, পৃথিবীতেই বিরাজ করছে এবং চোখের সমুখেই ছাদের উপরে একটা কালো রবারের বল লাফিয়ে খেলা করছে! দু-হাতে মুখ চেপে চন্দ্রবাবু ছাদের উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন এবং চারজন পাহারাওয়ালা চার দিকে চিৎপাত বা উপুড় হয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে!

বার বার বিপদে পড়ে কুমারের আত্মসংবরণ করবার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল, তাই সকলের আগে সেই-ই বুঝতে পারলে যে মোহনলাল

যেটা ছুড়েছিল, সেটা বোমা-টোমা কিছুই নয়, একটা তুচ্ছ রবারের বল মাত্র।

সকৌতুকে হেসে উঠে কুমার বললে, 'চন্দ্রবাবু, ও চন্দ্রবাবু! চোখ খুলে দেখুন, আমরা কেউ এখনো-সশরীরে স্বর্গে যাই নাই।'

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে একটা নিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ? আমরা বেঁচে আছি? আমরা মরি নি? বল কি হে! বোমাটা তা হলে ফাটে নি? দুর্গা, দুর্গা—মস্ত একটা ফাঁড়া কেটে গেল!'

কুমার বললে, 'না বোমা ফাটে নি—ঐ যে, আপনার পায়ের তলাতেই বোমাটা পড়ে রয়েছে।'

ঠিক স্প্রিংওয়ালা পুতুলের মতো মস্ত একটা লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রবাবু বললেন, 'বল কি হে? চৌকিদার! এই চৌকিদার! বোমাটা শিগ্‌গির এখান থেকে সরিয়ে ফ্যাল—শিগ্‌গির! নইলে এখনো হয়তো ওটা ফাটতে পারে!'

কুমার বললে, 'ঠাণ্ডা হোন, চন্দ্রবাবু ঠাণ্ডা হোন। বোমা ছোঁড়ে নি—ওটা রবারের বল ছাড়া আর কিছুই নয়!'

চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে বলটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গর্জন করে বললেন, 'কী! আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা? তবে রে রাস্কেল'—বলে চিলে ছাদের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়েই তার মুখ যেন সাদা হয়ে গেল! বিদ্যুতের মতো চারি দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি আবার বললেন, 'মোহনলাল? মোহনলাল কোথায় গেল?'

কুমার সচমকে চিলেছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই তো, সেখান থেকে মোহনলালের মূর্তি যেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়েছে!

চন্দ্রবাবু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'কোথায় গেল মোহনলাল? কোন দিক দিয়ে সে পালাল?'

কুমার বললে, 'এখান থেকে পালাবার কোনো পথই নেই।'

—'তবে কি সে মরিয়া হয়ে চারতলার ছাদ থেকেই নীচে লাফ মারলে?'—বলেই চন্দ্রবাবু ছুটে ছাদের ধারে গিয়ে নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সেখানেও মোহনলালের চিহ্নমাত্র নেই।

কপালে করাঘাত করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'অ্যাঁ! একটা বাজে আর বিশ্রী ঠাট্টা করে লোকটা কি-না আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল? উঃ! কী ভয়ানক লোক রে বাবা! এর পরেও আমার চাকরি আর কি-করে বজায় থাকে বল!'

কিন্তু কুমার এত সহজে বোঝ মানবার ছেলে নয়। সে কিছু না বলে বরাবর নেমে এক-তলায় গেল। তার পর বাড়ির বাইরে ঠিক চিলে ছাদের নীচে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে যা দেখলে তা হচ্ছে এই ঃ

ঠিক চিলে ছাদের নীচেই, মাটির উপরে প্রায় দু-গাড়ি বালি স্তূপাকার হয়ে আছে। এবং সেই বালি স্তূপের মধ্যে একটা বড়ো গর্ত—অনেক উঁচু থেকে যেন একটা ভারি জিনিস সেখানে এসে পড়েছে! মোহনলাল তা হলে ছাদের উপর থেকে এই নরম বালির গাদায় লাফিয়ে পড়ে অনায়াসেই চম্পট দিয়েছে?

কুমার তখনই চন্দ্রবাবুকে ডেকে এনে ব্যাপারটা দেখালে। দেখে-শুনে চন্দ্রবাবু তো একেবারেই অবাক! খানিক পরে দুই চোখ ছানাবড়ার মতোন বড়ো করে তিনি বলে উঠলেন, 'সাবাস বুদ্ধি! মোহনলাল যে দেখছি পালাবার পথ আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল! কুমার আমি হলপ্ করে বলতে পারি, এই মোহনলাল বড়ো সহজ লোক নয়, সে এখানে বেড়াতেও আসে নি—এ ভুলু-ডাকাতের চরও নয়—এ হচ্ছে নিজেই ভুলু-ডাকাত!'

থানায় ফিরে আবার নতুন এক বিস্ময়! কুমার নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, মেঝের উপর একখানা খাম পড়ে আছে—যেন জানলা গলিয়ে কেউ সেখানা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

চিঠিখানা এই ঃ

কুমারবাবু,

'আসছে অমাবস্যার রাতে আপনি পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির শুঁড়িপথের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাপে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন। সঙ্গে বন্দুক, রিভলভার আর টর্চ-লাইট নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

আসছে অমাবস্যার রাতেই রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে!'

ইতি—বন্ধু।

পুনঃ—এই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রবাবুর কাছে প্রকাশ করবেন না।'

কুমার চিঠি পড়ে নিজের মনেই বললে, 'কে এই চিঠি লিখেছে? বন্ধু? এখানে কে আমার বন্ধু? মোহনলাল? সে তো পলাতক! তবে কি বনের ভেতরে গর্তের ভিতর থেকে আমাকে যে উদ্ধার করেছিল, এ কি সেই ব্যক্তি? কে সে?'

কুমারের ভাবনায় বাধা পড়ল। আচম্বিতে ঝড়ের মতো চন্দ্রবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন—তাঁরও হাতে একখানা চিঠি!

চন্দ্রবাবু বললেন, 'দেখ কুমার, এ আবার কি ব্যাপার! আমার

শোবার ঘরের ভেতরে বাইরে থেকে এই চিঠিখানা কে ছুঁড়ে-ফেলে দিয়েছে!'

চিঠিখানা নিয়ে কুমার বুঝলে, একই লোক তাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছে। এ পত্রখানায় লেখা ছিল—

চন্দ্রবাবু,

'আসছে অমাবস্যার রাতে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির পিছনে কাজলা নদীর জল যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, ঠিক সেইখানেই অনেক লোকজন আর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকবেন।

সেই রাত্রেই আপনি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন।' ইতি—বন্ধু।

## বারো

### আবার সেই রাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অমাবস্যার সেই ভয়ানক রাত আবার এসেছে—কিন্তু বারোটা বাজতে এখনো অনেক দেরি।

কুমার নিজের ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলে, চন্দ্রবাবু ধড়া-চুড়ো পরে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই অজানা 'বন্ধু'র কথামতো চন্দ্রবাবু যে আজ পটলবাবুর বাড়ির পিছনে কাজলা-নদীর সুড়ঙ্গ-খালের মুখে গিয়ে সদলবলে পাহারা দিতে ভুলবেন না, কুমার তা বেশ জানত। এবং এটাও সে জানত যে, যাবার আগে তারও ডাক পড়বে—চন্দ্রবাবু তাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে বলবেন।

কিন্তু সেই অজানা 'বন্ধু' তাকে ভাঙা-বাড়ির শুঁড়িপথের কাছাকাছি কোনো ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। চন্দ্রবাবুর কাছে আবার এ-কথা প্রকাশ করতে বারণও আছে, তাই কুমার তাঁকে কোনো কথাই জানায় নি। কাজে-কাজেই পাছে চন্দ্রবাবু তাকে সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন, সেই ভয়ে কুমার চুপি চুপি থানা থেকে আগে থাকতেই বেরিয়ে পড়ে পটলবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু এই অজানা বন্ধুই-বা কে, আর চন্দ্রবাবুর কাছে এত লুকোচুরির কারণই-বা কি, অনেক মাথা ঘামিয়েও কুমার সেটা আন্দাজ করতে পারে নি। আজও সেই কথাই ভাবতে ভাবতে কুমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ চলতে লাগল।

অন্ধকারকে আরো ঘন করে তুলে ঐ তো পটলবাবুর প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দেওয়ালকে শক্ত শিকড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে যে সব বড়ো-বড়ো অশত্থ-বট মাথা খাড়া করে আছে, প্রবল বাতাসে নিজেরা দুলতে দুলতে তারা যেন অন্ধকারকেও দুলিয়ে দিয়ে বলছে—'সর-সর-সর, মর-মর-মর মর!' কুমারের

মনে হল, অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর থেকে যেন সজাগ ভুতুড়ে পাহারা-ওলারা কথা কইছে !

আন্দাজে-আন্দাজে সে সেই মস্ত-বড়ো ভাঙা সিং-দরজার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অন্ধকারে আর তো এগোনো চলে না। কুমার কান পেতে খুব তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু দেখাও যায় না এবং গাছপালার মর্মর-শব্দ ছাড়া আর-কিছু শোনাও যায় না। সে তখন টর্চ-লাইটটা টিপে মাঝে মাঝে আলো জ্বেলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

আবার সেই-সব বিভীষিকা ! মাথার উপরে উড়ন্ত প্রেতাত্মার মতো ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করে বাদুড়ের দল যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে,—দু-দুটো গোখরো সাপ ফণা তুলে ফোঁস্ করে উঠেই টর্চ-লাইটের তীব্র আলোয় ভয় পেয়ে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে পালিয়ে গেল, চকমিলানো ঘরগুলোর ও দালানের আনাচ-কানাচ থেকে যেন কাদের হিংসুক, ক্ষুধিত ও জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যায়। দিনের বেলাতেই যে নির্জন, বিপদপূর্ণ বাড়ির ভীষণতা মনকে একেবারে কাবু করে দেয়, অমাবস্যার কালো রাতে সে-বাড়ি যে আরো কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, কুমারের আজ সেটা আর বুঝতে বাকি রইল না। তবু সেদিন মোহনলাল সঙ্গে ছিল, আর আজ সে একা ! কুমারের প্রাণ খুব কঠিন, তাই এখনো সে অটল পদে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ত !

কুমার ভয় পেলো না বটে, কিন্তু তারও বার বার মনে হতে লাগল, এই প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়িটা হানাবাড়ি না হয়ে যায় না ! —এ হচ্ছে নিষ্ঠুর ডাকাত-জমিদারের বাড়ি, কত মানুষ এখানে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে অপঘাতে মারা পড়েছে, কে তা বলতে পারে ? নিশ্চয়ই তাদের আত্মার গতি হয় নি—নিশ্চয়ই তারা নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে উঁকি মেরে তাকে দেখছে !

আচম্বিতে কুমার সচমকে শুনলে, ঠিক তার পিছনে কার পায়ের শব্দ! সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান পেতে শুনলে। শব্দ-টব্দ কিছুই নেই! তারই শোনবার ভুল—এই ভেবে কুমার আবার এগুলো।—আবার সেই পায়ের শব্দ! আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও থেমে গেল!

না, তার শোনবার ভুল নয়। কেউ তার পিছু নিয়েছে! কিন্তু কে সে? ভূত, না হিংস্র জন্তু?

সন্তর্পণে কুমার অগ্রসর হল, অমনি সেই পায়ের শব্দও জেগে উঠল।

হঠাৎ কুমার তীরবেগে ফিরে দাঁড়ালো—তার একহাতে জ্বলন্ত টর্চ-লাইট আর একহাতে রিভলভার!

কারুকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু উঠানের উপরে একটা মস্ত ঝোপ দুলছে। কেউ কি ওখানে লুকিয়ে আছে? যদি সে তাকে দেখে থাকে, তা হলে তারও আর আত্মগোপন করা বৃথা!

অত্যন্ত সাবধানে, রিভলভারের ঘোড়ার উপরে আঙুল রেখে, টর্চের পূর্ণ আলো ঝোপের উপরে ফেলে কুমার পায়ে পায়ে সেই দিকে ফিরে গেল।

ঝোপের সুমুখে গিয়ে কুমার শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'যদি কেউ এখানে থাকো, তা হলে বেরিয়ে এসো,—নইলে এই আমি গুলি করলুম।'

কোনো সাড়া নেই। ভালো করে সে তখন ঝোপটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না, কেবল খানিক তফাতের আর-একটা ঝোপ থেকে একটা শেয়াল বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

হয়তো ঐ শেয়ালের পায়ের শব্দেই সে ভয় পেয়েছে—এই ভেবে কুমার আবার অগ্রসর হল। দু-পা যায়, থামে, আর শোনে। কিন্তু পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না।

ঐ তো সেই শুঁড়িপথ! সে আর মোহনলাল সেদিন ওরই মধ্যে ঢুকে বিপদে পড়েছিল। আজ এখানেই তার অপেক্ষা করবার কথা।

ঝোপ-ঝাপ এখানে সর্বত্রই। শুঁড়িপথের একপাশে এমন একটা ঝোপ বেছে নিয়ে কুমার গা-ঢাকা দিয়ে বসল—যাতে তার পিছন-দিকে থাকে বাড়ির দেওয়াল। অন্তত পিছন দিক থেকে কোন গুপ্তশত্রুর আক্রমণের ভয় আর রইল না।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কুমার অবাক হয়ে শুনলে, খুব কাছেই অন্তরালে বসে কে যেন সকৌতুকে প্রবল হাসির ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে যেই-ই হোক, কুমারের আর খোঁজাখুঁজি করবার আগ্রহ হল না। সে কেবল বাঁধন খুলে পিঠের বন্দুক হাতে নিলে। যখন তার পিছনে রইল দেওয়াল আর হাতে রইল বন্দুক আর সামনের দিকে জেগে রইল তার সাবধানী দুই চক্ষু, তখন কোন শত্রুরই তোয়াক্কা সে রাখে না! জন্তু, মানুষ ও অমানুষ, অমন অনেক শত্রুকেই এ-জীবনে সে দেখেছে, শত্রুর ভয়ে তার বুক কোনদিন কাঁপে নি, আজও কাঁপবে না।

কিন্তু, শত্রু তবু এল! একলা নয়, চুপি-চুপি নয়—দলে দলে, ভীম বিক্রমে কোলাহল করতে করতে! অমন উঁচু দেওয়াল তার পৃষ্ঠরক্ষা করতে পারলে না এবং তার গুলি-ভরা বন্দুক-রিভলভারও তাদের পিছনে হটাতে পারলে না—তাদের কাছে কুমারকে আজ কাপুরুষের মতোন পরাজয় স্বীকার করতে হল—হয়তো আজ তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে!

কুমার ভ্রমেও সন্দেহ করে নি যে, ঝোপ-ঝাপের ভিতরে এমন অসংখ্য শত্রু এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল! তারা হচ্ছে ডাঁশ-মশা!

উঃ, কী তাদের হুলের জোর, আর তাদের বিজয়-হুঙ্কার, আর কী তাদের অশ্রান্ত আক্রমণ! দেখতে দেখতে কুমারের হাত-

পা-মুখ ফুলে উঠতে শুরু করলে, নাকের ডগাটা দেখতে হল যেন দু-গুণ বড়ো একটা টোপাকুলের মতো এবং গাল ও কপাল হয়ে গেল দাগড়া দাগড়া! মুখ ও হাত-পা পেটের ভিতরে যথাসাধ্য গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুমার ঝোপের মধ্যে পড়ে রইল, যেন একটা কুমড়ো! ময়নামতীর মায়াকাননের মাংসের মস্ত পাহাড়ের মতো ডাইনসরও তাকে বোধ হয় এতটা কাবু করে ফেলতে পারত না!
কুমার ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল—এ মশার পালের হাজার হাজার হুলের খোঁচার চেয়ে অমাবস্যার রাতের সেই ভয়াবহ ব্যাঘ্রের থাবা তার কাছে এখন ঢের বেশি আরামের বলে মনে হল।

···আচম্বিতে চারিদিক কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল! কুমার হাতের রেডিয়াম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে মোটে আর দেড়-মিনিট দেরি আছে।

কি-একটা আসন্ন আতঙ্কের সম্ভাবনায় স্তম্ভিত অন্ধকার যেন আরো কালো হয়ে উঠল! অন্ধ রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন ভয়ে টিপ্-টিপ্ করতে লাগল—প্যাঁচা, বাদুড় ও চামচিকের মিলিত আর্তনাদে চারিদিকের স্তব্ধতা যেন ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল—পোড়ো-বাড়ির অলি-গলিতে এতক্ষণ যারা নিশ্চিন্ত হয়ে লুকিয়েছিল, সেই-সব অজানা নানা পশুর দল পর্যন্ত কি এক দুরন্ত বিভীষিকা দেখে প্রাণভয়ে বেগে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করলে! এখন এ স্থান যেন—মানুষ তো দূরের কথা—বন্য পশুর পক্ষেও নিরাপদ নয়।

কুমার হাজার হাজার মশার কামড় পর্যন্ত ভুলে গেল—তার বাঁ-হাত ধরে আছে বন্দুকটা এবং তার ডান-হাত স্থির হয়ে আছে বন্দুকের ঘোড়ার উপরে!

হঠাৎ ও কী ও? অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে একটা আঁধারে-লণ্ঠন হাতে নিয়ে আচম্বিতে এক মনুষ্য-মূর্তি আবির্ভূত হল এবং এত তাড়াতাড়ি স্যাৎ করে দৌড়ে সেই ভীষণ শুঁড়িপথের ভিতরে

মিলিয়ে গেল যে, কুমার তার মুখ পর্যন্ত দেখবার সময় পেলে না! তাকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সত্যিই কি সে মানুষ?

চারিদিকের জীবজন্তুর ছুটোছুটি, পঁ্যাচা-বাদুড়, চামচিকের চ্যাঁচামেচি অকস্মাৎ থেমে গেল এবং পর-মুহূর্তে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতার মধ্যে পোড়োবাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এবং তারপরেই সেই অপার্থিব স্তব্ধতা ছুটিয়ে দিল ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন! একবার, দুবার, তিনবার সেই গর্জন জেগে উঠে পৃথিবীর মাটি থরথরিয়ে কাঁপিয়ে আকাশ-বাতাসকে থমথম করে দিলে,—তারপর সব আবার চুপচাপ!

কয়েক মুহূর্ত কাটলো। তারপর কুমারের চোখ দেখলে শুঁড়ি-পথের সামনে কি একটা ভয়ঙ্কর ছায়া তার দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়াল। পিছন থেকে কে চুপিচুপি বললে, 'ঐ বাঘ! গুলি কর—গুলি কর!'

কে যে এ-কথা বললে, কুমারের তা আর দেখবার অবকাশ রইল না, তাড়াতাড়ি সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন থেকেও কে বন্দুক ছুঁড়লে!

গুড়ুম! গুড়ুম! পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড আর্তনাদের পর আর্তনাদে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এও বেশ বোঝা গেল যে খুব ভারি একটা দেহ মাটির উপরে পড়ে ছটফট করছে! অল্পক্ষণ পরে সব শব্দ থেমে গেল।

পিছন থেকে আবার কে বললে, 'শান্তি! অমাবস্যার রাতে আর এখানে বাঘ আসবে না!'

কুমার একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে 'টর্চ'টা জ্বেলে ফেললে।

পিছনে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে করে মোহনলাল।

কুমার সবিস্ময়ে বললে, 'আপনি?'

—'হ্যাঁ আমি। খানিক আগে আমাকেই আপনি ঝোপে-ঝাপে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।'

—'তাহলে আমাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন আপনিই?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু সে-কথা এখন থাক, আগে দেখা যাক বাঘটা মরেছে কি না।'

কুমার 'টর্চে'র আলো শুঁড়িপথের দিকে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।……তারপরেই অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে সে বলে উঠল, 'কি সর্বনাশ! বাঘটা কোথায় গেল? ওখানেও যে একটা মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে!'

দেহটার কাছে গিয়ে মোহনলাল কিছুই যেন হয় নি, এমন

সহজ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, এ হচ্ছে ভুলু-ডাকাতের দেহ। এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

যা দেখা গেল, তাও কি সম্ভব? কুমারের মনে হলো সে যেন কি একটা বিষম দুঃস্বপ্ন দেখছে!

মাটির উপরে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পটলবাবুর মৃতদেহ!

কুমার অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, 'অ্যাঃ! এ তো বাঘও নয়, ভুলু ডাকাতও নয়,—এ যে আবার পটলবাবু!'

মোহনলাল বললে, 'পটলবাবু!'—কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল, হঠাৎ দূর থেকে ঘন ঘন অনেকগুলো বন্দুকের গর্জন শোনা গেল।

কুমার চমকে উঠে বললে, 'ও আবার কি?'

—'ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ হচ্ছে। শীগগির আমার সঙ্গে আসুন'—বলেই কুমারকে হাত ধরে টেনে নিয়ে মোহনলাল দ্রুতপদে ছুটতে আরম্ভ করলে।

## তেরো

### আশ্চর্য কথা

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল ছুটতে ছুটতে একটা চৌমাথায় এসে পড়ল। বাঁ-হাতি পথটা গেছে কাজলা-নদীর দিকে—যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের সামনে ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের লড়াই বেধেছে।

মোহনলাল সে-পথও ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কুমার বিস্মিত হয়ে বললে, 'একি মোহনলালবাবু! আমরা নদীর দিকে যাব যে।'

—'না।'

—'না। তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'আমার বাসায়।'

—'সেখানে কেন?'

—'দরকার আছে বলেই সেখানে যাচ্ছি। কুমারবাবু, এখন কোন কথা কইবেন না, চুপ করে আমার সঙ্গে আসুন।'······বাসার দরজায় এসে ধাক্কা মেরে মোহনলাল বললে, 'ওরে, আমি এসেছি। শীগগির দরজা খোল।'

দরজা খুলে গেল এবং ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই পাকা আমের মতন বুড়ো খোট্টা দরোয়ানটার মুখ।

বাড়ির দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে ধপ করে বসে পড়ে মোহনলাল বললে, 'কুমারবাবু বসুন। একটু হাঁপ ছেড়ে নিন।'

খানিকক্ষণ দু-জনেই নীরব। তারপর প্রথমে কথা কইলে কুমার। বললে, 'মোহনলালবাবু, আপনার উদ্দেশ্য কি? যে-সময়ে আমার উচিত, চন্দ্রবাবুকে সাহায্য করা, ঠিক সেই সময়েই আমাকে আপনি এখানে টেনে আনলেন কেন?'

মোহনলাল বললে, 'আপনার সাহায্য না পেলেও চন্দ্রবাবু হাহাকার করবেন না। আপনি না গেলেও তিনি যে আজ ভুলু ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।'

কুমার বললে, 'তবু আমার সেখানে যাওয়া উচিত।'

মোহনলাল সে-কথার জবাব না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'কুমারবাবু আপনি Margaret A, Murray's Witch cult in Western Europe নামে বইখানা পড়েছেন ?

এ-রকম খাপছাড়া প্রশ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে কুমার বললে, 'না।'

—'আপনি ডাইনী বিশ্বাস করেন ?'

—'ডাইনীদের অনেক গল্প শুনেছি বটে। সে-সব গল্পে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করছেন কেন ?'

মোহনলাল আবার প্রশ্ন করল, 'কুমারবাবু, hycanthroby কাকে বলে জানেন ?'

—'না।'

'য়ুরোপের ডাইনীরা নাকি hycanthroby-র মহিমায় মানুষ হয়েও নেকড়ে-বাঘের আকার ধারণ করতে পারত।'

কুমার বিরক্ত হয়ে বললে, 'পারত তো পারত, তাতে আমাদের কি ?'

কুমারের বিরক্তি আমলে না এনে মোহনলাল বললে, 'আমাদের দেশেও অনেকে বলেন, মন্ত্রতন্ত্র বা বিশেষ কোন ঔষধের গুণে মানুষ নাকি বাঘের আকার ধারণ করতে পারে।'

এতক্ষণে কুমারের মাথায় ঢুকল মোহনলাল কি বলতে চায়! একলাফে উঠে পড়ে কুমার উত্তেজিত স্বরের বললে, 'মোহনলালবাবু,

মোহনলালবাবু! তবে কি আপনার মতে, এখানকার অমাবস্যার রাতের বাঘটাও হচ্ছে সেইরকম কোন অস্বাভাবিক জীব?'

মোহনলাল গম্ভীর স্বরে বললে, 'আমার কোন মতামত নেই। মানুষ যে বাঘ হতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিজ্ঞানও তা মানে না। কিন্তু মানসপুরে এই যে-সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল, এর মূলেই বা কি রহস্য আছে?.........গোড়া থেকে একবার ভেবে দেখুন। বাঘ দেখা দিয়েছে কেবল অমাবস্যার রাতে, ঠিক বারোটার সময়ে। সাধারণ পশুরা এমন তিথিনক্ষত্র বিচার করে ঘড়ি ধরে বেরোয় না। এই অদ্ভুত বুদ্ধিমান বাঘের কবলে যারা পড়েছে, তারা সকলেই স্ত্রীলোক, আর তাদের সকলের গায়েই অনেক টাকার গহনা ছিল। সাধারণ বাঘ কেবল গয়নাপরা স্ত্রীলোক ধরে না।......তারপর বুঝুন, আপনি আর আমি দু-জনেই দু-বার বাঘ দেখেছি, আপনি গুলি ছুঁড়েছেন কিন্তু দু-বারেই বাঘের বদলে পাওয়া গেল মানুষকে—অর্থাৎ পটলবাবুকে—প্রথমবারে আহত আর দ্বিতীয়বারে মৃত অবস্থায়। দু-বারই বাঘের আবির্ভাব আমাদের চোখে পড়েছে, তার পায়ের দাগও দেখা গেছে, তার রক্তমাখা লোমও আমি পেয়েছি, কিন্তু তার দেহ অদৃশ্য হতেও আমরা দেখি-নি, অথচ তা খুঁজেও পাওয়া যায় নি। উপরন্তু দু-দুবারই পটলবাবু যে কখন ঘটনাস্থলে এসেছেন, তা আমরা দেখতে পাইনি।.........য়ুরোপে এমনি মায়া-নেকড়ে বাঘের অসংখ্য কাহিনী আছে। সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে যখন তারা মরেছে, তখন আবার মানুষেরই আকার পেয়েছে।'

কুমার রুদ্ধশ্বাসে, অভিভূত স্বরে বলে উঠল, 'তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, পটলবাবুই বাঘের আকার ধারণ করে—'

মোহনলাল বাধা দিয়ে বললে, 'আমি ও-রকম কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি দেখাতে চাই যে, সমস্ত প্রমাণ পরে পরে সাজালে ঠিক যেন মনে হবে, কোন মায়া-ব্যাঘ্রই মানসপুরের এই সব ঘটনার

জন্য দায়ী। যাঁরা এটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবেন, তাঁদেরও মতে আমি সায় দিতে রাজী আছি। মানুষ যে ব্যাঘ্র-মূর্তি ধারণ করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না—কারুকে আমি বিশ্বাস করতেও বলি না।'

কুমার বললে, 'তবে—'

মোহনলাল আবার বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। ভুল্লু-ডাকাত আর পটলবাবু একই লোক। নিজে সকলের সামনে নিরীহ ভালো মানুষটির মতোন থেকে পটলবাবু তাঁর ভাঙা বাড়ির অন্ধকূপের মধ্যে ডাকাতের দল পুষতেন। কালু-সর্দার তাঁরই দলের লোক। অমাবস্যার রাতে বাঘের উপদ্রবের সুযোগে, তাঁরই হুকুমে কালু দল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত। নৌকোয় চড়ে সুড়ঙ্গ-খাল দিয়ে ডাকাতেরা দল বেঁধে বাইরে বেরিয়ে আসত—গভীর রাত্রে কাজলা-নদীর বুকে তাদের নৌকা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

কুমার বললে, 'সবই যেন বুঝলুম। কিন্তু আপনি কে?'

খুব সহজ স্বরেই উত্তর হলো, 'আমি? আমি হচ্ছি মোহনলাল। অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি।'

কুমার বললে, 'কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির কাছে রিভলভার-বন্দুক থাকে কেন?'

মোহনলাল সহাস্যে বললে, 'সুন্দরবনে খুব নিরীহ ব্যক্তিরও রিভলভার-বন্দুক না হলে চলে না।'

—'মানলুম, কিন্তু তারাও রিভলভার-বন্দুকের জন্যে লাইসেন্স নেয়। আপনার কি লাইসেন্স আছে?'

—'না।'

—'লাইসেন্স না নিয়ে রিভলভার-বন্দুক রাখে কেবল গুণ্ডা, খুনে আর বদমাইসরা।'

—'হুঁ, এ-কথা সত্য বটে।'

—'তবে ? কে আপনি বলুন।'

মোহনলাল ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল !

কুমার দৃঢ়স্বরে বললে, 'পুলিশের ভয়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, সে কখনোই ভালো লোক নয়।'

মোহনলাল কৌতুক-ভরে বললে, 'ও আপনার কী বুদ্ধি কুমারবাবু ! আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। আমি ভালো লোক নই।'

কুমার বললে, 'বাজে কথায় ভুলিয়ে সেবারে আমাদের চোখে আপনি খুব ধুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারে সেটি আর হচ্ছে না।'

মোহনলাল বললে, 'ঐ শুনুন, কারা আসছে !'

নীচের সিঁড়িতে ধুপ-ধুপ করে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন কারা বেগে উপরে উঠছে ! এ আবার কোন শত্রুর দল আক্রমণ করতে আসছে ? কুমার তাড়াতাড়ি উঠে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল !

ঝড়ের মতো যারা ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল, তারা শত্রু নয় ! চন্দ্রবাবু আর তাঁর পাহারাওয়ালারা।

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আরে, এ কী ! কুমার, তুমি এখানে !'

কুমার বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মোহনলালবাবুর সঙ্গে আলাপ করছিলুম !'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলাল ? কোথায় সে দুরাত্মা ? আমিও তো তারই খোঁজে এখানে এসেছি ! আজ আমি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করেছি, কেবল ভুলুকেই পাইনি। আমার বিশ্বাস, মোহনলাল ভুলু-ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়।'

কুমার ফিরে দেখলে, মোহনলাল আর সে ঘরে নেই !

## চৌদ্দ

### মোহনলাল গ্রেপ্তার

মোহনলাল যেখানে বসে ছিল, তার পিছনেই একটি বন্ধ দরজা—এ-ঘর থেকে আর একটা ঘরে যাবার জন্যে।

কুমার বললে, 'মোহনলাল নিশ্চয়ই ও-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বাঘের মতো সেই দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রবাবু বললেন, 'মোহনলাল, এবারে আর তোমার বাঁচোয়া নেই! সমস্ত বাড়ি আমি ঘেরাও করে ফেলেছি, একটা মাছি পর্যন্ত এখান থেকে বেরুতে পারবে না। ভালো চাও তো দরজা খোলো।'

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এলো, 'আজ্ঞে, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মোহনলাল তো এ-ঘরে নেই!'

চন্দ্রবাবু রাগে গরগর করতে করতে বললেন, 'সেদিনকার মতো আবার আজ ঠাট্টা করা হচ্ছে! তুমিই তো মোহনলাল! শীগগির বেরিয়ে এস বলছি?'

—'আজ্ঞে, ভুল করছেন! আমি মোহনলাল নই।'

'আচ্ছা, আগে বেরিয়ে এস তো, তারপর দেখা যাবে তুমি কোন মহাপুরুষ!'

—'আজ্ঞে, আবার ভুল করছেন! আমি মহাপুরুষও নই।'

চন্দ্রবাবু গর্জন করে বললেন, 'তবে রে ছুঁচো! ভাঙলাম তা হলে দরজা!'—বলেই তিনি দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করতে লাগলেন।

—'আজ্ঞে, করেন কি—করেন কি! দরজা ভাঙলে বাড়িওয়ালা বকবে যে! আচ্ছা মশাই, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি এই নিন!'—হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

চন্দ্রবাবু রিভলভার বাগিয়ে ধরে, ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বাধো বাধো স্বরে তিনি বললেন, 'এ কী! কে আপনি?'

কুমারও অবাক! ও ঘরের দরজার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো মোহনলাল নয়,—সে যে বিমল, যার সঙ্গে কুমার দু-বার যকের ধন আনতে গিয়েছিল, মঙ্গলগ্রহের বামনাবতারদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, ময়নামতীর মায়া-কাননের দানবদের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে খেলা করেছিল। বিমল—বিমল, তার চিরবন্ধু বিমল, মানসপুরে এসে পর্যন্ত যার অভাব কুমার প্রতিদিন প্রতি পদে অনুভব করেছে, এমন হঠাৎ তারই দেখা যে আজ এখানে পাওয়া যাবে, স্বপ্নেও সে তা কল্পনা করতে পারেনি।

কুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বিমল, বিমল, তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি কি আকাশ থেকে খসে পড়লে?'

বিমল হাসতে হাসতে বললে,—'না বন্ধু না! মোহনলাল-রূপে গোড়া থেকেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি!'

চন্দ্রবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'অ্যাঁ, বলেন কি? আপনিই মোহনলাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ! এখন আসুন চন্দ্রবাবু, আমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিন!'

ধাঁ করে কুমারের একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আচ্ছা বিমল, বাঘের গর্তে ডাকাতের কবল থেকে—'

বিমল বললে, 'আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছিলুম। কিন্তু এ-জন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই!......কুমার, পিছন ফিরে দেখ, ঘরের ভেতরে ও আবার কে এলো!'

কুমার ফিরে দেখে, একমুখ হাসি নিয়ে, দু-পাটি দাঁত বের করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের পুরাতন ভৃত্য রামহরি!

কুমার বললে, 'কি-আশ্চর্য। তুমি আবার কোত্থেকে এলে ?'

রামহরি বললে, 'আরে দুয়ো কুমারবাবু, দুয়ো! তুমিও আমাদের চিনতে পার নি। আমি যে নীচে দরোয়ান সেজে থাকতুম! পরচুলোর দাড়ি-গোঁফ ফেলে আবার রামহরি হয়ে, এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম! আরে দুয়ো কুমারবাবু, দুয়ো। কি ঠকানটাই ঠকে গেলে!'

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### জনশূন্য আলিনগর

সন্ধ্যার আগেই আজ পৃথিবী অন্ধকার হবে। পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা জায়গা জুড়ে অস্তগত সূর্যের বুকের রক্ত-মাখানো আলো ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তার চিহ্ন তাড়াতাড়ি মুছে ফেলবার জন্যে হু-হু করে বিরাট এক কালো মেঘ ধেয়ে আসছে।

চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড় আর বন-জঙ্গল ; মাঝখানের উঁচু-নিচু পথ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

গাড়ির ভিতরে বসে রয়েছে তিনজন যুবক ও একটি ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে ; যুবকদের পরনে খাকি শার্ট ও প্যান্ট এবং প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে বন্দুক।

এ-অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেনের পুত্র অমিয় আজ তার তিন অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে পাখি-শিকারে বেরিয়েছে। তার বোন শীলাও

আবদার ধরে তাদের সঙ্গে এসেছে। সারাদিন বনজঙ্গলে ঘুরে এখন তারা বাড়ি ফিরছে।

অমিয়ের বন্ধু পরেশ বললে, 'অমি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ঝড় উঠল বলে! কাছে কোথাও লোকালয় নেই?'

অমিয় গাড়ি চালাচ্ছিল। সে জবাব না দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে।

নিশীথ বললে, 'আমি, যতই স্পীড বাড়াও, আজকের এই ঝড়কে তুমি কিছুতেই হারাতে পারবে না। ঐ দেখ, আকাশের শেষ আলোও নিবে গেল।'

শীলা আমোদ-ভরে গাড়ির গদির উপর বসে-বসে নেচে উঠে বললে, 'ওহো, কী মজা! বন-জঙ্গলের ভিতরে থেকে আমি কখনো ঝড় দেখিনি! ভাগ্যিস আজ দাদার সঙ্গে এসেছি!'

পরেশ ও নিশীথ হাসিমুখে শীলার দিকে তাকালে। বন-জঙ্গলে ঝড় যে কী ভয়ানক, শীলা যদি তা জানত!

অমিয় বললে, 'পরেশ, আর ঝড়কে এড়াবার চেষ্টা করা মিছে। ঐ দেখ, মাঠের ওপারের গাছপালাগুলো দুলতে শুরু করেছে।'

কালো আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের অভিনয় আরম্ভ হলো। এবং শূন্যে মেঘপুঞ্জের তলায় দূরে এক তীব্রগতি ধুলোর মেঘ জেগে উঠল। এবং তফাত থেকেই শোনা গেল, বাতাসের মধ্যে ফুটল কেমন এক অশান্ত প্রলাপ।

নিশীথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দূরে লোকালয়ের মতো কী দেখা যাচ্ছে না?'

অমিয় এ-অঞ্চলের পথ-ঘাটের খবর রাখত। সে বললে, 'আমি ঐদিকেই যাচ্ছি। ওখানে আলয় আছে বটে, কিন্তু লোক নেই।'

পরেশ বললে, 'তার মানে?'

—'ওটা একটা ছোট শহর। অনেক দিন আগে মড়কে ওখানকার বেশির ভাগ লোকই মারা পড়ে—বাকি সবাই পালিয়ে

যায়, আর ফিরে আসেনি। ওর নাম আলিনগর। ওখানে এখন জনশূন্য পোড়ো ভাঙা বাড়ি আর ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তবে, ওরই মধ্যে কোনখানে হয়তো মাথা গুঁজে আজকের মতো ঝড়কে ফাঁকি দিতে পারব।'

পরেশ ও নিশীথ খুশি হয়ে বললে, 'ব্যস, অল রাইট!'

শীলা কিন্তু কেমন যেন কুঁকড়ে পড়ে বললে, 'ও দাদা, এই অন্ধকারে আলিনগরে গিয়ে কাজ নেই! তার চেয়ে মাঠে ঝড়ের ধাক্কা খাওয়া ঢের ভালো!'

অমিয় বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন রে শীলা, আলিনগরে যেতে তোর আপত্তি কিসের?'

শীলা বললে, 'আমাদের বাবুর্চির মুখে শুনেছি, আলিনগরে এখন যারা থাকে, তারা মানুষ নয়!'
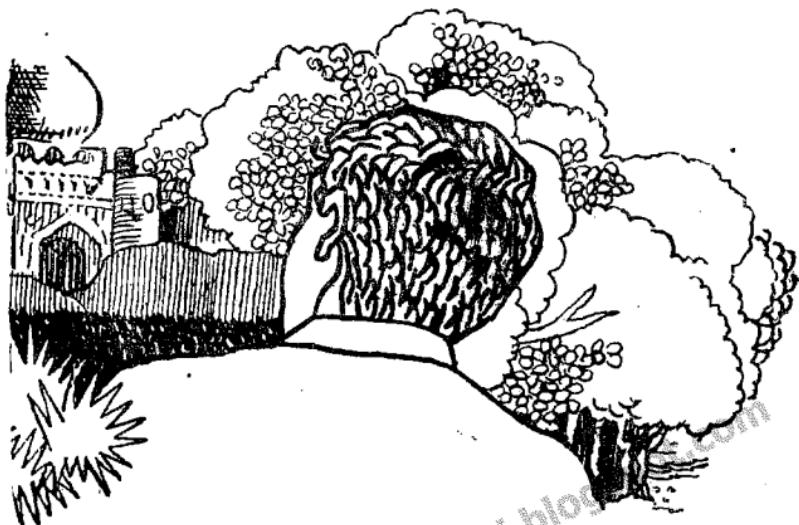
—'মানুষ নয়? তুই কি বাঘ, ভালুক, হায়েনার কথা লবছিস?'

—'না দাদা, না! তারা নাকি মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তারা মানুষ নয়! শুনেছি, তারা দিনে কবরে গিয়ে ঘুমোয়, রাত্রে বেরিয়ে এসে দেখা দেয়!'

তিন বন্ধুতে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। এই একেলে মানুষগুলোর কানে সেকেলে ভূতের কথা ঠাট্টা-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজগুবি ভূতের গল্প শুনে বড়-জোর সকৌতুকে সময় কাটানো চলে, কিন্তু তা বিশ্বাস করবে খালি খোকা-খুকী আর মূর্খরা। অতএব অমিয় বললে, 'তুই কি ভূতের কথা বলছিস? ছিঃ শীলা, এখনো তোর ও-সব কুসংকার আছে?'

কিন্তু শীলা কোন জবাব দেওয়ার আগেই ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মতো হুঙ্কার দিয়ে তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল। প্রথম আক্রমণেই সে নিশীথের মাথা থেকে টুপি এবং শীলার হাত থেকে রুমাল কেড়ে নিয়ে ধূলায় ধূলায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে দিলে। অন্ধকার আকাশে বাজ চ্যাঁচাতে লাগল-গলা ফাটিয়ে এবং এখানে

www.boiRboi.blogspot.com

ওখানে মড়মড় করে দু-তিনটে গাছ ভেঙে পড়ল। এক মুহূর্তেই পৃথিবীর রূপ গেল বদলে।

তীক্ষ্ণ ধূলাবৃষ্টির মধ্যে অনেক কষ্টে তাকিয়ে অমিয় 'হেড-লাইট' জ্বেলে দেখলে, খানিক তফাতেই ভাঙা মসজিদের মতো একখানা সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

তীরের মতো গাড়ি ছুটিয়ে সেইখানে গিয়ে থেমে পড়ে অমিয় বললে, পরেশ, নিশীথ! শীলাকে নিয়ে শীগগির নেমে পড়ো! ঐ মসজিদে গিয়ে ঢোকো!'

মসজিদের এক দিক ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আর একটা অংশ তখনো কোনগতিতে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাড়াতাড়ি সেই অংশে গিয়েই আশ্রয় নিলে।

বাইরে তখন যে কাণ্ড হচ্ছে ভাষায় তা বুঝানো যায় না। কষ্টি-পাথরের মতো কালো নিরেট অন্ধকারে পৃথিবীকে কানা করে ক্ষ্যাপা ঝড় আজ যেন বিশ্ব লুণ্ঠন করতে চায়। দিকে দিকে বিদ্যুতের শত-শত অগ্নি-সর্প লেলিয়ে দিয়ে বজ্রভেরীতে মৃত্যু-রাগ পূর্ণ করে এবং অরণ্যের যন্ত্রণা-ভরা ছটফটানি শুনে বিপুল অট্টহাসি হেসে প্রলয়-আনন্দে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব চলতে লাগল।

পরেশ সভয়ে বললে, 'অমি, এ ভাঙা মসজিদ থর-থর করে কাঁপছে! মাথার উপরে ভেঙে পড়বে না তো?'

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে অমিয় নাচারভাবে বললে, 'ভেঙে পড়লেই উপায় কী?'

শীলা কাতরভাবে বললে, 'ও দাদা, চল, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই!'

—'পাগল! বাইরে গেলে ঝড়ে উড়ে যাবি!'

প্রায় আধঘন্টা পরে ঝড়ের বেগ কিছু কমে এল বটে, কিন্তু ঝম-ঝম-ঝম-ঝম করে বিষম বৃষ্টি শুরু হলো। মসজিদের একটা দরজা-জানলারও পাল্লা ছিল না, বেগবান হাওয়ায় হু-হু করে ভিতরেও জল ঢুকতে লাগল।

নিশীথ বললে, 'আমি, গাড়ি, থেকে টর্চটা এনেছো ?'

—'এনেছি। কেন ?'

—'একবার জ্বেলে দেখো তো কোনোদিকে শুকনো ঠাঁই আছে নাকি ? অন্ধকারে আমার পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে, যদি সাপ-টাপ কিছু থাকে !'

টর্চটা জ্বেলে একদিকে আলোর রেখা ফেলতেই অমিয় চমকে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শীলা প্রায় কান্নার স্বরে বলে উঠলো, 'ও কে দাদা, ও কে ?'

প্রকাণ্ড ঘরের আধখানা ছাদ ভেঙে পড়েছে, এবং মেঝের উপরে

স্তূপের মতো জমে রয়েছে ভাঙা টালি, ইট, বালি-সুরকির চাঙড়, কড়ি ও বরগা প্রভৃতি। তারই ভিতরে স্থিরভাবে দুই হাঁটুর উপরে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অদ্ভুত এক মানুষের মূর্তি।

দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, লম্বা লম্বা চুল মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পরনে একটা কালো ওভারকোট ও ঢিলে ইজের। কিন্তু তার চোখ দু-টো! মোটরের হেডলাইটের মতো সেই চোখ তীব্র দীপ্তিতে এমন উজ্জ্বল যে, তাদের দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। তার কালো পোশাক আর কালো মুখ কালো অন্ধকারে মিশিয়ে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু অস্বাভাবিক-ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে চোখ দুটো অপার্থিব বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। দেখলেই বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে থাকে।

অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে তুমি?'

গম্ভীর স্বরে মূর্তি বললো, 'পথিক।'

—'তোমার নাম কী?'

—'আমি পথিক, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।'

—'এখানে কেন?'

—'যেজন্যে তোমরা এখানে এসেছ, আমিও সেইজন্যেই এখানে।'

—'এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?'

—'দরকার হয়নি বলে দিইনি।'

অমিয় টর্চ নিবিয়ে ফেললো, চারিদিকে আবার অন্ধকার নেমে এলো। কিন্তু সকলের মনে হতে লাগলো, সেই অন্ধকারের ভিতর হতে অপরিচিত মূর্তি যেন থেকে থেকে আগুনের ফিন্‌কি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অমিয়কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে শীলা ভয়ার্ত স্বরে চুপিচুপি বললে, 'দাদা, শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে চলো, নইলে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবো!'

পরেশ ও নিশীথও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এতক্ষণ

পরে পরেশ বললে, 'আমি, এখানে দাঁড়িয়েও যখন ভিজতে হচ্ছে, তখন গাড়িতে গিয়ে বসাই ভালো।'

বাইরে তখনও আঁধার রাত্রির বুকে মাথা ঠুকে ঝড় চ্যাচাচ্ছে গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, গাছেরা পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে ককিয়ে বলছে সর্-সর্-সর্-সর্ এবং শূন্যের অসীম সাগর উছলে জলের ধারা ঝরছে রম্-ঝম্, রম্-ঝম্।

অমিয় কান পেতে শুনে বুঝলে, পাহাড়ে পথের উপর দিয়েও কল্-কল্ করে জলস্রোত ছুটছে। এ-পথে মোটর চালানো এখন মোটেই নিরাপদ নয় বটে, কিন্তু এই ভাঙা মসজিদের ফুটো ছাদের তলায় অন্ধকারে এই বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে এখানে থাকতে তারও আর ইচ্ছা হলো না। সে শীলার হাত চেপে ধরে বললে, 'চলো, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।'

অন্ধকারে ভিতরে একটা অস্ফুট শব্দ হলো—কে যেন চাপা গলায় হাসলে।

অমিয়ের ভয়ানক রাগ হলো ;—তারা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে ভেবে ঐ লোকটা কি ঠাট্টার হাসি হাসছে? কিন্তু শীলার কথা ভেবে রাগ সামলে সে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শীলা বললে, 'তখুনি বলেছিলুম দাদা, এখানে এসো না!'

অমিয় জোর করে হেসে বললে, 'আরে গেলো, তুই কি ভেবেছিস লোকটা ভূত?'

শীলা বললে, 'ও ভূত কি না জানি না, কিন্তু ওকে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিলো!'

—'তোর সবতা'তেই বাড়াবাড়ি! নে, এখন গাড়িতে উঠে বোস!'

গাড়ির উপরে উঠে ধুপ করে বসে পড়ে শীলা বললে, 'শীগগির স্টার্ট দাও দাদা, এখানে আর আধ মিনিটও নয়!'

পরেশ ও নিশীথ গাড়ির উপরে গিয়ে বসলো। অমিয় স্টার্ট দিয়ে গাড়িতে উঠলো।

কিন্তু পথ তখন ছোটখাটো নদীতে পরিণত হয়েছে—প্রায় হাঁটু-ভোর জল সশব্দে ছুটে চলেছে। এ-পথে কেমন করে গাড়ি চালাবে তাই ভাবতে ভাবতে অমিয় হেড-লাইট-টা জ্বেলে দিলে।

কিন্তু ওরা আবার কে? হেড-লাইট-এর জোর আলো সুমুখের পথে পড়তেই দেখা গেলো, ছয়জন লোক পাশাপাশি গাড়ির দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পরিত্যক্ত আলিনগর, দিনের বেলাতেই সেখানে মানুষের দেখা মেলে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর ঘুটঘুটে অন্ধকারে, জলে-ঝড়ে-দুর্যোগে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কারা এরা? এই কি পথে বেড়াবার সময়?

শীলা, পরেশ ও নিশীথ তাদের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো।

পাশের জঙ্গল থেকে কতকগুলি শেয়াল সমস্বরে কেঁদে উঠলো। যেন তারা এদের চেনে, যেন তারা এদের ভয় করে, যেন তারা পৃথিবীর জীবদের সাবধান করে দিচ্ছে!

অমিয় ঘন-ঘন মোটরের হর্ন বাজাতে লাগলো।

কিন্তু তারা যেন শুনতে পেলে না,—তালে তালে যেন মেপে মেপে পা ফেলে তারা সমানে এগিয়ে আসছে—যেন সব দম-দেওয়া কলের মূর্তি! প্রত্যেকের পরনে সাদা কাপড়, প্রত্যেকের দেহের উপর দিকটা আড়ষ্ট এবং প্রত্যেকের হাতদু'টো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের মতো দু-পাশে স্থিরভাবে ঝুলছে,—চলছে কেবল তাদের পাগুলো—

সেই জলে-ঝড়ে অমিয়ের দেহ ঘেমে উঠলো; চেঁচিয়ে বললে, 'কে তোমরা? আমার হর্ন শুনতে পাচ্ছো না? সরে যাও—নইলে মরবে!'
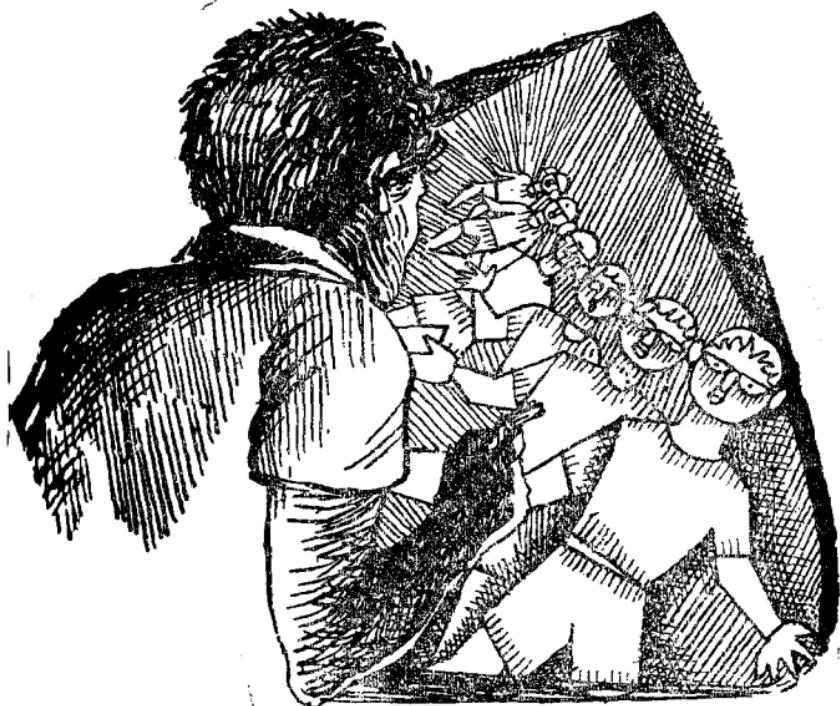
তারা কেউ সাড়া দিলে না, পথ জুড়ে তালে তালে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। যেন তারা থামতে জানে না, কার অভিশাপ যেন তাদের কিছুতেই থামতে দেয় না, যন্ত্রচালিতের মতো

তাদের যেন চলতেই হবে সারা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে অনন্ত—অনন্তকাল ধরে!

অমিয় বললে, 'ডাকাত নয় তো? পরেশ! নিশীথ! বন্দুক নাও!'

সকলে আপন-আপন বন্দুক তুলে নিলে। তবু যারা আসছে তারা থামলো না, ভয়ও পেলো না।

অমিয় চেঁচিয়ে বললে, 'আর এক-পা এগুলেই গুলি করবো!'

ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ করে পায়ের শব্দ তুলে মূর্তিগুলো আরো কাছে এসে পড়লো।

অমিয় মহা ফাঁপরে পড়ে ভাবতে লাগলো—কারা এরা? ডাকাত, না পাগল? না এরা ভাবছে যে বন্দুক ছুঁড়বো বলে আমরা ঠাট্টা

করছি? কিন্তু আর তো ওদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, গাড়িতে শীলা রয়েছে, কোন বিপদ হলে বাড়িতে গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন করে? যা হয় হোক, আমার কথা না শুনলে এবার আমি বন্দুক ছুঁড়বোই!

সে আবার শুষ্ক স্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'এই শেষবার বলছি, পথ ছেড়ে দাও!'

তারা সমানে এগিয়ে আসছে, আসছে, আর আসছেই। 'হেড-লাইট'-এর তীব্র আলোকে তাদের রুক্ষ চুল ও বিস্ফারিত স্থির চোখের পাতা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছয়জোড়া নিষ্পলক চোখের পূর্ণদৃষ্টি অমিয়দের দিকে স্থির হয়ে আছে—প্রত্যেক চোখ যেন মড়ার চোখ।

তিনজনেই বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করলো। মূর্তিগুলো যখন গাড়ির কাছ থেকে দশ-বারো হাত তফাতে এসে পড়েছে অমিয় তখন বললে, 'আমি তিন গুনলেই তোমরা বন্দুক ছুঁড়ো!'

তবু তারা থামলো না।

—'এক!'…

—'দুই!'…

—'তিন!'…

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! তিনজনেই বুঝলে, তাদের লক্ষ্য ভুল হয়নি—এত কাছ থেকে ভুল হতেই পারে না, কিন্তু তবু সেই মূর্তিগুলো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে—আরও এগিয়ে—আরও এগিয়ে আসতে লাগলো।

এ-কী অসম্ভব ব্যাপার!

আচম্বিতে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে হা-হা-হা-হা-করে কে বন্য পশুর কণ্ঠে মানুষের স্বরে ভয়াবহ অট্টহাসি হাসতে লাগলো।

শীলা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গদির উপরে লুটিয়ে পড়লো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### মরা মানুষের জ্যান্ত চোখ

—'দিনে দিনে হলো কী? দুনিয়ার বড়ো বড়ো সাধুর অভাব হয়েছে অনেক দিনই। আজকাল আবার বড়ো অসাধুরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে দেখছি খালি কতকগুলো গাঁটকাটা আর ছিঁচকে-চোরের ইতিহাস। দুত্তোর খবরের নিকুচি করেছে!'—এই বলে জয়ন্ত খবরের কাগজখানা সজোরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মানিক কফি তৈরি করতে করতে বললে, 'শহরে বড়ো বড়ো চোর-ডাকাত-খুনে নেই, এটা তো পুলিশের কৃতিত্বের পরিচয়। এ-জন্যে আমাদের সুন্দরবাবুও অনায়াসে বাহাদুরির দাবি করতে পারেন।'

—'কিন্তু চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি না থাকলে পুলিশেরও চাকরি থাকবে না, আর আমাদেরও সময় কাটবে না।'

মানিক কফির পেয়ালা জয়ন্তের সামনে এগিয়ে দিলে।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বললে, 'কেবল তাই নয়। অপরাধীর অভাবে কোন-কোন দেশে পুলিশের অত্যন্ত দুর্দশাও হয়। ইউরোপের একটা শহরে চোরেরা একবার ধর্মঘট করেছিল, তা জানো?'

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কি রকম? চোরদের ধর্মঘট? এ যে গৃহস্থের পক্ষে মস্ত বড়ো সুখবর!'

—'হ্যাঁ, গৃহস্থের পক্ষে। কিন্তু যে শহরের কথা বলছি, সেখানকার পুলিশ এটা সুখবর বলে মনে করেনি। শহরবাসীরা হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখলে, রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে এই বিজ্ঞাপন: চুরি-ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ এতো বেশি ঘুষ দাবি করে যে, চোরাই মাল বেচিয়া আমাদের আর কোন লাভ থাকে না। পুলিশের এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার

জন্য। এই নগরের চোর-সম্প্রদায় অদ্য হইতে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল।'

—'তারপর।'

—'তারপর আর কী! দু-চারদিন পরেই সেখানকার পুলিশ মানতে বাধ্য হলো যে, অতঃপর চোরদের কাছ থেকে আর অতো বেশি ঘুষ দাবি করবে না। তখন চোরেরা আবার ধর্মঘট বন্ধ করলো।'

এমন সময় পায়ের শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে এবং সুবিপুল ভুঁড়ি দুলিয়ে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এই যে, চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি!'

জয়ন্ত বললে, 'না, আমরা এইমাত্র কফি শেষ করলুম।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কফি? এই গরমে? ওরে বাপ্ রে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! একশো টাকা বখশিশ দিলেও আমি এখন এক কাপ কফি খাবো না!'

জয়ন্ত বললে, একশো টাকা বা কফির কাপ কিছুই আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার জন্যে এখনি এক পেয়ালা চা আসবে।'

—'আর টোস্ট, ডিম, জ্যাম?'

—'তাও আসবে। আপনি নির্ভয়ে চেয়ারে বসে পড়ুন।'

ইতিমধ্যে মানিক খবরের কাগজখানা কখন মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সে বললে, 'জয়, তুমি কি আজকের কাগজখানা ভালো করে পড়োনি?'

—'না, পুলিশ-কোর্টের কলম ছাড়া আর কিছু আমি দেখিনি।'

—'চট্টগ্রাম থেকে এদের নিজস্ব সংবাদদাতা কী লিখেছে জানো?'

—'না।'

—'শোনো তা হলে', বলে মানিক পড়তে আরম্ভ করলে:

'বিভীষণ বিভীষিকা!
রহস্যময় মেয়ে-চুরি!'

"পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুর্দিকস্থ গ্রামে গ্রামে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে! মাসাধিক কালের মধ্যে এখানে তিন-তিনটি পরিবারের তিনটি মেয়েকে কে বা কাহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

'আসল ব্যাপার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এমন অদ্ভুত কাণ্ড এ-অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছে।'

'প্রথম ঘটনাটি এই : বীরনগর গ্রামের মধুসূদন কর্মকারের বড়ো মেয়ে প্রমদা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের প্রান্তে পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রথমে সবাই ভাবিয়াছিল, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণীর তলা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার দেহ পাওয়া যায় নাই। প্রমদার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। সবে গত মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে।

'দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ : বীরনগর হইতে দশ মাইল তফাতে চণ্ডীপুর। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরী এখানকার একজন বিশিষ্ট গৃহস্থ। তাঁহার দৌহিত্রীর নাম কুমারী কমলা দেবী, বয়স ষোলো বৎসর। এক রাত্রে গুমোট গরমে ঘুম হইতেছিল না দেখিয়া কমলা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া শয়ন করে। শেষ রাত্রে হঠাৎ কমলার ভীত চিৎকারে বাড়ির আর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। কমলার পিতা ও পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি বারান্দায় ছুটিয়া আসেন। কিন্তু কমলা তখন অদৃশ্য হইয়াছে।'

'পুলিশের তদন্তে আর একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাড়ির সকলে যখন কমলার জন্য খোঁজাখুঁজি ও ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তখন গ্রামের পথ হইতে কে নাকি ভয়াবহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল, সকলে অন্ধকার পথে ছুটিয়া যায়; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কেবল এক আশ্চর্য শব্দ শোনা যায়। অনেকগুলি লোক যেন একসঙ্গে সৈন্যদলের মত সমতালে সশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

'তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র দুই দিন আগে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের একমাত্র কন্যা কুমারী শীলা তাঁহার ভ্রাতা মি. অমিয় সেনের সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলেন। পোড়ো শহর আলিনগরের কাছে কাহারা নাকি আক্রমণ করিয়া কুমারী শীলাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ পায় নাই, যথাসময়ে আমরা সব কথা জানাইব।

'এখন প্রশ্ন হইতেছে, একালে ইংরেজ রাজত্বের কোন জায়গায় উপর-উপরি এমন তিন-তিনটি ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না? যদি সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনর্থক এই বিপুল পুলিশ-বাহিনী পুষিয়া লাভ কী! যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা পর্যন্ত চুরি যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা কাহার মুখ চাহিয়া বাস করিবে? আমরা পুলিশের এই অকর্মণ্যতার দিকে গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।'

ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু শুনতে শুনতে মুখগহ্বরে আধখানা 'টোস্ট' নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাঁর আর টোস্ট খাওয়া হলো না, তিনি চটে-মটে বলে উঠলেন, 'হুম্! যতো দোষ নন্দ ঘোষ! যেখানে যা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছি আমরাই!'

জয়ন্ত জবাব দিলে না, নীরবে নস্যদানি বার করে একটিপ নস্য নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'সব ব্যাপারগুলোই আজগুবি! চোরেরা যে চুরি করতে এসে অট্টহাসি হাসে আর গোরাদের মতো তালে তালে পা ফেলে চলে, এটা এই প্রথম শুনলাম। তারা তো উদয়শঙ্করের মতো তালে তালে নাচতে নাচতে পালালেও পালাতে পারতো।'

বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, 'একজন সায়েববাবু ডাকছেন।'

জয়ন্ত বললে, 'এখানে নিয়ে এসো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সায়েববাবু আবার কী জীব?'

—'আমাদের বেয়ারা বিলাতি পোশাকে বাঙালীকে ঐ নামে ডাকে।'

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণ যুবক। তার পরনের বিলাতি পোশাক ইস্ত্রিহীন, এলোমেলো, মাথায় টুপি নেই—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চক্ষের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। দেখলেই মনে হয় সে যেন অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপদগ্রস্ত।

জয়ন্ত শুধালে, 'আপনি কাকে চান?'

—'জয়ন্তবাবুকে। আমি ভয়ানক বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি—'

—'আমারই নাম জয়ন্ত। আপনার নাম জানতে পারি কি?'

—'আমার নাম অমিয় সেন, আমি চট্টগ্রাম থেকে আসছি।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, 'বসুন। খবরের কাগজে বোধহয় এইমাত্র আপনারই নাম দেখেছি। আপনি তো চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের পুত্র?'

অমিয় চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাপারটা যখন আগেই শুনেছেন তখন আমি কেন যে এখানে এসেছি, সেটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছেন?'

—'আপনার ভগ্নীকে আপনি উদ্ধার করতে চান?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, শীলাকে উদ্ধার না করে বাবার কাছে আর মুখ দেখাবো না।'

'তাহলে আগে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন।'

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'কিন্তু সব শুনে আপনি হয়তো পাগল বা মিথ্যাবাদী বলে মনে করবেন।'

—'কেন?'

—'সমস্ত ঘটনাটাই এমন অসম্ভব যে আমার বাবাও আমার কথা বিশ্বাস করেননি। অথচ আমার প্রত্যেক কথাই সত্য।'

—'হোক অসম্ভব, তবু কোন কথাই আপনি যেন গোপন করবেন

না। কিছু লুকোলে আমি আপনার কোন উপকারেই লাগবো না, এইটুকু খালি দয়া করে মনে রাখবেন।'

অমিয় তার কাহিনী বলতে লাগল। সে যা বললে তার অধিকাংশই আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি—গাড়ির উপরে শীলার মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত। অতএব এখানে অমিয়ের কথার শেষ অংশ মাত্র দেওয়া হলো :

'ওদিকে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে সেই অমানুষী হাসি, এদিকে বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েও নির্বিকারের মতো সেই ছয়টা আড়ষ্ট দেহ একেবারে আমাদের গাড়ির কাছে এসে পড়েছে। আমার পাশেই শীলার মূর্ছিত দেহ পড়ে রয়েছে, চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড নিশ্বাস, বৃষ্টির ঝর্-ঝর্ কান্না, মাথার উপরে আকাশ ঘন-ঘন জ্বালছে বিদ্যুৎ-চক্‌মকির ফিন্‌কি। আমি যেন কেমন আচ্ছন্নের মতোন হয়ে গেলুম এবং সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলুম, পরেশ ও নিশীথও গাড়ির ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

'গাড়ির সামনে এসে মূর্তিগুলো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই সময়ে তাদের চোখগুলো দেখে আমার বুক শিউরে উঠলো। মরা মানুষ তাকিয়ে দেখলে বোধ করি তাদের দৃষ্টিও এইরকম দেখতে হয়! সে চোখগুলো যেন তাকিয়ে আছে মাত্র, কিন্তু তাদের ভিতরে কোন ভাবেরই আভাস নেই এবং তারা চোখ খুলে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

'মূর্তিগুলো হঠাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। তিনজন এলো গাড়ির বাঁ পাশে, আর তিনজন এলো ডান পাশে। সঙ্গে সঙ্গে 'হেড-লাইটে'র আলোক-রেখা ছাড়িয়ে তাদের দেহগুলো ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

'তারপর আমি কী করবো না-করবো ভাবতে-না-ভাবতেই আচম্বিতে দু-খানা বিষম কঠিন হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে। সে হাত-দু-খানা কেবল কঠিন নয়, কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! আমি প্রাণপণে

বাধা দিয়েও তাদের ঠেকাতে পারলুম না, হাত-দুখানা আমাকে এক টানে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—মাটিতে পড়ে মাথায় চোট লেগে আমিও তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে আবার শুনতে পেলুম সেই অমানুষী হা-হা-হা-হা হাসি।

'যখন জ্ঞান হলো তখন মেঘলা আকাশে ঝাপসা ভোরের আলো ফুটে ওঠবার চেষ্টা করছে।

'গাড়ির হুডের উপরে মাথা রেখে পরেশ ও নিশীথ অভিভূতের মতো পড়ে রয়েছে।

'আমি পাগলের মতো গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে ডাকলুম, 'শীলা! শীলা!' পরেশ ক্ষীণ স্বরে বললে, 'শীলা নেই!

'আমার কথা আর বেশি বাড়াবো না। কেবল এইটুকুই জেনে রাখুন, প্রায় বৈকাল পর্যন্ত আমরা তিনজনে আলিনগরের সমস্তটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু পেলুম খালি পোড়ো বাড়ির পর পোড়ো বাড়ি, ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ—সেখানে কোথায় শীলা, কোথায় সেই ছয়টা অদ্ভুত মূর্তি, আর কোথায় ভাঙা-মসজিদে-দেখা সেই ঘোর কালো লম্বা লোকটা! কারুর কোনো চিহ্ন নেই।

'কি-রকম মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলুম, আর সমস্ত শুনে মা ও বাবার অবস্থাই বা হলো কী রকম, এখানে সে-সব কথা বলবার দরকার নেই।

'নিশীথ আপনার শক্তির কথা জানে। সেই-ই আমাকে পরামর্শ দিলে আপনার কাছে আসতে। তখন আহত দেহে চট্টগ্রাম থেকে আপনার কাছে চলে এসেছি জয়ন্তবাবু, এখন আপনার সাহায্যই আমার শেষ ভরসা।'

অমিয় স্তব্ধ হলো, জয়ন্ত গম্ভীর মুখে বারবার নস্য নিতে লাগলো। মানিক খবরের কাগজখানা নিয়ে আর-একবার পড়তে বসলো।

খানিক পরে এই নীরবতা সইতে না পেরে সুন্দরবাবু বলে

উঠলেন 'হুম্! মি. সেন, আপনি যা বললেন তার কিনারা করা জয়ন্ত বা পুলিশের কাজ নয়!'

অমিয় করুণ স্বরে বললে, 'তবে আমার কী হবে?'

—'যা শুনলুম তা যদি পাগলের প্রলাপ না হয়, তাহলে রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার বলেই মানতে হয়। জয়ন্ত কি পুলিশ, ভূত ধরতে পারবে না, আপনি কোনো ভালো রোজার খোঁজ করুন। আপনার বোনকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

অমিয় অসহায়ের মতোন কাতরভাবে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

জয়ন্ত আর-একটিপ নস্য নিয়ে বললে, 'মানিক, জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে নাও। অমিয়বাবুর সঙ্গে আজই আমরা চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।'

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## পদচিহ্ন ও গোরস্থান

জনশূন্য আলিনগর। চারিধারে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো প্রাচীর, বাতাসের ছোঁয়ায় ঐকতান-বাজানো বনভূমির শ্যামলিমা, মাঠে মাঠে জলের আলপনা আঁকতে আঁকতে নদীর রূপালী খেলা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বনমুরগিরা, কোথাও হঠাৎ শিস্ দিয়ে ওঠে অজানা গানের পাখি, কোথাও অনেক দূর থেকে শোনা যায় কার বাঁশির হারিয়ে-যাওয়া সুর। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে নিঃসাড় হয়ে আছে জনশূন্য আলিনগর। পাহাড়ের উপর থেকে তাকে দেখায় একখানি ছবির মতো।

বাড়ির পর বাড়ি—কোনো-কোনো বাড়ির বয়সও বেশি নয়, আকারও জীর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এক-একখানা বাগান-বাড়িও চোখে পড়ে—এখনো দু-চারটে কঠিনপ্রাণ ফুলগাছ অযত্নেও বেঁচে থেকে রঙ ফুটিয়ে আগেকার গৌরবের পরিচয় দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু অধিকাংশ বাড়িই নীরবে যেন প্রচার করতে চায় ধ্বংস-দেবতার মহিমা। তাদের দেখলেই মনে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড মাংসহীন কঙ্কালকে। স্থানে স্থানে ধ্বংসস্তূপের জন্যে চলবার পথ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ-যেন কোন অভিশপ্ত পৃথিবীর এক অংশ—মৃত মানুষের স্মৃতি আছে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের দেখা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা মসজিদ, কিন্তু তাদের ছায়ায় আজ আর কেউ উপাসনা করতে আসে না। থেকে থেকে এক একটা ঘুঘুর বিষাদ-মাখা সুর যেন মৌন বিজনতার দীর্ঘশ্বাসের মতো জেগে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত সারাদিন ধরে আজ আলিনগরের জনশূন্যতার মধ্যে ঘুরে

বেড়াচ্ছে এবং তার সঙ্গে আছে মানিক, অমিয়, পরেশ, নিশীথ ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্তের সঙ্গে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু এখানে আসবার কোনোই দরকার ছিলো না, কিন্তু খানিকটা কৌতূহলে পড়ে ও খানিকটা এই নূতন দেশে বেড়াবার ঝোঁকে সুন্দরবাবুও কিছুদিনের ছুটি নিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গী হয়েছেন।

সারাদিন কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেলো না। বৈকালে তারা শহরের প্রান্তে একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো।

সুন্দরবাবু সারাদিনই কাঠ-ফাটা রোদে অমন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন মত প্রকাশ করে আসছিলেন, কিন্তু এইবারে তিনি রীতিমতো বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললেন, 'হুম্! আমি বাবা আর এক পা নড়ছি না! তোমাদের খাতিরে পড়ে শেষটা কি আত্মহত্যা করব? এখানে সর্দি-গর্মি হলে দেখবে কে?'

জয়ন্ত একবার সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে তাকালো। মরুভূমিতে দরিয়ার মতো তাঁর বিপুল টাকের উপর দিয়ে দর-দর ঘামের ধারা নেমে আসছে এবং পথশ্রমে তাঁর বিরাট ভুঁড়ি হাপরের মতো একবার ফুলে উঠছে ও একবার চুপসে যাচ্ছে দেখে তার দয়া হলো। বললে, 'আচ্ছা সুন্দরবাবু, এইবারে আমরা খানিকটা বিশ্রাম করতে পারি। আমাদের শহর দেখা শেষ হয়েছে।'

সুন্দরবাবু উচ্চৈঃস্বরে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করে নদী-তীরের বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

অমিয় বললে, 'তাহলে এর পরে আমরা কী করবো?'

জয়ন্ত বললে, 'আজকের রাতটা আমরা এইখানেই কাটিয়ে দেবো।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক চম্‌কে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, সে কী কথা? থাকবো বললেই তো থাকা হয় না, এখানে থাকবে কোথায়?'

জয়ন্ত বললে, 'যদিও আজ চাঁদ উঠবে না, তবু মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া আছে তো!'

—'যদি বৃষ্টি আসে?'

—'এখানে মাথা গুঁজবার জন্যে পোড়ো বাড়ির অভাব নেই। গোটা শহরটাই তো আজ আমাদের দখলে।'

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আ-হা-হা-হা, মরে যাই আর-কি! সব ব্যবস্থাই তো করে দিলে দেখছি! কিন্তু পোড়ো বাড়িতে পোড়া পেটের অন্ন জোটাবে কে?'

—'অন্ন আজ জুটবে না।'

—'হুম্! মাফ কর ভাই, আমি বিধবা স্ত্রীলোক নই, উপোস-টুপোস আমার ধাতে সহ্য হয় না!'

—'তাহলে আপনি বাসায় ফিরে যান!'

—'একলা?'

—'কাজেই।'

—'হুম্!' সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন,—সূর্য ডুবু-ডুবু। সন্ধ্যা আসি-আসি করছে। রাত-আঁধারে এখানে কী সব কাণ্ড হয় অমিয়র মুখে তা শুনতে বাকি নেই। একলা এখান থেকে ফেরা অসম্ভব, কারণ সুন্দরবাবু ভূত-পেত্নী মানেন। এবং অমিয়র বোন শীলাকে যে মানুষ চুরি করেছে, এ-কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। একলা বাসায় ফেরবার সময়ে যদি তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়······সুন্দরবাবু অত্যন্ত অসময়ে এখন বুঝতে পারলেন যে, এই সব নির্বোধ, গোঁয়ার ছোকরার দলে ভিড়ে তিনিও বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

জয়ন্ত তাঁর মনের ভাব আন্দাজ করে মৃদু হেসে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ রাত্রে অন্ন না জুটলেও অন্য কিছু জুটতে পারে।··· নিশীথবাবু, বলুন তো, আপনাদের গাড়িতে রসদ কী আছে?'

নিশীথ বললে, 'এক কাঁদি মর্তমান কলা, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ, ছয় ডজন চিকেন স্যাণ্ড-উইচ, কিছু কেক, আর কিছু বিস্কুট।'

জয়ন্ত বললে, 'অতএব সুন্দরবাবু আজ উপোস করবার ভয় নেই।'

সুন্দরবাবু অল্প একটু হেসে বললেন, 'তাহলে তোমরা এখানে রাত্রিবাস করবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছ?'

—'কতকটা তাই বটে।'

—'এটা আগে আমাকে জানালেই পারতে! এখানে রাত কাটাবার প্রস্তাব আমার ভালো লাগছে না!'

এমন সময়ে মানিক বললে, 'অমিয়বাবু, আপনি না বলেছিলেন, মানুষ এখানে আসতে চায় না?'

—'হ্যাঁ। এ-জায়গাটার বদনাম আছে। আর সে বদনাম যে মিছে নয়, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি!'

—'তাহলে বালির উপরে এই পায়ের দাগগুলো কিসের?'—বলে মানিক নদীর তীরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

বালুতটে লম্বা পায়ের দাগের সারি,—নদীর জলের দিক থেকে উপর দিকে উঠে এসেছে। আর সবগুলিই হচ্ছে মানুষের পায়ের দাগ।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে জানেন?'

—'পুলিশে কাজ করি, তা আর জানি না?'

—'আমেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান'-রা পুলিশে কাজ করে না, কিন্তু পায়ের দাগ দেখে অপরাধী ধরতে তারা যেমন ওস্তাদ, পৃথিবীর কোন বড় ডিটেকটিভও তেমন নয়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আমাদের সামনের এই দাগগুলো দেখে অনেক কথাই বলা যায়।'

—'হুম্! কী বলা যায় শুনি?'

জয়ন্ত পকেট থেকে গজকাঠি বার করে একমনে দাগগুলো মাপতে লাগল। তারপর বললে, 'দাগগুলো যখন এত স্পষ্ট তখন নিশ্চয় পুরানো নয়। হয়ত কালই দাগগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এখান দিয়ে একদল লোক গিয়েছে। যে দলের একজন লোক খুব

বেশি ঢ্যাঙা! বেঁটেদের চেয়ে লম্বা লোকদের পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান হয় বেশি। দলের একজন লোক খুব মোটা, তাই তার পায়ের দাগ বালির ভিতরে বেশি গভীর হয়ে বসেছে। দলের একজনের ডান-পা খোঁড়া—বালির উপরে তার ডান পায়ের আঙুলের চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু গোড়ালির চিহ্ন নেই।'

'এখানে ছয়জন লোকের পায়ের দাগ আছে। আমি ছয়জোড়া আলাদা পায়ের দাগ পেয়েছি। অমিয়বাবু, আপনাদের যারা আক্রমণ করেছিল—'

বিবর্ণ মুখে অমিয় বলে উঠল, 'তাদের দলেও ছয়জন লোক ছিল।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এ-গুলো তাদেরই পায়ের দাগ হলে বলতে হয়, তাদের ভূত-প্রেত বলে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। তারা ছায়ামূর্তি হলে এখানে তাদের পায়ের দাগ পড়ত না।'

পরেশ বললে, 'তারা ভূত-প্রেত কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বন্দুকের গুলি খেয়েও তারা যে এগিয়ে এসেছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

মানিক বললে, 'কিন্তু তখন আপনাদের মাথার ঠিক ছিল? নিশ্চয়ই আপনাদের গুলিতে তারা আহত হয়নি?'

নিশীথ বললে, 'আমাদের পক্ষে জোর করে কিছু বলা সাজে না, আর অসম্ভবে কেউ বিশ্বাস করবেই বা কেন? কিন্তু জানবেন, তারা আমাদের এত কাছে ছিল যে অতি-বড় আনাড়ীর বন্দুকের গুলিও ব্যর্থ হবার কথা নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'যাক, এখন আর ও-নিয়ে তর্কের দরকার নেই, কারণ সেই মূর্তি-ছটা সামনে না থাকলে ও-তর্কের কোন মীমাংসাই হবে না। তার চেয়ে এখন দেখা যাক, ঐ দাগগুলো কোন্ দিকে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু তখন 'রসদ' খানাতল্লাস করবার জন্যে নিশীথদের মোটরের ভিতর প্রবেশ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে পায়ের দাগগুলো উঠে গিয়েছে উপর দিকে। সকলে সেই রেখা ধরে ঢালু জমির উপর দিয়ে অগ্রসর হল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। কারণ নদীর প্রায় ধারেই রয়েছে একটা জঙ্গলময় জমি, এক সময়ে তার চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল, স্থানে স্থানে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও বর্তমান রয়েছে। পায়ের দাগগুলো সেই জমির ভিতরেই প্রবেশ করেছে।

সকলে ভাঙা প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'সারাদিনের পর একটা হদিস মিলল বটে, কিন্তু আজ বোধহয় আর কিছু নতুনত্ব পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে গিয়েছে।'

পশ্চিমের আকাশে তখন সোনালি ও লাল রঙ গুলে কে যেন নূতন ছবি আঁকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে।...সুমুখের জমির ঝোপ-ঝাপের আশেপাশে অন্ধকার এখনি ঘন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে, চারিদিক এমন স্তব্ধ যে একটা সূচ পড়লেও শোনা যায়। সেই মৌনতার ভিতরে মাথার উপর দিয়ে যখন একঝাঁক বক উড়ে গেল তখন তাদের ডানাগুলোর ঝটপট শব্দ শুনে মনে হল, যেন অনেকগুলো ভৌতিক আত্মা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

এমন সময় দেখা গেল, সুন্দরবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে দৌড়ে আসছেন—তাঁর এক হাতে খান-কয় স্যাণ্ডউইচ এবং অন্য হাতে এক ছড়া কলা—কাছে এসেই তিনি বললেন, 'এই ভর সন্ধেবেলায়, এই মারাত্মক জায়গায় আমাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় পালিয়ে যেতে চাও?'

মানিক বললে, 'সে কি সুন্দরবাবু, অমন ঝুড়ি ভরা আম, কলা, কেক, সন্দেশ, বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচের মাঝখানেও নিজেকে আপনি একলা বলে মনে করছিলেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! কিন্তু জয়ন্ত, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

—'ঐ জমির মধ্যে। পায়ের দাগগুলো ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।'

সুন্দরবাবু দু চারবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে বললেন, 'বাব্বাঃ, ওটা যে গোরস্থান বলে মনে হচ্ছে!'

—'হ্যাঁ, ওটা গোরস্থানই বটে। এখনো দু-চারটে কবরের পাথর অটুট আছে। আমি জানতে চাই, পরিত্যক্ত শহরে এই পোড়ো গোরস্থানে ছয় জন মানুষ কী উদ্দেশ্যে এসেছিল? হয়ত তারা এখনো ওর মধ্যেই আছে। কারণ পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ-পথ দিয়ে এখনো তারা বেরিয়ে আসেনি।'

—'হয়ত তারা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'হতে পারে। কিংবা এখনো তারা বেরিয়ে যায়নি।'

—'কিন্তু আর যে আলো নেই!'

—'আকাশের আলো নেই, আমাদের আলো আছে। সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা ছ-টা বড়ো বড়ো পেট্রলের লণ্ঠন এনেছি। সেগুলো জ্বাললে এখানটা আলোয় আলো হয়ে উঠবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শোন জয়ন্ত, রাত্রিবেলায় বেড়াবার পক্ষে গোরস্থান খুব ভালো জায়গা নয়! আমরা তো কাল সকালেও ওর মধ্যে যেতে পারি।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'এক রাত্রের হেরফেরে সমস্ত সুযোগও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি আজকেই এই গোরস্থানটা দেখব।'

আচম্বিতে খানিক তফাতে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর অট্টহাসি জেগে উঠল।

সুন্দরবাবু চমকে একেবারে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর হাত থেকে কলার ছড়া খসে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন ঝাপসা, জয়ন্ত কারুকেই দেখতে পেলে না—সে বুকের উপরে দুই হাত রেখে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য অট্টহাসি শুনতে লাগল।

অমিয় ম্লান মুখে অস্ফুট স্বরে বললে, 'সেদিনও আমরা এই অমানুষী হাসিই শুনেছিলুম!'

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### আবার সেই মারাত্মক 'ছয়'

নদীর মতো শব্দেরও স্রোত আছে। নদীর স্রোত দেখা যায়, কিন্তু শব্দের স্রোত ধরা পড়ে কানে।

খানিকক্ষণ ধরে সেই ভয়াবহ অট্টহাসির শব্দ ঠিক স্রোতের মতোই শূন্যতার মধ্য দিয়ে অবিরাম বয়ে চলল। তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গেল এবং তার প্রতিধ্বনিগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেন নিস্তব্ধতার মহাসাগরে।

সুন্দরবাবু তখন দুই হাতে দুই কান চেপে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়েছেন।

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ প্রাণপণে পরস্পরের হাত চেপে ধরে আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'যে হাসছে সে হয় পাগল, নয় আমাদের ঠাট্টা করছে।'

মানিক কিছু বললে না, কেবল নিজের বন্দুকের কুঁদোটা মাটির উপরে ঠক্-ঠক্ করে ঠুকতে লাগল।

রাত্রিময়ী বনভূমি, ভয়-ভরা রহস্যময় তার রূপ। মাথার উপরে অন্ধকারে আকাশ-দানবের হাজার হাজার তারকা-চক্ষু মিটমিট করে তাকিয়ে আছে তার তলায় আরো ঘন অন্ধকারে পর্বতশিখরগুলো যেন দৈত্যপুরীর বিচিত্র ও বিরাট অভিনয়-ভঙ্গিতে স্থির ও স্তম্ভিত হয়ে আছে এবং তারও তলায় যেন সীমাহারা বিশাল অরণ্য সভয়ে বদ্ধ স্বরে থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে।

ঘুঘুর ম্রিয়মাণ সুরকে ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠছে প্যাঁচার বিরক্ত কর্কশ কণ্ঠ—সে যেন বিপুল বনকে এবং এই বনের ভিতরে আজ যারা এসে পড়েছে তাদের সবাইকে ক্রমাগত অভিশাপের পর

অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘন-ঘন বেজে উঠছে কালো বাদুড়দের অলক্ষুণে ডানাগুলো।

সুন্দরবাবু শিউরে শিউরে বলে উঠলেন, 'আলো জ্বালো, আলো জ্বালো, আলো জ্বালো!'

পেট্রলের লণ্ঠন আনবার জন্যে পরেশ গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

জয়ন্ত একখানা হাত ধরে তাকে থামিয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

—'আর যে অন্ধকার সইতে পারছি না, আলোগুলো এনে জ্বেলে ফেলি!'

—'না, যদি এখানে সত্যিই শত্রু থাকে, তাহলে আলো জ্বাললে আমাদের দেখতে পাবে। এখন অন্ধকারই আমাদের বন্ধু।'

সুন্দরবাবু বসে বসেই পিছন হটতে হটতে বললেন, 'কিন্তু শত্রুরা অন্ধকারেই আমাদের দেখতে পেয়েছে—ঐ ঝোপের ভিতর থেকে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!'

মানিক দেখলে, সামনের একটা ঝোপ থেকে সত্য সত্যই চার-চারটে চোখের আগুন জ্বলছে আর নিবছে—জ্বলছে আর নিবছে।

অমিয় ও নিশীথ বন্দুক তুললে।

জয়ন্ত হেসে বললে, 'খুব সম্ভব দুটো শেয়াল আশ্চর্য হয়ে আমাদের দেখছে।'

তারপরেই আগুন-চোখগুলো আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, মিছে ভয় পেয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করবেন না। ভয় বড়ো সংক্রামক। একজন ভয় পেলে আর সকলেও ভয় পাবে! অথচ এখানে ভয় পাবার মতো কিছুই আমি দেখছি না।'

কিন্তু সুন্দরবাবু জয়ন্তের কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না—তিনি তখন কান পেতে অন্য কি যেন শুনছিলেন।

মানিক চুপিচুপি বললে, 'জয়, নদীর জলে ছপ্-ছপ্ শব্দ হচ্ছে। কে যেন নদী পার হচ্ছে!'

তারপরেই শব্দটা থেমে গেল।

খানিক পরে খুব কাছেই শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। কে যেন দ্রুতপদে গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সে যে কে, কিছুই নজরে পড়ল না, ছিদ্রহীন অন্ধকার তার মূর্তিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

অমিয় অস্ফুটস্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, যেখানে দিনের বেলায় মানুষ আসতে ভয় পায়, সেখানে এমন সময়ে এই অন্ধকারে যে বেড়াতে আসে, তাকে কি সাধু বলে মনে হয়?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কিন্তু এখান দিয়ে যে গেল সে কি মানুষ? এই রাত্রে এই পোড়ো শহরের গোরস্থানের সঙ্গে জ্যান্তো মানুষের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমরা চোখে দেখছি খালি অন্ধকার, ও কিন্তু দিব্যি হন্-হন্ করে এগিয়ে গেল!'

মানিক বললে, 'জয়, আমরাও কি ওর পিছনে গোরস্থানে গিয়ে ঢুকব?'

জয়ন্ত বললে, 'গোরস্থানে ঢুকতে হলে আলো জ্বালতে হয়। কিন্তু এখন আলো জ্বালা আর নিজে-থাকতে ধরা দেওয়া একই কথা। কী যে করব বুঝতে পারছি না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে মানে মানে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়া। নইলে ভূত কি মানুষ শত্রুর হাতে না হোক, সাপ কি বিচ্ছুর কামড়ে আমাদের মৃত্যু হবে অনিবার্য!'

পরেশ বললে, 'এইমাত্র আমার পায়ের উপর দিয়ে সড়্-সড়্ করে কি চলে গেল!'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে লাফাতে লাফাতে ও পা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'হুম্! আমার পায়ে উঠলে সে নিশ্চয়ই আমাকে কামড়ে দেবে। এই—হুস্ হুস্! এই—হুস্ হুস্!'

মানিক হেসে ফেলে বললে, 'সুন্দরবাবু, হুস্-হুস্ করে আপনি কি কাক তাড়াচ্ছেন?'

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'মরছি নিজের জ্বালায়, এখন আর ঠাট্টা করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না মানিক!...ওরে বাস্ রে, এ কী অন্ধকার! ‍দুনিয়ায় এত অন্ধকারও থাকতে পারে! অ জয়ন্ত, কোন্ দিকে গাড়ি আছে বলে দাও! তোমরা না-যাও, আমি একলাই গাড়িতে গিয়ে বসে থাকব!'

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন, এবং আচম্বিতে বনের ভিতর থেকে জেগে উঠল বাঘের গভীর গর্জন।...তিনি চমকে আবার পায়ে পায়ে পিছিয়ে দলের মাঝখানে এসে হতাশভাবে বললেন, 'তাহলে উনিও এখানে আছেন?' তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে তিনি আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন ও সাপের ভয়ে মাঝে মাঝে পা ঝাড়তে লাগলেন।

শৃগালদের সম্মিলিত কোলাহল জানিয়ে দিলে, এখন দুপুর রাত্রি। নদীর কলতান শোনাচ্ছে কান্নার মতো। আকাশ একে অন্ধকার কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল অধিকতর পুরু আর-একটা অন্ধকারের ঘোমটা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের তারকা-নেত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, 'মেঘ উঠেছে। আজও হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

অমিয় বললে, 'তাহলে আমাদের দুর্দশার বাকি কিছু আর রইল না। এইবেলা—'

কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল—সেই আসন্ন দুর্যোগের বিভীষিকা, সেই নিবিড় তিমিরের ভয়াল অন্ধতা, সেই নানা-শব্দ-বিচিত্র রাত্রির গভীরতা, সেই পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্রের অমানুষিকতার ভিতর থেকে জাগ্রত হল ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক এক কণ্ঠধ্বনি: চ যেন আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে কাদের ডেকে ডেকে তীব্রস্বরে বলছে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! অন্ধকারে যারা দেখতে পায় তারা আসুক এখন অন্ধকারে যারা

দেখতে পায় না তাদের কাছে! আকাশের মেঘ তোদের ডাকছে, নিঝুম রাতের আঁধার তোদের ডাকছে, মৃত আত্মার বন্ধু তোদের ডাকছে! কবরে কবরে দুয়ার খুলে যাক, কফিনে কফিনে জীবন জাগুক, মরা চোখে চোখে আলো ফুটুক! বেগম-সাহেবা বসে বসে কাঁদছে, বাঁদীরা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, আলো নিয়ে তোরা সবাই আয় আয়—ওরে আয় রে!'

বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ করে হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়ার ঝাপট বয়ে গেল, কড়্-কড়্-কড়্-কড়্ করে বজ্রের ধমক শোনা গেল, মড়্-মড়্-মড়্-মড়্ করে বড়ো-বড়ো গাছের মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়ল। বাঘ আর ভয়ে গর্জন করছে না, প্যাঁচা-বাদুড় ভয়ে আর ডানা ঝট্‌পটিয়ে উড়ছে না, শৃগালরা ভয়ে আর আগুন-চোখ মেলে তাকাচ্ছে না।

তারপরেই খল্-খল্-খল্-খল্ করে আবার সেই অট্টহাসির পর অট্টহাসির স্রোত।

অমিয় প্রায় আর্ত স্বরে বলে উঠল, 'ও হাসি আমি চিনি; কিন্তু অমন করে কথা কইল কে?'

সুন্দরবাবু ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কে ডাকছে, কে আসবে, কে অন্ধকারে দেখতে পায়, কে বেগম আর কেই বা বাঁদী? আমরা কি সশরীরে নরকে এসে পড়েছি?'

জয়ন্তও যেন আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললে, 'বেগমই বা কে, আর বাঁদীই বা কারা? এ কি পাগলের প্রলাপ? মানিক, তোমার কী মত? লণ্ঠনগুলো জ্বেলে আমরা কি গোরস্থানে ঢুকে ঐ পাগলটাকে আক্রমণ করব?'

মানিক সজোরে জয়ন্তের কাঁধ চেপে ধরে বললে, 'চুপ চুপ! ঐ দেখ!'

জয়ন্তের দুই চক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। তাদের কাছ থেকে প্রায় দুইশত গজ তফাতে, গোরস্থানের ভিতরে নড়ে-নড়ে

বেড়াচ্ছে কতকগুলো আলো। তাহলে ঐ গোরস্থান নির্জন নয়? ওখানে আলো নিয়ে কারা কী করছে?

আবার সেই কণ্ঠস্বর—'ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! রোশনাই কই, খানা কই। বিছানা কই?'

আলোগুলো এতক্ষণ এলোমেলো ছিল, হঠাৎ এখন সার-বেঁধে একদিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! ও হচ্ছে আলেয়ার আলো!'

পরেশ বললে, 'না, ও আলো নয়। যাদের হাতে আলো আছে, তাদেরও আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে।'

নিশীথ বললে, 'কিন্তু ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কে ওরা? এই গোরস্থানের ভেতরে কি ডাকাতদের আড্ডা আছে?'

জয়ন্ত বলল, 'অমিয়বাবু, আপনাদের ছয়জন লোকে আক্রমণ করেছিল তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'মানিক, নদীর তীরে আমরাও আজ ছয় জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছিলাম তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন ঐ আলোগুলো গুনে দেখ দেখি।'

মানিক গুনতে গুনতে বললে—'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছ-টা আলো—তার মানে, ছ-জন লোক।'

অমিয় উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্তবাবু! তাহলে ওরাই আমাদের শীলাকে চুরি করেছে! ওরা ভূতই হোক আর মানুষই হোক, কিছুই আমি কেয়ার করি না—আমি এখনই ওদের আক্রমণ করব—আমার বোনকে উদ্ধার করব—হয় আমি মরব, নয় ওদের মারব!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে চেপে ধীরে বললে, 'শান্ত হোন অমিয়বাবু, এখন গোয়াতুর্মি করবার সময় নয়! ওখানে যদি

ডাকাতের দল থাকে তাহলে ওদের দলে কত লোক আছে তা কে বলতে পারে? আমরা ওখানে গিয়ে প্রাণ দিলে তো আপনার বোনের উপকার হবে না।'

মানিক বললে, 'আলোগুলো আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!'

জয়ন্ত স্থিরভাবে বললে, 'যাক গে। আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে। কাল সকালে এই গোরস্থানই হবে আমাদের কার্যক্ষেত্র। আজ এই অন্ধকারে অজানা জায়গায় গোলমাল করে কিছুই হয়ত করতে পারব না, মাঝখান থেকে শত্রুরা সাবধান হয়ে সরে পড়বে। বৃষ্টি এল বলে, রাত পোয়াতে আর ঘণ্টা-কয় মাত্র দেরি আছে; বাকি রাতটুকু মোটরে বসে কাটিয়ে দিই গে চল।'

অমিয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তের কথামত নিজেদের মোটর গাড়ির দিকে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনতে পেল, বনের পথে আবার কার একখানা মোটর গাড়ির গর্জন—গাড়িখানা যেন খুব তাড়াতাড়ি ছুটছে!

অমিয় আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এখানকার সবই কি অস্বাভাবিক! এমন জায়গায় এমন সময়ে কে আবার মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে এল?'

নিশীথ বললে, 'একখানা নয়, আবার আর-একখানা মোটর! ঐ শোনো, এখানাও খুব জোরে ছুটে চলেছে!'

মানিক বললে, 'ডাকাতরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কি মোটরে করে দলবল নিয়ে এল?'

আচম্বিতে অরণ্যের ভিতরে দূরে একটা ভয়ানক শব্দ হল। সকলে সবিস্ময়ে শুনছে, এমন সময়ে আবার সেই রকম আর-একটা শব্দ।

অমিয় বললে, 'এ যে কোনো accident-এর শব্দ!'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে শুকনো গলায় বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, accident-ই বটে! আমাদেরই সর্বনাশ হল বোধহয়!'

যেখানে তাদের গাড়ি ছিল, সেখানে গিয়ে দু-খানা মোটরই আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, 'আমরা এখন অসহায়! আমাদের অদৃশ্য শত্রু এসে দু-খানা মোটরই চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর চালকহীন গাড়ি দু-খানা খানিক দূরে এগিয়েই গাছে কি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! তাতে শত্রুদের লাভ?'

জয়ন্ত বললে, 'আমাদের পালাবার পথ বন্ধ হল। হয়তো শত্রুরা এখনি আমাদের আক্রমণ করবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আমি এখন পায়ে হেঁটেই পালাতে চাই। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তোমরা আসো আর নাই-ই আসো, এই আমি দৌড় মারলুম!'

সুন্দরবাবু সত্য সত্যই সকলের মায়া কাটিয়ে দৌড় দিলেন, কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তাঁর সুমুখে গিয়ে পড়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, একটু দাঁড়ান! বোধহয় আমরাও আপনার সঙ্গী হতে বাধ্য হব!'

হঠাৎ পিছনে আর একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। মাটির উপরে ধুপ-ধুপ করে পায়ের শব্দ—যেন একদল সৈন্য তালে তালে পা ফেলে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত বললে, 'যা ভেবেছি তাই! ঐ ওরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া উপায় নেই!'

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### নবাব

অনেক কষ্টে মাইলের পর মাইল পাহাড়ে-পথ হেঁটে পার হয়ে পরদিন তারা যখন লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেলা দুপুর। তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে বৃষ্টি পড়ছে তখনো। এবং সে বৃষ্টি সে-দিন সে-রাত আর থামবার নাম করলে না।

লোকালয়ে পৌঁছে তারা প্রথমেই পেল পুলিশের একটা ফাঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক ছাড়া বাকি সকলের শরীরের অবস্থা হয়েছিল এমন ভয়ানক যে, ফাঁড়ির সামনে গিয়ে তারা একেবারে ভেঙে পড়ল। কাজেই জয়ন্ত ও মানিক বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে ফাঁড়ির ভিতরেই প্রবেশ করল। তাদের অবস্থা দেখে, কাহিনী শুনে ও পরিচয় পেয়ে দারোগা পীর মহম্মদ সাহেব সকলকে যার-পর-নাই আদর-যত্ন করলেন এবং সেদিনকার মতো তাদের ফাঁড়ির ভিতরেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালকের রাত্রের দুঃস্বপ্ন জয়ন্তের মতো লোককেও আজ পর্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে। সে কী নিরেট অন্ধকার! যেন মুগুরের বাড়ি মারলে সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! সে কী দুর্যোগ! যেন ঝড় আর বৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর আনন্দে আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল অশ্রান্তভাবে। সে কী বিভীষিকা! প্রেতাত্মা-জগতের সিংহদ্বার খোলা পেয়ে যেন মূর্তিমান অভিশাপের দল সেদিন মানুষের জগৎ আক্রমণ করেছিল!

সেই মুহুর্মুহু নব নব ভয়-বিস্ময়ের অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৃষ্টির কনকনে শীতলতায়, বজ্রসাথী ঝড়ের ঝাপটায় ও ধাক্কায়, কখনো উপল-সঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে, কখনো

বর্ষাধারায় হঠাৎ-বেগবতী নদীর তীব্র স্রোত ঠেলে ঠেলে, তীক্ষ্ণ কাঁটা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে এবং কখনো বা ধু-ধু খোলা মাঠের তৃণহীন পিচ্ছিল পাথুরে জমির উপর আছাড় খেয়ে তারা প্রাণপণে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে—এবং তাদের পিছনে পিছনে বরাবর ধেয়ে এসেছে সে যে কারা কেউ তা জানে না, কেবল তাদের কানের কাছে একটানা সমানে বেজে বেজে উঠেছে সেই মহা-অমানুষিক আশ্চর্য পায়ের শব্দ—একদল সৈন্য যেন সমতালে পা ফেলতে ফেলতে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, আসছে আর আসছে আর আসছে—সে ভয়াবহ পা-গুলো যেন থামতে জানে না, যেন কখনো থামবেও না, যেন তারা চিরদিন ধরে এই মাটির পৃথিবীকে দলিত, শব্দিত ও স্তম্ভিত করে চলে চলে বেড়াবে!

উঃ! সে কথা ভেবে ভেবে জয়ন্ত এখনো থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

জয়ন্তের দেহ লম্বায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি, তার বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়ায় এবং তার ব্যায়ামপুষ্ট সুদীর্ঘ দেহকে দেখায় ঠিক দানবের দেহের মতো। মানিকের দেহ অতটা জাঁকালো দেখতে না হলেও যে-কোন পালোয়ানেরই মতোন বলবান। কিন্তু তাদের এমন বলিষ্ঠ দেহও কালকের রাত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছে। দলের অন্যান্য লোকেদের কথা না তোলাই ভালো। তারা আজ শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিশূন্য।

কিন্তু কে তারা এমন একতালে পা ফেলে ফেলে আসে? মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-আলোতে কতকগুলো ধবধবে সাদা মূর্তির মতোন কি যেন দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেটা চোখের ভ্রমও হতে পারে। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক হি-হি-হি-হি হাসিও শোনা গিয়েছে। হাসেই বা কে, আর আসেই বা কারা? অনেক মাথা ঘামিয়েও জয়ন্ত কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

আর একটা জায়গায় তার মনে খটকা লেগে রয়েছে। ভোর—

বেলায় পূর্ব-আকাশে ঊষা যেই সিঁথায় সিঁদুরের রেখা টেনেছিলো, কোথা থেকে বনমুরগি জাগরণের প্রথম ডাক ডেকে উঠেছিলো, আবছা আলো এসে অন্ধকারকে কাঁচের মতোন স্বচ্ছ করে তুলেছিলো, অমনি থেমে গিয়েছিলো তাদের পিছনকার সেই একগুঁয়ে পায়ের শব্দগুলো। যারা তাদের আক্রমণ করেছিল তবে কি তারা রাত্রির রহস্যযাত্রী—প্রভাতকে তারা ভয় করে?

কিন্তু এক বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। জয়ন্ত জানে, সে ঠিক সূত্রই ধরেছে—ঐ গোরস্থানে বা তার আশেপাশেই আছে সমস্ত রহস্যের মূল। ওখানে ভাসা-ভাসা যাদের দেখেছে এবং যাদের হাসি ও পায়ের শব্দ শুনেছে, তারাই হচ্ছে আসল পাপী ও অপরাধী। নইলে একটা পোড়ো শহরের পরিত্যক্ত গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা লুকিয়ে রাত্রিবাস করতে আসে না, নইলে বাইরে থেকে কেউ সেখানে এসেছে জেনে মোটর গাড়ি ভেঙে তারা পালাবার পথ বন্ধ করে দেয় না, নইলে অকারণে কেউ কারুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় না।

আজ সকালে সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতে পারতো, তাহলে কতটা সুবিধাই হোত। ওখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক আবিষ্কার করা যেতে পারে।

কিন্তু আজ আর ওখানে যাবার কোন উপায় নেই। তাদের গাড়ি দু-খানা শত্রুর চক্রান্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তাদের সঙ্গীদের গতরও চূর্ণ হয়ে গেছে—তার উপর এই অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি।—একটা মূল্যবান দিন মিথ্যা নষ্ট হল।

লম্বা ঘরে পাশাপাশি ছয়খানা খাটিয়ায় জয়ন্ত, মানিক, সুন্দর-বাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের জন্যে চা এলো, আর সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও নিতান্ত চা

খাবার লোভেই নারাজভাবে উঠে বসলেন। কিন্তু পিয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে গিয়েই তিনি করে উঠলেন আর্তনাদ।

জয়ন্ত বললে, 'কী হলো সুন্দরবাবু? হঠাৎ অমন করে উঠলেন কেন?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'হুম্! অমন করে উঠলুম কেন? জেনে-শুনে ন্যাকা সাজা হচ্ছে? মনে নেই, কাল পাহাড়ের উপর থেকে এই বুড়ো বয়সে ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলুম? এখনো চোয়াল নাড়বার জো নেই!'

জয়ন্ত বললে, 'ও! আচ্ছা, এইবারে মনে থাকবে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার পাল্লায় পড়েই তো আজ আমার এই দুর্দশা! দিব্যি সুখে ছিলুম, মরতে আমায় ভূতে কিলোলো, তাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। এ কী কাণ্ড রে বাবা! ভূতে-মানুষে টানাটানি! নিতান্ত এখনও পরমায়ু আছে, তাই এতো বড়ো ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি। হুম্, কাল সকালেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। জয়ন্ত, মানিক, তোমরাও বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো। অমিয়বাবু, আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আর এখনও বলছি, আপনি শীগগির ভালো রোজা ডাকুন। আপনার বোনকে উদ্ধার করা পুলিশ কি শখের ডিটেক্‌টিভের কাজ নয়! কুমারী শীলাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—আপনি রোজা ডাকুন!'

কিন্তু অমিয় মোটেই সুন্দরবাবুর দামী উপদেশ শুনছিলো না। সে এতক্ষণ চা পান করতে করতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো এবং হঠাৎ এখন চমকে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর চায়ের পেয়ালাটা সশব্দে টেবিলের উপরে রেখেই ঝড়ের মতোন বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে বসে যখন সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তখন রাস্তা থেকে অমিয়র উচ্চ চিৎকার শোনা গেল—'জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! শীগগির আসুন—তাকে ধরেছি!'

ঘরের ভিতর থেকে সবাই ছুটে বাইরে গিয়ে পড়লো—এমনকি সুন্দরবাবু পর্যন্ত তাঁর ডিগবাজি খাওয়ার বিষম ব্যথা ভুলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়েই দেখা গেলো, একটা দীর্ঘকায় লোক অমিয়কে ধাক্কা মেরে পথের উপরে ফেলে দিলে—তারপর হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো। যে-রকম অনায়াসে অমিয়কে সে ভূতলশায়ী করলে তাতে বেশ বোঝা গেলো যে, তার শরীরে রীতিমতো ক্ষমতা আছে। কিন্তু অমিয় তবু ভয় পেলো না বা তাকে ছেড়ে দিলো না, সে মরিয়ার মতো পরমুহূর্তেই মাটি থেকে উঠে ছুটে গিয়ে আবার তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলে। এবার তার হাত ছাড়াবার আগেই আর-সকলে গিয়ে লোকটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে।

অমিয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এই সেই লোকটা। যেদিন শীলা চুরি যায়, সেদিন একেই আমি ভাঙা মসজিদের ভেতরে দেখেছিলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাকাতরা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিলো, তখন এই লোকটাই হা-হা করে হেসেছিলো। পথ দিয়ে আজ ফাঁড়ির দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে এ যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখেই একে চিনতে পেরেছি!'

নিশীথ পরেশ একবাক্যে বললে, 'হ্যাঁ, এই সেই লোক!'

জয়ন্ত লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। দীর্ঘদেহ, ঘোর কালো মুখের উপর লম্বা কালো চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, পরনেও কালো ওভারকোট ও কালো পাজামা। তার তীক্ষ্ণ চোখ দু'টো দেখলেই গোখরো সাপের চোখের কথা মনে হয়। সে-রকম চোখ কেউ কখনো দেখেনি বোধহয়! সে চোখ দু'টোতে যেন পলক পড়ে না! তাদের ভিতর থেকে এমন একটা দুষ্ট ক্ষুধার ভাব ফুটে উঠছে যে একবার দেখবার পর কেউ জীবনে আর কখনো সেই দু'টো চোখকে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না।

দারোগা মহম্মদ সাহেবও গোলমাল শুনে এসে পড়েছিলেন। তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

—'হাজী নবাব আলি।'

—'এই বাবুদের তুমি চেনো?'

—'না। ওঁদের আমি কখনো দেখিনি, ওঁরা কী বলছেন তাও বুঝতে পারছি না।'

—'আলিনগরের ভাঙা মসজিদে তুমি কী করতে গিয়েছিলে?'

—'জীবনে কোনোদিন আমি আলিনগরেই যাইনি।'

অমিয় বললে, 'মিথ্যে কথা!'

নবাবের সাপের মতো চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। কিন্তু মুখে সে শান্ত হাসি হেসে বললে, 'আমি হাজী! মিথ্যে বলা আমার পাপ।'

মহম্মদ সাহেব বললেন, 'তুমি হাজীই হও আর কাজীই হও আর পাজীই হও, আজ তোমাকে ফাঁড়িতে বন্ধ থাকতেই হবে। এখন আমার সময় নেই, কাল সকালে তোমাকে ভালো করে পরীক্ষা করবো।'

নবাবের চোখ আবার ধক্ করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, কোন্ আইনে আপনি আমাকে বন্ধ করে রাখতে চান?'

মহম্মদ সাহেব বললেন, 'আইনের কথা তুমি সেই উকিলদেরই জিজ্ঞাসা কোরো। আমি উকিল নই—আমি দারোগা। এই সেপাই! একে নিয়ে যাও—'

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত সুন্দরবাবুর মনে হলো কে যেন তাঁর কানের কাছে হি-হি-হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

জেগে বিছানার উপরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুন্দরবাবু চ্যাঁচাতে লাগলেন—'জয়ন্ত! জয়ন্ত! তারা এসেছে—তারা এসেছে—তারা এসেছে!'

সেই বিষম চিৎকারে ঘরসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেলো।

জয়ন্ত বললে, 'অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন সুন্দরবাবু, কী হয়েছে?'

—'হুম্! আমার কানের কাছে একটা বিদ্‌ঘুটে হাসি শুনলুম্!'

—'পাগল নাকি?'

বৃষ্টির জন্যে ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। অমিয় আলো জ্বেলে বললে, 'কই, ঘরে তো আর কেউ নেই!'

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবুর ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হে, হ্যাঁ! তবু তো আমার ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে, কিন্তু তোমার ঘাড়ে চেপেছে যে আসল ভূত সে খেয়ালটা আছে কি? হুম্, অট্টহাসিতে আমার কান গেলো ফেটে, আমার ঘুম গেলো ভেঙে, তবু ওঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না!'

মানিক একটা জানলা খুলে দিলে। ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো হু-হু করে জোলো হাওয়া। বৃষ্টিপাতের শব্দে বাইরের অন্ধকার মুখরিত।

কিন্তু মানিকের কান আর-একটা কিছু শুনলে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সমতালে পা ফেলে কারা চলে যাচ্ছে।

সে শব্দ জয়ন্তও শুনতে পেলে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে গম্ভীর স্বরে বললে, 'এসো মানিক!' এবং তারপরেই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও তার পিছনে চললো।

নবাব যে-ঘরে বন্দী ছিলো জয়ন্ত সিধে সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা খোলা—ভিতরে নবাব নেই।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ফুস্‌মন্ত্র, ফুস্‌মন্ত্র! ফুস্‌মন্ত্রে নবাব উড়ে গেছে, আর যাবার সময়ে ফুস্‌মন্ত্রেই আমার কানের কাছে মুখ এনে হেসে গেছে!'

জয়ন্ত বললে, 'ফুসমন্ত্রের নিকুচি করেছে! এই দেখুন, দরজার তালায় চাবি লাগানো রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ তালা খুলে নবাবের পালাবার সুবিধা করে দিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! কে সে? নিশ্চয়ই মানুষ নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'যদি কোন মূর্তিমান অলৌকিক শক্তি এসে দরজা খুলতে চাইতো তা'হলে কুলুপ আপনি খুলে যেত, এর মধ্যে আবার চাবি ঢুকিয়ে কুলুপ খুলতে হোত না। যখন চাবির দরকার হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, আমাদেরই মতো কোন রক্ত-মাংসের হাত এই দরজার কুলুপ খুলেছে। আরো একটা ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অমিয়বাবু ঠিক লোককেই ধরেছেন! এই নবাব আলি যেই-ই হোক, নিশ্চয়ই সে অপরাধিদের একজন। হয়তো সে-ই হচ্ছে দলপতি, নইলে এমন করে পালিয়ে যেতো না।'

নিশীথ বললে, 'কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে ফাঁড়ির ভিতরে নবাবের পালাবার সাহায্য করলে কে?'

মানিক বললে, 'দরজার সামনে যে একজন চৌকিদার ছিল, সে কোথায় গেলো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এও বুঝতে পারছো না? যুস্মন্ত্রে উড়ে গেছে!'

জয়ন্ত লণ্ঠনটা মাথার উপরে তুলে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখলে।

মানিক এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'উঠানের উপরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ও কে বসে আছে?'

সেই চৌকিদার। মানিক তার কাঁধে হাত দিতেই সে এলিয়ে একদিকে হেলে পড়লো।

মানিক সচমকে বললে, 'জয়, এ একেবারে মরে কাঠ হয়ে আছে! কিন্তু এর গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই!

জয়ন্ত লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে চৌকিদারের মরা মুখ দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তার ভুরু দু'টো কপালের দিকে উঠে গেছে, তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে যেন বাইরে ঠিকরে পড়তে চাইছে এব তার মুখ হাঁ করে আছে। মৃত মানুষের মুখে এমন ভীষণ ভয়ের চিহ্ন সে আর কখনো দেখেনি। সে যেন চোখের সামনে নরক-দৃশ্য দেখেই আত্মহারা হয়ে মারা পড়েছে!

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### প্রান্তর-সমুদ্রে

খানিকক্ষণ পরে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, 'হ্যাঁ, এ লোকটিকে কেউ খুন করেনি। কেবল ভয় পেয়েই এ মারা পড়েছে।'

মানিক বললে, 'ভেবে দেখ জয়, যা দেখলে মানুষ মারা পড়তে পারে, সেটা কতদূর ভয়ানক দৃশ্য!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই চৌকিদার বেচারা চোখের সামনে নিশ্চয় কোন আস্ত জলজ্যান্ত ভূত দেখেছিলো।'

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, 'আস্ত বা আধখানা, জ্যান্ত বা মরা — কোনরকম ভূত-টুতই আমি বিশ্বাস করি না। চৌকিদার সত্যই যদি কোন ভূত দেখে থাকে তবে বুঝতে হবে যে, ভূতের ছদ্মবেশে সে কোন মানুষকেই দেখেছে।'

ইতিমধ্যে মহম্মদ সাহেব ও থানার অন্যান্য লোকেরাও গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মৃত চৌকিদারের সেই ভয়বিকৃত ভয়ানক মুখ এবং বিস্ফারিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টি আর তাকিয়ে দেখে সহ্য করা যাচ্ছিল না, একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে লাশের উপরে কাপড় চাপা দিলে।

মহম্মদ ভাবতে ভাবতে বললেন, 'ঈশাক খুব সাহসী চৌকিদার ছিলো, শয়তানের সুমুখে গিয়েও বোধহয় দাঁড়াতে ভয় পেতো না। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিষম ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। তাকে এমন আশ্চর্য ভয় কারা দেখালে? নবাব ছিল ঘরের ভিতরে বন্ধ, আর দরজার কুলুপের চাবি ছিল ঈশাকের পকেটে। কারা এসে সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে নবাবকে খালাস করে দিলে? বুঝতে পারছি, নবাবের একটা দল আছে। কিন্তু তারা এর মধ্যে খবর পেলে কেমন করে? সুন্দরবাবু, আপনি তো কলকাতা পুলিশের

পুরানো আর পাকা লোক, আজকের রহস্য কিছু বুঝতে পারছেন কি ?'

সুন্দরবাবু বিষণ্ণভাবে মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হুম্! এর মধ্যে আর না-বোঝবার কী আছে ? আমি তো গোড়া থেকে বলছি, এ-সব হচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার ! শীগগির রোজা না ডাকলে আমাদের সবাইকেই অমনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মরে থাকতে হবে !'

হঠাৎ মানিক বলে উঠল, 'আচ্ছা, এইমাত্র এখানেও তো আমরা তালে তালে পা ফেলে কাদের চলে যেতে শুনেছি। কে তারা ?'

গোলে-হরিবোলে জয়ন্তও এতক্ষণ সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলো। সেও উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'মানিক, মানিক ! শীগগির আমাদের বন্দুকগুলো আনো ! তারাই হচ্ছে নবাবের দল ! মহম্মদ সাহেব, আর এক মিনিটও দেরি নয়—চলুন আমরা তাদের পিছনে ছুটি,—তারা এখনো বেশি দূরে পালাতে পারেনি।'

মহম্মদ নারাজ হলেন না। তখনি সশস্ত্র হয়ে সবাই থানা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়ন্তবাবু, তাদের দলে কতো লোক আছে ?'

—'জানি না। হয়তো ছ-সাতজন, হয়তো আরো বেশি।'

—'তাদের দেখেই কি ঈশাক মারা পড়েছে ?'

—'হতে পারে।'

—'দূর থেকে খালি কতকগুলো অস্পষ্ট সাদা সাদা মূর্তি দেখেছি।'

সকলে একটা তে-মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তখনো ঝরছে সেই অশ্রান্ত বৃষ্টি এবং থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে ঝোড়ো বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ থেকে ঘন অন্ধকারও যেন পৃথিবীর বুকে ঝর-ঝর করে ঝরছে ক্রমাগত। সেই

জমাট অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে পুলিশদের লণ্ঠনের আলো বেশি দূর অগ্রসর হতে পারছিলো না।

মহম্মদ বললেন, 'এইবারই তো মুশকিল! পথ গিয়েছে তিন দিকে, কিন্তু সেই বদমাইশরা গিয়েছে কোন্ দিকে?'

জয়ন্ত বললে, 'এক কাজ করা যাক। মহম্মদ সাহেব আর সুন্দরবাবু যান সামনের দিকে। অমিয়বাবু, নিশীথবাবু যান বাঁদিকে, আমি আর মানিক যাই ডানদিকে। সব দলেই জন-কয় করে চৌকিদার থাকুক।'

মহম্মদ বললেন, 'এ-ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে-দল প্রথমে শত্রুর দেখা পাবে, তখনি যেন তিনবার বন্দুক ছোঁড়ে। তাহলেই অন্য দু-দল তাদের সাহায্য করতে যেতে পারবে।'

ডানদিকের পথ হচ্ছে আলিনগরে যাবার পথ। জয়ন্তের ধারণা, নবাব সদলবলে এই পথই ধরেছে। জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে রইলো ছয়জন চৌকিদার।

জলমাখা অন্ধকারের গায়ে বার-বার ধাক্কা খেতে খেতে দু'টো লণ্ঠনের আলো অগ্রসর হচ্ছে এবং তারই পিছনে চলেছে জয়ন্ত, মানিক ও চৌকিদাররা। দুই ধারের ঘনবিন্যস্ত গাছপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন বজ্রাগ্নিদগ্ধ বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাভরা একটানা দীর্ঘ নিশ্বাস। চিরকাল যারা কালো রাত্রির সঙ্গী, সেই নিশাচর পেচক ও বাদুড়দেরও আজ দেখা নেই এবং শৃগালরাও আজ এই বীভৎস রাত্রের কালিমার চেয়ে গর্তের অভ্যস্ত কালিমাকে নিরাপদ ভেবে শিকারের লোভ ছেড়ে বাসার ভিতরে বসে আছে। ঘ্যানঘেনে ঝিঁঝিপোকাগুলোও মুখ বুজে যেন কোনো অভাবিত অমঙ্গলের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বৃষ্টি, বাতাস ও তরুমর্মর ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত এগুতে এগুতে বারংবার বলছে, 'আরো তাড়াতাড়ি—

আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো। তারা অনেকটা এগুবার সময় পেয়েছে, তবু তাদের ধরতে হবেই!' যে দুনিয়ায় আজ কীটপতঙ্গের মতো জীবেরও সাড়া নেই সেখানে মানুষের এই উৎসাহিত কণ্ঠস্বর কী অস্বাভাবিকই শোনাচ্ছে! তার গলার আওয়াজ শুনে গর্তের ভিতরে ঘুমন্ত বন্য পশুরা সভয়ে চমকে জেগে উঠতে লাগলো।

লোকালয় পিছনে ফেলে তারা এখন একটা বনের ভিতরে এসে পড়েছে। মানিক হতাশ কণ্ঠে বললে, 'জয়, হয়তো তারা এ-পথে আসেনি।'

জয়ন্ত বললে, 'অন্য দু'টো পথের দিক থেকেও তো আমাদের কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনছি না। তুমি কি বলতে চাও তারা কোনো পথে না গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে? তুমিও কি ভূত মানো? যতক্ষণ না ওরা বন্দুক ছোঁড়ে, ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই।'

—'কিন্তু যদি তারা এই বনে ঝোপেঝাপে কোথাও গা-ঢাকা দেয়? অন্ধকারে তাদের কি আর খুঁজে বার করতে পারবে?'

—'সে মুশকিলের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তবু থামলে আমাদের চলবে না। এগিয়ে চলো—আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো!'

সারা বন যেন আজ বিভীষিকার মদে মাতাল হয়ে টলোমলো। বড়ো বড়ো গাছের ডালপাতার জালে বাঁধা পড়ে ঝোড়ো হাওয়া কখনো করছে তীক্ষ্ণ স্বরে হাহাকার, কখনো করছে ভৈরব বিক্রমে ভীষণ গর্জন। সেইসঙ্গে ছোট-বড়ো দমকা হাওয়ার দল গলা মিলিয়ে আরো যে কতো রকম অদ্ভুত আওয়াজে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করে তুলেছে, তা বর্ণনা করবার ভাষা কারুর কলমে নেই।

বন শেষ হলো—তারপরেই সকলে একটা মাঠের উপরে এসে পড়লো।

একজন চৌকিদার লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে সামনের দিকে

দেখবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, 'হুজুর, মাঠে জল থৈ-থৈ করছে, পথ আর দেখা যাচ্ছে না।'

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, 'জল ভেঙে এগিয়ে চলো।'

—'কিন্তু কোন্‌দিকে যাব? পথ কোথায়?'

—'সোজা চলো।'

—'এই মাঠে যে খানা-ডোবা-পুকুর আছে! যদি কোনো পুকুরে গিয়ে পড়ি?'

'আমি তোমাকে টেনে আবার ডাঙায় তুলবো। কিন্তু এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো!'

আর একজন চৌকিদার বললে, 'হুজুর, এ-মাঠে এখন কোমর ভোর জল আছে, তার ওপরে এ-হচ্ছে বানজল—এর টানে আমরা ভেসে যেতেও পারি।'

জয়ন্ত বললে, 'এই জল ভেঙে নবাব যখন তার দলবল নিয়ে যেতে পেরেছে, তখন আমরাই বা ভেসে যাব কেন?'

—'না হুজুর, নবাবরা নিশ্চয় এদিকে আসেনি।'

—'যদি এসে থাকে, তাহলে তারা ঐ বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।'

জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, চৌকিদাররা আর এক পা এগুতে রাজী নয়। আর তাদেরই বা দোষ কী? এই অন্ধকার, এই ঝড়ের দাপট, মাঠ দিয়ে এই বন্যার মতো জলপ্রবাহ, এই অবিরাম বৃষ্টির কনকনে ঝাপটা—যা তাদের হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ভিজিয়ে স্যাঁতসেঁতে করে দিয়েছে, তার উপরে অজানা ভয়ানক শত্রুর ভয় তো আছেই। আর, সে বড়ো যে-সে শত্রু নয়—কেবলমাত্র তাদের স্বচক্ষে দেখেই সাহসী চৌকিদার ঈশাক ইহলোক ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে পারেনি।

জয়ন্ত ও মানিক দোমনা হয়ে অতঃপর কী করা উচিত তাই ভাবছে, এমন সময় দেখা গেল সেই জলমগ্ন প্রান্তরের মাঝখানে নিবিড় অন্ধকারের গলায় দুলছে যেন একসার আলোর মালা।

জয়ন্ত চমকে বলে উঠলো, 'ও কী ব্যাপার!'

চৌকিদাররা বললে, 'আলেয়া!'

মানিক বললে, 'এতক্ষণ ও-আলোগুলো কোথায় ছিলো?'

জয়ন্ত উচ্চৈঃস্বরে গুনলে, 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! মানিক, মানিক, আবার সেই ভয়ঙ্কর ছয়!'

—'তাহলে ওরাই হচ্ছে নবাবের সাঙ্গোপাঙ্গ! আঁধারে গা ঢেকে ওরা তো বেশ পালিয়ে যাচ্ছিল, মরতে আলো জ্বেলে আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেন?'

—'আর একটা কথা বুঝে দেখো মানিক। আমাদের লণ্ঠন দু'টো সমানে জ্বলছে; এ-আলো ওরা দেখেছে, আর নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমরা ওদের ধরবার জন্যেই ছুটে এসেছি। সেটা বুঝেও ওরা আমাদের চোখের সামনেই আলো জ্বালতে ভয় পায়নি।'

—'তাহলে কি হঠাৎ ওদের আরো অনেক নতুন লোক এসেছে? ওরা কি ভাবছে যে, আমাদের আর ভয় করবার দরকার নেই?'

—'ওরা কী ভাবছে তা কে জানে! এসো, আগে আমরা তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে আর সবাইকে জানিয়ে দি যে, শত্রুদের দেখা পাওয়া গেছে!'

জয়ন্ত ও মানিক তিনবার বন্দুক ছুঁড়লে—তার তীব্র শব্দে চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দূর থেকে আঁধার রাত্রির বক্ষ ভেদ করে আরো কয়েকটা বন্দুকের গর্জন বাতাস-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শব্দ-তরীর মতো ভেসে এলো। বোঝা গেলো, আর সবাই তাদের সঙ্কেত শুনেই সাড়া দিলো এবং শীঘ্রই তারা তাদের কাছে এসে হাজির হবে।

জয়ন্ত বললে, 'আমরা কোথায় আছি, আলো জ্বেলে রেখে শত্রুদের সেটা আর দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। লণ্ঠন দু'টো নিবিয়ে ফেলো।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আর-একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে মানিক উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, 'জয়, জয়! ওদের আলোগুলো যে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!'

সত্যই তাই! ছয়টা আলো দুলতে দুলতে জয়ন্তদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'আলো নেবাও! ওরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে!'

চৌকিদাররা চটপট আলো নিবিয়ে ফেলল।

তারপর ওদিককার আলোগুলো আসতে আসতে আবার থেমে পড়লো।

জয়ন্ত বললে, 'এসো, আমরা জলে নেমে খানিকটা এগিয়ে থাকি। আমাদের দলবল এসে পড়লেই আমরা ওদের আক্রমণ করবো। বন্দুক তৈরি রাখ, ওরা কাছে আসবার বা পালাবার চেষ্টা করলেই যথাসময়ে আমাদের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করতে হবে।

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে চৌকিদাররাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের ভিতরে নামল। জল কোথাও প্রায় কোমর পর্যন্ত, কোথাও তার চেয়ে কম।

আঃ, সেই অস্বাভাবিক বৃষ্টি—আকাশে এতো জলও থাকতে পারে! সারা প্রান্তর যেন সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়েছে এবং ঝড়ের উদ্দামতা তার মধ্যে রীতিমতো তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। ধারা-পাতের ঝম্ঝম্ ঝম্ঝম্ ধ্বনির সঙ্গে জেগে আছে সেই সুবৃহৎ প্রান্তর-দীঘির পাগলা স্রোতের কল্কল্ কল্কল্ শব্দ। সে জলের কী প্রচণ্ড টান! প্রতি পদেই সকলকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। তার উপরে রাত্রির কালো রঙ এতো পুরু যে প্রান্তরের মাঝে মাঝে যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, একেবারে তাদের উপরে গিয়ে পড়ে ধাক্কা না-খাওয়া পর্যন্ত কারুর অস্তিত্ব জানবার উপায় নেই।

বহু দূরে ছয়টা আলো কালো শূন্যের কোলে কখনো দেখা দিচ্ছে,

কখনো নিবে যাচ্ছে। জয়ন্তের মনে হলো, আলোগুলো যেন তাদের চেয়ে উঁচুতেই রয়েছে।

জয়ন্তই সকলের আগে-আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পায়ের তলায় আর মাটি পেলে না এবং অতলের দিকে তলিয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি জলের উপরে ভেসে উঠে সে বললে, 'হুঁশিয়ার! এখানে একটা পুকুর আছে!'

আন্দাজে আন্দাজে পুকুরের গভীরতা এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে তারা আবার অগ্রসর হতে লাগলো।

মানিক সভয়ে বলে উঠলো, 'আমার পায়ের উপর দিয়ে সাপের মতো কি একটা সাঁৎ করে চলে গেলো!'

জয়ন্ত বললে, 'সাপের মতো বলছো কেন মানিক, ওটা সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

একজন চৌকিদার বললে, 'এ-সময়ে মাঝে মাঝে মাঠের জলে কুমিররাও ভেসে আসে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তারাও আর বাকি থাকে কেন? কেবল কুমির নয়, আমি শুনেছি বানের জলে বাঘ-ভাল্লুকও বাধ্য হয়ে সাঁতার কাটে।'

ছয়টা আলো বেশ খানিকটা কাছে এসে পড়েছে। সেগুলো এদিক-ওদিক নড়ছে বটে, কিন্তু অন্য কোনদিকে আর অগ্রসর হচ্ছে না।

জয়ন্ত বললে, 'নবাব বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমরা তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি। সে হয়তো দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে।'

মানিক নিজের বন্দুকটা আরো জোরে চেপে ধরলে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে জয়ন্ত বললে, 'নবাব খুব চালাক লোক বটে। দেখছো মানিক, আলোগুলো এখনো আমাদের কতো উপরে নড়াচড়া করছে? এই মাঠের কোন-একটা উঁচু জায়গা নিশ্চয়

দ্বীপের মতো জলের উপরে জেগে আছে। নবাব তার দল নিয়ে তার উপরে উঠে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ বাধলে আমাদেরই বিপদ।'

মানিক ভাবতে লাগলো, নবাবকে আজ তারা দেখেছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকগুলো দেখতে কেমন? অমিয় যে বর্ণনা করেছে, তাতে তো তাদের আকৃতি অমানুষিক বলেই মনে হয়। চৌকিদার ঈশাকও তাদের চেহারায় অমানুষিক কোন ভাব দেখে ভয়ে মারা পড়েছে। এ-রহস্যের কারণ কী? কে তারা?

এমন সময়ে দুই-তিনবার বন্দুকের শব্দ হল।

সকলে ফিরে দেখলে, পিছনে—যেদিক থেকে তারা এসেছে সেইদিকে অনেক দূরে চারটে আলো দেখা দিয়েছে।

জয়ন্ত ও মানিক আবার তিনবার বন্দুক ছুঁড়ে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলে, কারণ এই নতুন আলোগুলোর সঙ্গে আসছে যে তাদেরই বন্ধুরা সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু শত্রুদের আলোগুলো তখনো নিবে বা পালিয়ে গেলো না।

জয়ন্ত বললে, 'নবাব কী বুঝেছে তা সেই-ই জানে। এতো লোক দেখেও সে ভয় পেলে না? না, বানের জলে তার পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই সে মরিয়া হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে?'

মানিক চোখের সুমুখে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কতকগুলো ভৌতিক মূর্তি দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে তাদের সকলকে এগিয়ে আসবার জন্যে আগ্রহে আহ্বান করছে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### রক্তশূন্য মড়া

ঘুটঘুটে কালোর কোলে মিটমিটে আলোর মালা। এতোগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনেও মালাকাররা মালা ছিঁড়ে পালিয়ে গেলো না।

অথচ তারা এতো কাছে এসে পড়েছে!

মানিক বললে, 'জলের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা উঁচু জমি আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই জমির উপরেই গাছপালার ভিতর থেকে যে ঐ আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। জয়, ওরা হয় পাগল, নয় মরিয়া। আমার মতে, আমাদের দল যখন সাড়া আর দেখা দিয়েছে, তখন তাদের জন্যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করবো।'

জয়ন্ত বললে, 'তোমার পরামর্শই শুনব। আমাদের পুরো দলে থাকবে পঁচিশটা বন্দুক নিয়ে পঁচিশজন লোক। এদের নিয়ে দস্তুরমতো একটা খণ্ডযুদ্ধের আয়োজন করা যেতে পারে।'

তারা সেইখানে প্রায় বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এতক্ষণ পরে আকাশের বজ্র, মেঘের বৃষ্টি ও ঝড়ের রুদ্রগতি শান্ত ও ক্ষান্ত হবার চেষ্টা করলে। তারপর যখন সদলবলে মহম্মদ, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, তখন বজ্র বৃষ্টি ও ঝড় পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তা ও প্রান্তর-সমুদ্রে বন্যার কলকল্লোল জেগে রইলো আগেকার মতোই।

সুন্দরবাবু এসে জয়ন্তের সুবৃহৎ দেহের উপরে হেলে-পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন, 'বাস্ রে বাস্! চরকির মতো ছুটোছুটি

করে এক মিনিট যে বসে জিরিয়ে নেব তারও উপায় দেখছি না! এই অগাধ সাগরে বসে পড়লেই ডুবে যাব, আর ডুবে গেলেই ভেসে যাব! হুম্!'

মানিক বললে, 'ভয় কী সুন্দরবাবু, ভেসে গেলে আপনি তো চিত-সাঁতার কাটতে পারবেন।'

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠাট্টা করো না মানিক, এ-ঠাট্টা-ফাট্টা ভালো লাগে না!'

মহম্মদ বললেন, 'জয়ন্তবাবু, ও-গুলো নিশ্চয়ই শত্রুদের আলো?'

—'তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এই দুর্যোগে এখানে এসে দেয়ালী-উৎসব করবার শখ হবে কার?'

—'কিন্তু নবাবের আস্পর্ধা তো কম নয়! সে আলো জ্বেলে বসে আছে, যেন আমাদের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভুত আবার কবে মানুষের তোয়াক্কা রাখে? মানুষ হলে ওরা এতক্ষণে বাপ্-বাপ্ বলে পালিয়ে যেত!'

মহম্মদ বললেন, 'রাতও আর বেশি নেই, কথায় কথায় সময় কাটাবারও আর দরকার নেই। চলুন, আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে যাই, ওদের একেবারে ঘিরে ফেলি।'

সকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সামনের উঁচু জমির দিকে এই অবস্থায় যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হল। আলোগুলো তবু নেববার বা পালাবার চেষ্টা করলে না।

মহম্মদ বললেন, 'এখান থেকে বন্দুক ছুঁড়ে আমরা অনায়াসেই ওদের মারতে পারি! আচ্ছা, একবার বন্দুক ছুঁড়ে ওদের ভয় দেখানো যাক।'

মহম্মদ ও তাঁর দেখাদেখি আরো কেউ-কেউ বন্দুক ছুঁড়লেন, ওদিক থেকে তবু কোন উত্তরই এল না, ফিরে এল খালি তাঁদের নিজেদের বন্দুক-গর্জনের প্রতিধ্বনি এবং বেপরোয়া আলোগুলো তখনো অচল।

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, 'ওরা ভূতই হোক আর রাক্ষসই হোক, ওদের আস্পর্ধা আর আমি সইতে পারছি না! আমরা পুলিশের লোক—বিশেষ আমি হচ্ছি গিয়ে ক্যালকাটা পুলিশের লোক—আমাদের সঙ্গে চালাকি? আমি এইবার সত্যি সত্যি ওদের হাতের আলো টিপ করে গুলি ছুঁড়ব!'

সুন্দরবাবু লক্ষ্য স্থির করে দু-বার বন্দুক ছুঁড়লেন। একটা আলো নিবে গেল, কিন্তু অন্য আলোগুলো তবু সরে গেল না।

অমিয় বললে, 'নাঃ, দেখছি ওরা এইবারে সত্যিই অবাক করলে! ওদের কি ভয়-ডর কিছুই নেই?'

মহম্মদ বললেন, 'চল, আমরা সবাই এইবারে জমির উপরে উঠে ওদের আক্রমণ করি।'

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'হুম্! মহম্মদ সায়েব, আমার মনে হয় ওরা অন্ধকারে আমাদের জন্যে কোন ফাঁদ পেতে রেখেছে! ঐ আলোগুলো হচ্ছে টোপ। এগুলে বিপদ হতে পারে!'

মহম্মদ বললেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে। তবু আমি এগুব। চল সবাই, হুঁশিয়ার!'

সবাই অগ্রসর হল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, 'মানিক, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে।'

—'কী?'

—'হয়ত আমরা এখনি নিরেট গাধা বলে প্রমাণিত হবো।'

—'তার মানে?'

—'এই তো উঁচু জমির তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। মহম্মদ সায়েব উপরে উঠে গিয়েছেন। আলোগুলো এখনো জ্বলছে। না, এ অসম্ভব!'

জয়ন্ত ও মানিক পাশাপাশি থেকে জমির উপরে উঠতে লাগল। তখনো কোন শত্রু কি বীভৎস মূর্তির সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল মহম্মদের। নীচে যারা ছিল তারা সবাই শুনলে, মহম্মদ বিপুল বিস্ময়ে চিৎকার করে বলছেন—'কেউ এখানে নেই, কেউ এখানে নেই।'

তারপরই সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বর: 'হুম্! গাছের ডালে খালি লণ্ঠন-গুলো ঝুলছে। আমাদের ভয়ে ভূতগুলো চম্পট দিয়েছে!'

উঁচু জমির উপরে জল ওঠেনি। বৃষ্টি-ভেজা জমির উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, 'মানিক পূর্বদিকে মেঘের পর্দা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এ কিরকম ব্যাপার?'

জয়ন্ত পূর্বাকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত মৃদুস্বরে বললে, 'প্রথম ঊষার স্বপ্নময় আলো ফুটছে। বর্ষা-প্রভাতে আলোকের নবজন্ম কী মধুর!'

সুন্দরবাবু এসে বললেন, 'এখন তোমার কবিত্ব রাখো জয়ন্ত! নবাব কোন্‌দিকে গেল বল দেখি?'

—'যেদিকে রাত্রি গেছে সেইদিকে।'

—'কী বলছ হে?'

—'যারা রাত্রির অনুচর তারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করে না। চেয়ে দেখুন, উষা এখন সিঁথায় সিঁদুর পরেছে। মানিক, ভৈরব রাগে এখন একটা ভজন গাইতে পারো?'

বন্ধুর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে ভেবে জয়ন্তের মুখের দিকে মানিক কটমট করে তাকিয়ে দেখলে।

জয়ন্ত হঠাৎ অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সুন্দরবাবু ভয় পেয়ে দুই-পা পিছিয়ে গেলেন। তিনিও ঠাউরে নিলেন, জয়ন্ত পাগল হয়ে গিয়েছে, হয়ত এখনি সে তাঁকে কামড়ে দেবে!

মহম্মদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'জয়ন্তবাবু, এত হাসছেন কেন? এই কি হাসবার সময়?'

জয়ন্ত হাসতে হাসতেই বললে, 'বলেন কী মহম্মদ সায়েব! এত-বড় প্রহসনেও হাসব না? ঐ লণ্ঠনগুলো আলো নয়, আলেয়ার মতোই আমাদের বিপথে চালনা করে সাত ঘাটের জল খাইয়ে, কাদা ঘাঁটিয়ে এখানে এনে ফেলেছে। বুঝেছেন? নবাব আমাদের চেয়ে ঢের বেশি চালাক। সে অন্ধকারে গাছের ডালে এই লণ্ঠনগুলো ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে কেবল আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে।'

—'অর্থাৎ?'

—'অর্থাৎ আমরা যখন আলোর দিকে ছুটে আসব তারা তখন অন্যদিকে ছুটে পালিয়ে কলা দেখাবার সময় পাবে। বাহাদুর নবাব, বাহাদুর! কাজেই এখন প্রভাতের সূর্যোদয় দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি ঐ হতভাগা সূর্যোদয় দেখতে চাই না!'

—'তাহলে কী করবেন?'

—'আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

—'তাহলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে নবাবের নামে একবার জয়ধ্বনি দিন।'

—'হুম্! নিজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে শত্রুর নামে জয়ধ্বনি দেবার ইচ্ছে আমার নেই!'

—'কিন্তু সুন্দরবাবু, আমার ওটুকু উদারতা আছে। আমাদের মতো এতগুলো মাথাকে যে পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল, সে অসাধারণ ব্যক্তি! এমনধারা অসাধারণ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে নেমে যদি কেল্লা ফতে করতে পারেন, তাহলে সেই জয়ই হবে অতুলনীয়। এতদিন পরেই তো খেলা জমে উঠল! এখন দেখা যাক কে হারে কে জেতে!'

উপর-উপরি বিষম কর্মভোগের পর প্রায় সকলেরই শরীরের অবস্থা হলো এমন শোচনীয় যে, তার পরদিন কেউ আর বিছানা থেকে উঠবার নাম করলে না।

তার পরের দিনের রাত্রি প্রভাত হলে পর মানিক বিছানা থেকে উঠে দেখল, জয়ন্তের শয্যা শূন্য। সে কখন উঠে বেরিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবুও তখন গাত্রোত্থান করে দাড়ি কামাতে বসে গিয়েছেন।

এমন সময় মহম্মদ এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

মানিক শুধোলে, 'কী মহম্মদ সায়েব, এর মধ্যে নবাবের আর কোনো খবর পাননি?'

তিনি বললেন, 'না। কিন্তু এখানকার এক মুসলমান দোকানীর একটি মেয়ে চুরি গিয়েছে।'

মানিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'আবার মেয়ে-চুরি!'

—'হ্যাঁ। কিন্তু এবারে কেবল মেয়ে-চুরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে খুন।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে দাড়ির উপরে ক্ষুরের কোপ বসাতে বসাতে ভারি সামলে গেলেন।

মহম্মদ বললেন, 'কাল রাত্রে দোকানী বাসায় ছিল না। ঘরের ভিতরে তার প্রৌঢ়া স্ত্রী আর সতেরো বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাত্রে পাড়ার লোকে শুনতে পায়, দোকানীর ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় চিৎকার হচ্ছে। পাড়ার লোক যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, চিৎকার তখন থেমে গেছে। কিন্তু চিৎকারের বদলে তারা তখন আর একটা শব্দ শুনতে পেলে। কারা যেন সমতালে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে গা ঢেকে চলে যাচ্ছে। এই পায়ের শব্দের কথা এখন এ-অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শব্দ শুনেই পাড়ার লোকের সমস্ত সাহস উবে যায়,—সকলে আবার যে যার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়। আজ সকালে উঠে সবাই দোকানীর ঘরে ঢুকে দেখে, তার মেয়ে অদৃশ্য, আর তার বউ মরে কাঠ হয়ে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।'

সুন্দরবাবু ক্ষুর নামিয়ে ঘুরে বসে বললেন, 'হুম্! আধখানা দাড়ি আমি পরে কামাব, আগে সব গল্পটা শুনে নি!'

মহম্মদ বললেন, 'খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম। ভয়ানক দৃশ্য! একটি আধবয়সী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর তার আতঙ্কভরা চোখ-মুখ দেখে আমার ঈশাক বেচারীর মুখ মনে পড়ে গেল। ঈশাকের মুখ-চোখেও ঠিক এই রকম বীভৎস ভয়ের ভাব মাখানো ছিল। স্ত্রীলোকটির গলায় একটা মস্ত ছ্যাঁদা, কিন্তু ঘরের কোথাও রক্তের একটুও চিহ্ন নেই। অথচ তার দেহ একেবারে সাদা, যেন সমস্ত রক্তই সেই গলার ছ্যাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘরের কোথাও রক্ত নেই, দেহেও রক্ত নেই—অথচ গলায় অত বড় ছ্যাঁদা! আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি বরাবরই বলছি এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড, তা তোমরা কেউ তো আমার কথায় কান পাতবে না!'

মহম্মদ বললেন, 'তা যদি হয়, তবে এ-সব কাণ্ডের সঙ্গে নবাবের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ নবাবকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম, সে আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ।'

নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অমিয়ও সব শুনছিল। এখন সে উঠে বসে বললে, 'কিন্তু আলিনগরে যে-ছয়টা মূর্তি তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করেছিল, আমাদের বন্দুকের গুলিও যাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনি, তাদের চেহারাও ছিল অবিকল সাধারণ মানুষের মতো।'

পরেশ ও নিশীথ উঠে বসে বললে, 'আমরাও এ-কথায় সায় দি।'

মহম্মদ বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময়। নবাব কেমন করে পালাল? কে তার ঘরের দরজা খুলে দিলে? ঈশাক কেন মারা পড়ল? পরশু রাত্রে গাছের ডালে আলো ঝুলিয়ে কারা আমাদের চোখে ধুলো দিলে? কারা মেয়ে চুরি করে? কেন করে? পাড়া জাগিয়ে কারা তালে তালে পা ফেলে চলে যায়? এ-সব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। আমি স্থির করেছি, আজই সদরে রিপোর্ট পাঠিয়ে সাহায্য চাইব।'

অমিয় বললে, 'কিন্তু এই সব রহস্যেরই মূল আছে সেই আলি-নগরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে।'

মহম্মদ বললেন, 'বেশ, সদর থেকে সাহায্য পেলে আমরা সদলবলে আলিনগরেও গিয়ে হাজির হতে পারব।'

এমন সময়ে জয়ন্ত ফিরে এল। তার গম্ভীর মুখে চিন্তার রেখা।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত! ভয়ানক খবর!'

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে সুন্দরবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'এমন কী ভয়ানক খবর থাকতে পারে, যা আমি জানি না?'

—'হুম্! এবারে মেয়ে-চুরির সঙ্গে মেয়ের মা খুন!'

—'আমি জানি। এইমাত্র ঘটনাস্থল থেকেই ফিরে আসছি।'

—'মহম্মদ সায়েব সদর থেকে সাহায্য আনিয়ে আলিনগর আক্রমণ করবেন।'

—'কবে, মহম্মদ সায়েব?'

—'দিন চারেক পরে।'

জয়ন্ত আর কিছু না বলে মানিককে ইশারা করে আবার ঘরের বাইরে গেল।

মানিক তার কাছে গেলে পর জয়ন্ত বললে, 'আমি আরো দিন চারেক অপেক্ষা করতে পারব না। বিশেষ, এত লোকজন নিয়ে শোভাযাত্রা করে আলিনগরে গেলে আসামীরা সাবধান হয়ে পালাতে পারে।'

—'তুমি কী করতে চাও?'

—'তুমি আর আমি কাল রাত থাকতে উঠে চুপিচুপি আলিনগরে যাত্রা করব।'

—'সে কি, পায়ে হেঁটে? আলিনগর যে এখান থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে!'

—'না, এখানে আমার পরিচিত এক জমিদার-বন্ধু আছেন শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনিই মোটর দেবেন। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, তুমি আমি দু-জনে যেতে পারব। আগে নিজেরা খোঁজ নিয়ে আসি, তারপর দরকার হলে মহম্মদ সায়েবের সাহায্য নেব। মানিক, আজ যে অমানুষিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারপর আর এখানে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা চলে না। সেই রক্তশূন্য মড়ার মুখ চিরদিন আমার মনে থাকবে! গলার ছ্যাঁদা দিয়ে নিশ্চয় রক্তের ঝরণা ঝরেছিল, কিন্তু সে রক্ত কোথায় গেল? আর, তার গলার ক্ষতটা কি রকম দেখতে জানো মানিক? যেন কোন রক্তলোলুপ জন্তু ধারালো দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে ধরেছিল—আর তার দেহের সমস্ত রক্ত সেই-ই প্রাণপণে শুষে পান করে ফেলেছে!'

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### প্রেতের প্রতিহিংসা

ভোর-বেলায় মোটর ছুটে চলেছে আলিনগর।

জয়ন্ত গাড়ির 'হুইল' ধরে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'মানিক, মাঠে মাঠে আর পথের মাঝে মাঝে দেখছি এখনো মন্দ জল জমে নেই। আমরা বেলা দুটো-আড়াইটের আগে আলিনগরে গিয়ে পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমরা দু-জনে আলিনগরে গিয়ে কী করব? সেখানে তুমি কী দেখবার আশা কর?'

—'তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: গোয়েন্দার কাজ দল বেঁধে চলে না। তাতে শত্রুরা সাবধান হবার সুযোগ পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম দিনেই আমাদের দলে যদি বেশি লোক না থাকত, তাহলে এতক্ষণে সমস্ত রহস্য হয়ত আমরা আবিষ্কার করে ফেলতে পারতুম। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: আলিনগরে গিয়ে যে কী দেখব, সেটা আমি নিজেই জানি না। গত পরশু পর্যন্ত এই রহস্য সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা ছিল, গেল-কাল সকালে সেই রক্তহীন মৃতদেহ দেখবার পর থেকে সে-ধারণা একেবারে বদলে গেছে। মাঝে মাঝে এখন মনে হচ্ছে, হয়ত সুন্দরবাবুর সন্দেহ-ই সত্য, হয়ত এইসব মেয়ে-চুরির মধ্যে অলৌকিক কোন ব্যাপারই আছে।'

মানিক চকিত কণ্ঠে বললে, অলৌকিক বলতে তুমি কী বুঝেছ? ভৌতিক ব্যাপার?'

জয়ন্ত বললে, 'ভূত বলতে লোকে যা মানে, আমি তা মানি না। ভূতে বেছে বেছে খালি মেয়ে চুরি করবে কেন? তবে, ভূতে যে মানুষ চুরি করে এমন একটা বিলাতী গল্প আমি পড়েছিলুম। আলিনগর এখনো অনেক দূরে। সময় কাটাবার জন্যে তুমি যদি

সেই গল্পটা শুনতে চাও, আমি বলতে রাজী আছি। কিন্তু মনে রেখো, এটা গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।'

মানিক মোটরের একটা কোণ নিয়ে আরাম করে বসে বললে, 'বল।'

জয়ন্ত গাড়ির গতি একবার থামিয়ে, রুপোর শামুকের ভিতর থেকে একটিপ নস্য নিয়ে নাকে গুঁজে গল্প আরম্ভ করলে :

লণ্ডন শহরের পথ। শীতার্ত রাত্রি। একখানা বাস ছুটেছে—আজকের মতো এই তার শেষ যাত্রা। বাসের ভিতরে নিচের তলায় লোকজন বেশি নেই।

দোতলায় কেউ উঠেছে বলে কণ্ডাক্টরের মনে হল না। তবু একবার নিশ্চিত হবার জন্যে সে বাসের দোতলায় গিয়ে উঠল।

সামনের আসনে একজন আরোহী।

কণ্ডাক্টরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই যাত্রীটি তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন উপরে উঠে বসে পড়েছে?

যাত্রী মাথার টুপিটা মুখের উপরে টেনে নামিয়ে দিয়েছে এবং 'মাফ্‌লার' ও কোটের কলার দিয়ে মুখের নিচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে—শীতের হাড়-কাঁপানো হাওয়ার চোট সামলাবার জন্যে। স্থিরভাবে বসে যেন আড়ষ্ট হয়েই সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বোধহয় সে কণ্ডাক্টরের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কারণ সে দুই আঙুলে একটি আনি ধরে হাত বাড়িয়ে বসে আছে।

কণ্ডাক্টর বললে, 'ওঃ, ভারি ঠাণ্ডা রাত মশাই!'

যাত্রী জবাব দিলে না।

'কোথায় যাবেন?'

—'ক্যারিক স্ট্রীট।'

যাত্রীর উচ্চারণ অদ্ভুত। কণ্ডাক্টর আবার শুধোলে, 'কোথায় বললেন?'

—'ক্যারিক স্ট্রীট—ক্যারিক স্ট্রীট—'

—'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জানি—অতবার আর বলতে হবে না!' বলেই কণ্ডাক্টর যাত্রীর হাত থেকে আনিটা টেনে নিলে!

যাত্রী একটুও না ফিরে বললে, 'জানো? কী জানো তুমি?'

কিন্তু কণ্ডাক্টরের বুকের ভিতর পর্যন্ত তখন শিউরে-শিউরে উঠছে। আনিটা কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন সেটাকে জমাট বরফের ভিতর থেকে টেনে বার করা হয়েছে!

টিকিট কেটে কণ্ডাক্টর যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে দিতে গেল।

যাত্রী বললে, 'যেখানে আনি ছিল টিকিটখানা সেইখানে গুঁজে দাও।'

কেন তা সে জানে না, কিন্তু কণ্ডাক্টরের ইচ্ছা হল না যে যাত্রীর হাতে হাত দেয়। তার হাতখানা আড়ষ্ট, বোধহয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু। টিকিটখানা কোনরকমে গুঁজে দিয়ে কণ্ডাক্টর বললে, 'কেমন, পেয়েছেন জগন্নাথমশাই?'

তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে কৌতুক করা হচ্ছে ভেবেই বোধহয় যাত্রী বললে, 'তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।'

—'কে কথা কইতে চায়!' বলে কণ্ডাক্টর নেমে গেল।

বাস ক্যারিক স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। কণ্ডাক্টর চ্যাঁচাতে লাগল—'ক্যারিক স্ট্রীট! ক্যারিক স্ট্রীট!'

কিন্তু দোতলা থেকে আড়ষ্ট যাত্রী নামবার নাম করলে না।

কণ্ডাক্টর আপন মনে বললে, 'ও যদি সারারাত টঙে বসে থাকতে চায়, থাকুক। আমি আর ওপরে উঠছি না।'......এও হতে পারে, হয়ত কখন সে নেমে গিয়েছে, আমি দেখতে পাইনি।'

সেইদিন সন্ধ্যাতেই ক্যারিক স্ট্রীটের একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সি থেকে মোটঘাট নিয়ে যে ভদ্রলোকটি নামলেন তাঁর নাম মিঃ রামবোল্ড। কয়েক বছর আগে তিনি এই হোটেলেই ঘর ভাড়া

নিয়ে বাস করতেন। তারপর অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। এতকাল পরে আবার তাঁর পুরানো হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলের কর্তা তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে এলেন।—'এই যে মিঃ রামবোল্ড! জানি ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করে আবার আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।'

মিঃ রামবোল্ড হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি লক্ষ্মীলাভ করেছি। আমি মস্ত ধনীই বটে।'

হোটেলের কর্তা বললেন, 'কিন্তু তবুও আপনি যে আমাদের মতো গরিবদের ভোলেননি এইটেই যথেষ্ট!'

—'কী করে ভুলব? এ হোটেল যে আমার নিজের বাড়ির মতো প্রিয়! এখানকার পুরানো চাকর ক্লুটসাম কোথায়! এখানেই কাজ করে? বেশ বেশ, তাকেই আমি চাই।'

রাত্রে মিঃ রামবোল্ড নিজের ঘরে বসে কথা কইছিলেন। ক্লুটসাম জিজ্ঞাসা করছিল, 'আচ্ছা হুজুর, অস্ট্রেলিয়া দেশটা কেমন?'

—'ভালোই।'

—'সেখানকার আইন বোধহয় এখানকার মতো কড়া নয়?'

—'কি রকম?'

—'ধরুন,' আপনি যদি সেখানে কোন মানুষ খুন করেন, তাহলে পুলিশ আপনাকে ধরে ফাঁসি দেবে তো?'

মিঃ রামবোল্ড অত্যন্ত বেশি চমকে উঠলেন। শুকনো গলায় থতমত খেয়ে বললেন, 'আমিই বা মানুষ খুন করব কেন, আর আমাকেই বা ফাঁসি দেবে কেন?'

—'না হুজুর, আমি কথার-কথা বলছি! বাপ্‌রে, মানুষ খুন করার কত বিপদ! পুলিশ ফিরবে পাছে পাছে—'

রামবোল্ড বাধা দিয়ে জোরে জোরে বললেন, 'কেন, পুলিশ পাছে পাছে ফিরবে কেন? যদি আমি কারুকে খুন করি, তার লাস লুকিয়ে

ফেলি, কেউ সাক্ষী না থাকে, তাহলে পুলিশ জানতে পারবে কেমন করে?'

—'কিন্তু হুজুর, যাকে খুন করেছেন সে যদি ভূত হয়? প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনাকে খুঁজতে আসে?'

রামবোল্ডের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'থামো থামো!'

ক্লুটসাম আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ওকি হুজুর, আপনি অমন করছেন কেন? আমি কথার কথা বলছি।'

—'আমার গলা শুকিয়ে গেছে! শিগ্‌গির এক গেলাস জল আন!'

ক্লুটসাম তখনি জল এনে দিলে। রামবোল্ড জল পান করে অন্য কথা পেড়ে বললেন, 'আচ্ছা ক্লুটসাম, তোমাদের হোটেল এখন কেমন চলছে?'

—'খুব ভালো চলছে হুজুর। এই আজকের কথাই ধরুন না! আজ রাত্রে যদি কেউ এসে ডবল টাকাও দিতে চায়, তাহলে তাকে আমরা ঘর দিতে পারব না। হোটেলের কোন ঘরই খালি নেই।'

—'ক্লুটসাম, দেখছ আজকের রাত কী ঠাণ্ডা? বাইরে বরফ পড়ছে। আজ কোন বেচারী যদি এখানে এসে ঘর না পায়, তাহলে তার কষ্টের আর সীমা থাকবে না। আমার তো দুটো ঘর, দুটো বিছানা। আজ যদি সত্যিই কেউ আসে, তাকে তাড়িয়ে দিও না, অন্তত আজকের জন্যেও তাকে আমি আমার একটা বিছানা ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

—'আচ্ছা হুজুর।'

মাঝ-রাত্রি। দেউড়ির ঘণ্টাটা হঠাৎ খুব জোরে খুব তাড়াতাড়ি বেজে উঠল—একবার, দুবার, তিনবার।

হোটেলের দ্বারবান অবাক হয়ে ভাবলে, এই তুষার-ঝরা নিষুতি রাতে কে অতিথি বাইরে থেকে এল!

আবার সেইরকম খুব জোর আর তাড়াতাড়ি তিনবার ঘন্টাধ্বনি।

দ্বারবান বিরক্ত হয়ে গজ্‌-গজ্‌ করতে করতে দেউড়িতে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্তি। তার মাথার টুপিটা মুখের উপর টেনে নামানো, আর তার গলার কলারটা টেনে চিবুকের উপর তুলে দেওয়া। সর্বাঙ্গ ঢাকা মস্ত-বড় ঝলঝলে এক কালো মিশমিশে ওভার-কোট। ওভার-কোটের একদিকটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে—বোধহয় তার হাতে একটা চুপড়ি কিংবা একটা ব্যাগ আছে।

দ্বারবান বললে, 'সেলাম হুজুর! আপনার কী দরকার?'

আগন্তুক কোন জবাব না দিয়ে এক কোণে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বললে, 'আমি আজকের রাতের জন্যে হোটেলে একখানা ঘর চাই।

—'হুজুর, আজ যে হোটেলের সব ঘর ভর্তি হয়ে গেছে!'

—'তুমি ঠিক জানো?'

—'হ্যাঁ হুজুর!'

—'কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখ!'

—'ভালো করে ভাববার দরকার নেই হুজুর! আমি জানি।'

আগন্তুক এতক্ষণে মুখ তুলে দ্বারবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ দেখি।'

কেন তা সে জানে না, কিন্তু দ্বারবানের মনে হল, তার দেহের ভিতর থেকে যেন কি-একটা জিনিস—হয়ত তার জীবনই—ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়ান হুজুর! আমি জেনে এসে বলছি!'

সে হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে খবর নিয়ে ফিরে এসে আগন্তুককে আর দেখতে পেল না। কোথায় গেল সে? হোটেলের ভিতরে না বাইরে?

হঠাৎ তার চোখ পড়ল আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায়। সেখানে মেঝের উপরে লম্বা এক টুকরো বরফ পড়ে চকচক করছে।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। চারিদিক ঢাকা, তবু এখানে বরফ এল কেমন করে?

সেই কনকনে শীতের রাতেও দ্বারবানের কপালের উপর ঘামের ফোঁটা দেখা দিলে। রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজের মনেই সে বললে, 'যাকে এইমাত্র দেখলুম, কে সে? মানুষ?'

দোতলার হলঘরে দাঁড়িয়ে ক্লুটসাম দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে এক অচেনা ভদ্রলোক নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছেন।

এগিয়ে এসে বললে, 'কে আপনি? কাকে চান?'

—'তুমি মিঃ রামবোল্ডকে জিজ্ঞাসা করে এস, আজ রাত্রে তাঁর অন্য বিছানাটা আমি ব্যবহার করতে পারব কি না?'

ক্লুটসাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাল।

মিঃ রামবোল্ডের বাড়তি বিছানার কথা এই অচেনা লোকটি কেমন করে জানতে পারলে? কিন্তু সে কথা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে সে আগন্তুকের অনুরোধ রাখবার জন্যে ভিতর দিকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, 'মিঃ রামবোল্ড আপনার নাম জানতে চাইলেন।'

আগন্তুক পকেট থেকে বার করলে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ। সেই কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বললে, 'মিঃ রামবোল্ডকে এটা দিয়ে এস। আর তাকে জানিয়ো আমার নাম হচ্ছে, জেম্‌স্ হাগবার্ড।'

ক্লুটসাম সেই কাগজখানা পড়তে পড়তে আবার হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। তাতে লেখা রয়েছে—

'অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি শহরের মিঃ জেম্‌স্ হাগবার্ড কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন, এতদিন সে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বন্দুকের গুলিতে

তিনি মারা পড়েছেন। এখন প্রকাশ পেয়েছে, মিঃ রামবোল্ড নামে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি ঐ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেই দিন থেকে মিঃ রামবোল্ডেরও আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

একটু পরে ক্লুটসাম আবার ফিরে এল। তারপর তফাতে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'মিঃ রামবোল্ড বললেন—আপনি নরক থেকে এসেছেন, আবার নরকেই বিদায় হোন!'—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই রামবোল্ডের ঘর থেকে ভেসে এল ঘন-ঘন বিষম আর্তনাদ ও ভীষণ গর্জন-ধ্বনি।

ক্লুটসাম ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কোন জনপ্রাণী নেই।

ঘরের বিছানা, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি উল্টেপাল্টে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এবং রক্তের দাগে চারিদিক হয়ে উঠেছে ভয়ানক। এবং ঘরের মাঝখানেই মেঝের উপর পড়ে চকচক করছে ইঞ্চি কয়েক লম্বা এক টুকরো বরফ।

রামবোল্ডের সঙ্গে ক্লুটসামের আর কখনো দেখা হয়নি।

কিন্তু সেই রাত্রে হোটেলের সামনের রাস্তায় যে কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল, সে একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখেছিল।

কালো ওভার-কোট পরা একটা আড়ষ্ট মূর্তি তুষারবৃষ্টির মধ্য দিয়ে হন্‌হন্ করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাঁধে রয়েছে মস্ত মোটের মতন কি একটা জিনিস।

কনস্টেবল তাকে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু খানিক দূরে গিয়ে আর তাকে দেখতে পায়নি।

•

মানিক বললে, 'তাহলে ঘটনাটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, মিঃ জেম্‌স্ হাগবার্ডকে খুন করে মিঃ রামবোল্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর মিঃ হাগবার্ডের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা নেবার

জন্যে বিলাতে এসে মিঃ রামবোল্ডকে হত্যা করে তার দেহ নিয়ে নরকে ফিরে গেল। তুমি কি বলতে চাও, এখানেও মেয়ে-চুরি করেছে ভূতেরা?'

জয়ন্ত গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প বলছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, 'পাগল! আমি বললুম গাল-গল্প,—কেবল খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে। তার সঙ্গে এখানকার মেয়ে-চুরির কোনই সম্পর্ক নেই।......এখন এ-সব কথা থাক। ঐ দেখ, সামনেই আলিনগরের ভাঙা বাড়িগুলোর এলোমেলো চূড়ো দেখা যাচ্ছে। এদিকে পথেই পড়েছে নদী। গাড়ি নিয়ে আর এগুবার উপায় নেই, এগুবার দরকারও নেই। গাড়িখানাকে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এইবারে আমাদের পদব্রজে এগুতে হবে।'

মোটর থামিয়ে দু-জনে নামল। তারপর গাড়িখানাকে লুকিয়ে এবং চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো।

কিন্তু পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে বালির উপরে পাওয়া গেল আবার সেই ছয়জোড়া পায়ের দাগ।

জয়ন্ত হাঁটু গেড়ে বসে খানিকক্ষণ ধরে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করলে। তারপর মুখ তুলে বললে, 'মানিক, এবারের পায়ের দাগে

বিশেষত্ব আছে। দাগগুলো বড় বেশি গভীর হয়ে বালির ভিতর বসে গেছে। যেন এরা সকলে মিলে কোন একটা ভারি মোট বহন করে নিয়ে গিয়েছে।'

মানিক চম্‌কে উঠে বললে, 'ভারি মোট! কী হতে পারে সেটা?'

—'হয়ত কোন মানুষের—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দেহ! নয় তো অন্য কিছু। সেটা যাই-ই হোক, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের খুব জোর বলতে হবে! এসেই এই দাগগুলো চোখে পড়ে গেল। এ-সূত্র আর ছাড়ছি না, কারণ এই সূত্র ধরেই এবার নিশ্চয়ই সেই ছয় মূর্তিকে আবিষ্কার করব—তারা আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

## নবম পরিচ্ছেদ

### মৃত্যুপুরে

আলিনগরে কোন বিভীষিকাই তখন সেখানে জেগে নেই। সূর্য-করের সোনার ঢেউ আকাশের নীলিমাকে অম্লান করে তুলেছে। পাখিদের গানের তানের ঢেউ বনের শ্যামলিমাকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে, নদীর জলের রুপোলি ঢেউ দুই তটের মাটি, বালি আর পাথরকেও সঙ্গীতময় করে তুলেছে। চারিদিকে আলো আর গান, শান্তি আর কান্তি।

তারই মধ্যে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন বহন করে আনছে কেবল এই ছয়-জোড়া পদচিহ্ন। এই ছয়-জোড়া পায়ের অধিকারী, কে তারা? কেন তারা সর্বদাই একসঙ্গে থাকে, কেন তাদের দলের লোক বাড়েও না কমেও না, কেন তারা একতালে পা ফেলে চলে—আর কেন তারা মেয়ের পর মেয়ে চুরি করে? আর, তাদের সঙ্গে নবাবের কোন সম্পর্ক আছে, কিংবা নেই? আর, আলিনগরে এসে তারা সবাই মিলে কী করে?

জয়ন্ত ও মানিক এই সব কথাই ভাবছিল।

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু এই ছয়টা মূর্তি যে প্রেতমূর্তি নয়, এদের দেহ যে ছায়াময় নয়, এরা যে আমাদের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া, পা দিয়ে মাটি মাড়িয়ে চলে, এখানকার দাগগুলো সে-সত্যও প্রকাশ করেছে। সেদিনের পায়ের দাগগুলোর ভিতর যা লক্ষ্য করেছিলুম আজও তাই লক্ষ্য করছি; এদের মধ্যে একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, একটা পায়ের গোড়ালি মাটির উপর ফেলতে পারে না। এটাও মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ—খোঁড়া ভূতের কথা কখনো শুনেছ?'

দু-জনে নদীগর্ভের দিকে নামতে লাগল।

মানিক বললে, 'দাগগুলো দেখছি নদীর জলের ভিতরে নেমে গেছে। তার মানে, সেই ছয়টা মূর্তি এইখানেই নদী পার হয়েছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, তাই আমাদেরও এইখানে নেমেই পার হতে হবে। গেল-দুর্যোগে নদীর জল বেড়ে উঠেছে বটে কিন্তু বোধহয় আমাদের কোমরের বেশি উঠবে না। এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর রীতিই এই—এরা যেমন হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, তেমনি হঠাৎ ছোট হয়ে পড়ে; এরা যেন প্রকৃতির আবুহোসেন—আজ বড়, কাল ছোট।......এই আমি দুর্গা বলে নেমে পড়লুম,—যা ভেবেছি তাই। জল খুব কম। এসো মানিক, কিন্তু দেখো, বন্দুক রিভলভার আর রসদ যেন জলে ভেজে না।'

নদীর ওপারে উঠে একটুও খুঁজতে হলো না, আবার পাওয়া গেল সেই ছয়-জোড়া পায়ের দাগ। নদীর বালির বিছানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেও মাটির উপর দিয়ে চলে গিয়েছে পদচিহ্নের সারি।

মানিক খুশি-গলায় বললে, 'জয়, সেদিনকার বিষম বৃষ্টি আমাদের ভারি কষ্ট দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ আমরা তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি! সেই বৃষ্টিতে ভিজে মাটি খুব নরম ছিল বলেই পায়ের এমন স্পষ্ট আর স্থায়ী ছাঁচ তুলতে পেরেছে।'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে, এই ছাঁচগুলো টাটকা, এদের সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির পরেই। প্রথম শ্রেণীর পথপ্রদর্শকের মতো এখন এই পায়ের দাগগুলোও আমাদের নিয়ে যাবে যাদের খুঁজতে এসেছি তাদের ঠিকানায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ দি' বৃষ্টিকে!'

পায়ে-হাঁটা মেটে পথ। কোথাও ঝুপসি গাছের তলা দিয়ে, কোথাও কাঁটা-ঝোপ ও জঙ্গলের তলা দিয়ে, কোথাও ভাঙাচোরা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ বা টিপিঢাপার পাশ দিয়ে অজগরের মতো এঁকেবেঁকে, উঠে, নেমে, মোড় ফিরে ফিরে অগ্রসর হয়েছে। পথের উপরে পায়ের দাগগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার স্পষ্ট হয়ে গিয়ে তারা জয়ন্ত ও মানিককে ভয় দেখাচ্ছে,

কিন্তু জমির অন্য প্রান্ত থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করছে। পায়ের দাগ তাদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা খেলছে।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, পৃথিবীর সব দেশেরই গোয়েন্দাগিরির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবে, পায়ের দাগ, রক্তের দাগ, আর আঙুলের ছাপ দেখেই গোয়েন্দারা বেশির ভাগ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী ধরবার প্রথা একশো বছর আগেও আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু পায়ের দাগ আর রক্তের দাগ মানুষের কাজে লেগে আসছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই—মানুষ যখন সভ্যও হয়নি। এই দু-রকম দাগের কোন-না-কোনটি দেখে আদিম মানুষ বনে-জঙ্গলে শিকারের খোঁজ পেয়ে জীবন ধারণ করেছে—এখনকার শখের শিকারীদেরও কাছে- ঐ দু-রকম দাগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্বল। আর পাপীদেরও জব্দ করেছে চিরকাল ঐ দু-রকম দাগই। সব পাপীই এই দু-রকম দাগকে ভয় করে, কিন্তু তবু এদের কবল থেকে নিস্তার পায় না—যেমন আজও পাবে না আমাদের হাত থেকে মুক্তি এই ছয়জন মেয়ে-চোর!'

মানিক বললে, 'এরা খালি মেয়ে-চোর নয়, হত্যাকারীও বটে।'

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, 'হুঁ। শেষ যে মেয়ে চুরি গেছে, এরা তার মাকে খুন করেছে। কিন্তু মানিক, এখনো এ-রহস্যটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে মৃতদেহের গলায় অত বড় ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু তার দেহের রক্ত গেল কোথায়? এক হতে পারে হত্যাকারী দাঁত দিয়ে তার গলায় ছ্যাঁদা করে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে—আর যেটুকু রক্ত মাটিতে পড়েছিল তাও জিভ দিয়ে চেটে-পুটে তুলে নিয়েছে; কিন্তু মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব? এই ছয়জন খুনে মেয়ে-চোর যে মানুষ, সে-বিষয়ে তো সন্দেহ করবার উপাই নেই!'

হঠাৎ মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখ জয়, দেখ!'

মানিকের দৃষ্টির অনুসরণ করে জয়ন্ত দেখলে, যে-দুখানা মোটরে চড়ে তারা সেদিন আলিনগরে এসেছিল, তাদেরই ভগ্নাবশেষ। একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ির স্তূপের উপরে দু-জায়গায় গাড়ি দু-খানা চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

জয়ন্ত কৌতূহলী চোখে দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ভিতর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে বললে, 'মানিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?'

—'কী?'

—'গাড়ির ভিতরে আমাদের খাবার ছিল। হয়ত ফল বা পাঁউরুটি প্রভৃতি চারিদিকে ঠিকরে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে বনের পশুপক্ষীরা সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু গাড়ির ভিতরে ছিল বন্ধ একটিন বিস্কুট আর তিন টিন "জ্যাম" আর চায়ের "ফ্লাস্ক"। সেগুলোর একটা ভাঙা টুকরোও এখানে নজরে পড়ছে না। খাবারের চাঙাড়িরও টুকরো এখানে নেই—তাও কি জন্তুরা খেয়ে ফেলেছে?'

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তাই তো দেখছি! সত্যি, অতি বড় পেটুক জন্তুও তো টিন বা ধাতু বা ভাঙা চাঙাড়ি হজম করতে রাজী হবে না। সেগুলো গেল কোথায় তবে?'

—'কোথায় আর? ঐ নবাব, কি ছয়-মূর্তির বাসায়! গাড়ি দু-খানাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দেবার আগে খাবারগুলোকে বাজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে আর কি! মানিক, যারা "স্যাণ্ডউইচ" আর কলা খায়, "জ্যাম" আর বিস্কুটের টিন খোলে, নিশ্চয়ই তারা ভূত নয়! এইসব মেয়ে-চুরি আর খুনের মূলে আছে তোমার আমার মতো মানুষ-ই।'

মানিক বললে, 'এ প্রমাণটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! চল তবে আবার সেই খুনে মেয়ে-চোর আর খাবার-চোর মানুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা যাক।'

তারা জনশূন্য আলিনগরের এক প্রান্ত দিয়ে চলেছে। ছোট বড় মাঝারি, বিবর্ণ, সংস্কার-অভাবে জীর্ণ কঙ্কালসার বা একেবারে ভাঙা বাড়ির পর বাড়ি যেন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভারে স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু একদিন তারা অনেক আলোক-মালা দেখেছে, অনেক উৎসব-কোলাহল শুনেছে। তাদের ছায়ায় ছায়ায় কত হাসি আর অশ্রুর বিচিত্র অভিনয়ের যবনিকা বারংবার উঠেছে ও পড়েছে, সে হিসাব যেন তারা আজও ভুলে যায়নি। যেখানে আগে শত শত সঙ্গীতের ও শত শত নূপুরের ধ্বনি জেগে উঠত ক্ষণে ক্ষণে, সেখানে আজ স্তব্ধতার মৃত্যু নিদ্রা ভঙ্গ করেছে কেবল দেয়ালে দেয়ালে গজিয়ে-ওঠা অশথ-বটের শাখায় শাখায় বন্য বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের কান্না। যাদের চাতালে চাতালে আগে জীবন্ত ফুলের মতো শিশুরা করতো সুমধুর লীলাখেলা, সেখানে আজ পাথরে পাথরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেবল সাপ, বিছা ও গিরগিটির দল।

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, 'জয়, আমার পার্সি কবি ওমর খৈয়ামের কবিতা মনে পড়ছে :—

'রাজার বাড়ির থামের সারি আকাশ-ছোঁয়া তুলতো মাথা,
রতন মুকুট পরে হেথায় সোনার তোরণ ধরতো ছাতা।
আজ সেখানে আঁধুল মায়ায় বিজন ছায়া দুলিয়ে দিয়ে,
ঘু-ঘু-ঘু-ঘু-র আকুল স্বরে গাইছে কপোত অশ্রুগাথা।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন মনে হচ্ছে, এই ছয়জন দুরাত্মা বাস করবার ঠিক জায়গাই বেছে নিয়েছে! যারা সমাজের আর মানুষের শত্রু, জ্যান্ত শহরের জনতা তাদের ভালোও লাগবে না, সহ্যও হবে না। তাই এসে আস্তানা গেড়েছে তারা এই মরা শহরে। ভাই মানিক, ঘর-বাড়ির আত্মা থাকে না জানি, কিন্তু এখানকার বাড়ি-ঘরগুলোকে দেখলে প্রেতাত্মার ছবি দেখছি বলেই কি সন্দেহ হয় না?'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, এরা প্রেতাত্মার মতোই ভয়ের ভারে প্রাণ-মন অভিভূত করে দেয়!'

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'এই আমরা সেই গোরস্থানের আর-একদিকে এসে পড়লুম। এরই মধ্যে সেই ভয়ানক রাতে ছয়টা আলোকে চলাফেরা করতে দেখেছিলুম!'

মানিক বললে, 'পায়ের দাগের রেখা যে এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে!'

—'তাহলে আমরাও এর মধ্যে ঢুকব। মানিক, বন্দুক প্রস্তুত রাখো, হয়ত এইটেই সেই শয়তানদের আড্ডা। হয়ত এইবারে তারা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলে যে জামাই-আদর করবে না, সে-বিষয়ে একতিল সন্দেহ নেই।'

তারা দু-জনেই সেখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকে টোটা ভরে নিলে, নিজের নিজের রিভলভার পরীক্ষা করলে।

মানিক বললে, 'কিন্তু অমিয়বাবু আর তাঁর বন্ধুদের মতে, বন্দুকের গুলি বেমালুম হজম করে তারা আক্রমণ করতে পারে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। 'গোলা-খা-ডালা'-র যুগ আর নেই। অমিয়বাবুদের গুলি খেয়েছিল বনের গাছ আর পাহাড়।'

তারা চারিদিকে সাবধানে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভিতরে প্রবেশ করলে। আলিনগরের কোথাও জীবনের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু, এইবারে দেখা দিলে খালি মৃত্যুর চিহ্ন। এখানকার প্রত্যেক উঁচু ঢিপিটাও এক-একটি বিয়োগান্ত জীবন-নাট্যের শেষ নিদর্শন—মানুষের অশান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ পরিণাম? চঞ্চল আলোছায়ার জীবন্ত লীলা বুকের উপরে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে কবরের পর কবরের সার। তাদের তলায় চির-নিদ্রার স্বপ্নহীনতার মধ্যে শুয়ে আছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত কত মানুষের কঙ্কালের পর কঙ্কাল এবং তাদের উপর দলে দলে ফুটে আছে কত আগাছার কত রঙের ফুলের পর ফুল। মানুষের স্মৃতি যাদের ভুলেছে, প্রকৃতির প্রেম তাদের মনে রেখেছে।

তু-ধারের কবরের মাঝখান দিয়ে চলে পদচিহ্নরেখা গোরস্থানের আর-এক প্রান্তে যেখানে গিয়ে শেষ হলো, সেখানেই মস্ত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, এই অট্টালিকাও বহুকালের পুরানো বটে, কিন্তু আলিনগরের অন্যান্য বাড়ির মতো এখানা ততটা জীর্ণ ও ভাঙাচোরা নয়। এর অনেকগুলো দরজার কবাট ও জানলার পাল্লা এখনো অটুট আছে এবং এক সময়ে এখানা যে খুব বড় ধনীর বা রাজা-উজিরের প্রাসাদ ছিল, তাও অনুমান করা যায়।

অট্টালিকার প্রবেশ-পথটিও প্রকাণ্ড। হয়ত আগে এখানে জমকালো সাজ-পরা সেপাই-সান্ত্রীরা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহারা দিত, হয়ত আজ তাদেরও কঙ্কাল নিঃসাড় হয়ে আছে ঐ গোরস্থানেরই কোন বুজে-যাওয়া গর্তে। কিন্তু আজ এই দেউড়ি হয়েছে শেয়াল কুকুরের আনাগোনার রাস্তা।

কিন্তু দেউড়ির সামনেই কী ওটা পড়ে পড়ে পৈতার মতো সরু সরু ধোঁয়া ছাড়ছে?

ধোঁয়া। জনহীনতার রাজ্যে ধোঁয়া? ধোঁয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে অগ্নি। এবং অধিকাংশ অগ্নির সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে মানুষ। মানিক আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি একটা জিনিস তুলে জয়ন্তের চোখের সামনে ধরলে।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, একটা আধ-পোড়া 'কাঁচি' সিগারেট, তখনো তার আগুন নেবেনি।

তুজনেই বুঝলে, শত্রু একটু আগেই এখান দিয়ে চলে গিয়েছে এবং খুব কাছেই কোথাও আছে—হয়ত আড়ালে গা ঢেকে তাদেরই গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

তুই বন্ধুর সন্দিগ্ধ ও সতর্ক চক্ষু চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল—কিন্তু কোথাও কারুর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, 'এখন কী করবে?'

জয়ন্ত তেমনি স্বরে বললে, 'বাড়ির ভিতরে ঢুকব।'

—'শত্রু আছে জেনেও?'

—'আমরা তো এখানে বন্ধুদের সঙ্গে খোশ-গল্প করতে আসিনি! যত শীঘ্র শত্রুর দেখা পাওয়া যায় ততই ভালো।'

—'তা বটে।'

বন্দুক দুটো তারা পিঠের উপরে বাঁধলে। তারপর 'বেল্ট' থেকে রিভলভার খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে-টিপে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

একটা বুক-চাপা ভয়ানক নীরবতায় সেই বিশাল অট্টালিকার ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। খানিক দূর এগিয়ে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড এক উঠান—তার ভিতরে বোধহয় দুই হাজার লেকের স্থান-সঙ্কুলান হয়। উঠানের চারিদিকে সারি সারি থাম ও দালান এবং দালানের পরেই চক-মিলানো ঘর। উঠানের সর্বত্রই বড় বড় ঘাস ও আগাছার ঝোপ। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণ নেই—কেবল গাম্ভীর্য গম্-গম্ করছে,—সে যেন মৃত্যুপুরীর গাম্ভীর্য! দেউড়িতে এইমাত্র সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা না দেখলে জয়ন্ত ও মানিক কিছুতেই সন্দেহ করতে পারত না যে, এই নিদ্রিত অট্টালিকার ত্রিসীমানায় বহু বৎসরের মধ্যে কোন জ্যান্তো মানুষের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার নির্জনতা যেন ভৌতিক,—বুকের রক্ত জমে যায়, গা ছম্-ছম্ করে, পা এলিয়ে পড়ে। অসহনীয়!

মানিক ফিস-ফিস করে বললে, 'এই বিশালতার মধ্যে আমরাই হারিয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে! এর মধ্যে কোন্ দিকে কাকে আমরা খুঁজব?'—তার সেই অতি মৃদু গলার আওয়াজও সেই নিঃসাড় পুরীর মাঝখানে উচ্চকণ্ঠের গর্জনের মতো শোনালো।

জয়ন্ত আরো খাটো গলায় মানিকের কানে কানে বললে, 'কিন্তু খুঁজতে হবেই। এস, আগে একতলার সব ঘরেই একবার

করে উঁকি মেরে আসি,—তারপর দোতলা, তারপর তেতলা।

তারা একে-একে প্রত্যেক ঘরে খুব সন্তর্পণে ঢুকে পরিদর্শন আরম্ভ করলে। ঘরে ঘরে বাস করছে যুগ-যুগান্তের ধূলা ও সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। একটা ঘরের কোণ থেকে সাপ ফোঁস করে উঠল। প্রত্যেক ঘরের দরজাই খোলা।

মানিক বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির একতলা ঘরে মানুষ থাকতে পারে না, মানুষের মন এখানে কুঁকড়ে পড়ে!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু আমরা খুঁজছি সেই সব অমানুষিক মানুষকে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যাদের ভূতের চেয়ে কম ভয় করে না। ভালোমানুষের প্রাণ যারা মাটির খেলনার মতো ভেঙে ফেলতে পারে, এমন জায়গায় এলে তারা হয়ে উঠে খুব বেশি খুশি।'

ডানদিকের দীর্ঘ দালানের শেষ ঘরটায় দরজার বাইরে থেকে শিকল তোলা ছিল। শিকল নামিয়ে মানিক প্রথমেই ঘরের ভিতরে ঢুকল, এবং তার পরমুহূর্তেই চমকে বাইরে বেরিয়ে এল, তার মুখ একেবারে সাদা।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে মাথাটা একবার গলিয়ে দিলে।

ধূলিধূসরিত মেঝের উপরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়টা মানুষের মূর্তি।

## দশম পরিচ্ছেদ

### জীবনহারা জীবন্তের দল



যে ছয়টা বিভীষণ মূর্তির জন্যে চতুর্দিকে এমন হুলুস্থুলু বেধে গিয়েছে, এই আধা-আলোয় ও আধা-অন্ধকারে তারাই শুয়ে আছে পাশাপাশি।

কিন্তু ওরা জেগে, কি ঘুমিয়ে? ওরা তাদের সাড়া পেয়েছে, কি পায়নি? আর অমন আছুড় মাটিতে, ধুলো-জঞ্জালেই বা ওরা শুয়ে আছে কেন? ওরা মটকা মেরে পড়ে নেই তো?

অসম্ভব নয়! এই ছয়টা মূর্তির প্রকৃতি যে হিংস্র, প্রথম দিনেই আলিনগরে এসে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ছয় চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই যে কত বেশি চালাক, প্রান্তর-সমুদ্রে তারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এদের কাছে জয়ন্তদের দুই-দুইবার পরাজিত হতে—এমনকি প্রায় গালে চুন-কালি মাখতে হয়েছে। তারাই এত সহজে এত অসহায়ভাবে ধরা দিতে রাজী হবে? এদের এই চুপ করে শুয়ে থাকা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

জয়ন্ত ও মানিক বাইরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবতে লাগল।···এক দুই করে ছয় সাত মিনিট কেটে গেল। এই অসম্ভব নিস্তব্ধতার মুল্লুকে মূর্তিদের কেউ পাশ ফিরলেও তারা সেটা টের পেত, কিন্তু ঘরের ভিতরে কোন সাড়া নেই—একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না। যদি তাদের জন্য কোনরকম ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে, তবে এ কি-রকম ফাঁদ? ওরা ছয়জন, তারা দুইজন মাত্র; তবু ওরা আক্রমণ করবার জন্যে একটু উস্‌খুস্ পর্যন্ত করছে না কেন?

জয়ন্ত রিভলভারটা ধরে দরজার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে আবার চট্ করে দেখে নিলে।

তারা ঠিক তেমনিভাবেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। তবে কি

সত্যিই তারা ঘুমুচ্ছে? কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কই? দুষ্টুমি করে তারা কি দম বন্ধ করে আছে? কিন্তু দম বন্ধ করে মানুষ আর কতক্ষণ থাকতে পারে?

আরো মিনিট পাঁচেক পরেও তারা তেমনিভাবেই রইল দেখে জয়ন্ত নিজের মুখখানা ভিতরে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। তখনো মূর্তিগুলোর সেই ভাব। শেষটা যা থাকে কপালে ভেবে সে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকল এবং মানিকও সাহস সঞ্চয় করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—

এবং প্রথমেই যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হচ্ছে এই :

একটা মূর্তি ড্যাব্-ড্যাব্ করে তাদের পানে নিষ্পলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

জয়ন্তের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল! মানিক রিভলভারের ঘোড়া টিপে দেয় আর কি,—কিন্তু জয়ন্ত তার হাত চেপে ধরে মৃদু স্বরে বললে, 'অন্য মূর্তিগুলোর চোখ দেখ!'

কোন মূর্তির চোখ আধ-খোলা, কোন মূর্তির চোখ একেবারে মোদা।...যে মূর্তিটা পুরো চেয়ে আছে, তারও চোখে কোন ভাব নেই।

—'জয়! জয়!'

—'মানিক, এগুলো মড়া!'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে একে-একে মূর্তিগুলোর বুকে হাত দিয়ে দেখলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন লক্ষণ নেই। গা কাঁচের মতো ঠাণ্ডা।

—'কিন্তু মানিক, কী করে এরা মরল? কে এদের মারলে?'

—'জয়, ডানদিকের ঐ মূর্তিটার কপালের উপরে তাকিয়ে দেখ!'

জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'হুঁ, বুলেটের দাগ। এখনো শুকোয়নি, দাগটাও নতুন নয়।'

—'তবে কি অমিয়বাবুদের বুলেটের এই কীর্তি?'

—'হতে পারে। কিন্তু কপালে অমনভাবে গুলি খেয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?...আরে আরে, এই যে! এ মূর্তিটারও

পেটে একটা ছ্যাঁদা—এখানেও বুলেট ঢুকেছে! আর, এটারও পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি। হুঁ, এই মূর্তিটাই তাহলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত,—পায়ের দাগ দেখেই আমি যা ধরতে পেরেছিলুম। কিন্তু বাছারা, কে তোমরা? বন্দুকের বুলেট খেয়েও তোমরা মরো না—বড়-জোর খুঁড়িয়ে হাঁটো, কিন্তু আজ তোমরা পটল তুলেছ কেন?'

—'দেখ জয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐ-সব বুলেটই ঐ তিনটে লোকের মৃত্যুর কারণ, তাহলে বাকী তিনটে লোক মরল কেন? ওদের গায়ে তো দেখছি একটা আঁচড় পর্যন্তও নেই। কিসে ওরা মরেছে? বিষে? কেউ বিষ দিয়েছে, না ওরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে?'

—'মানিক, এদের কারুর দেহেই বিষের কোন লক্ষণ নেই। এদের কেউ কোন উপায়ে হত্যা করেছে বলেও মনে হচ্ছে না। এরা এসে যেন পাশাপাশি শুয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্ত আর শান্তভাবে মৃত্যু-ঘুমে ঢলে পড়েছে। অথচ এরা যে পরশু রাত পর্যন্ত বেঁচে ছিল সে প্রমাণও রয়েছে—অবশ্য যদি মানা যায় যে পরশু রাতে এরাই মেয়ে-চুরি আর খুন করেছিল। এমন বিচিত্র ব্যাপার আমি কখনো কল্পনা করিনি—এমন আশ্চর্য মৃত্যুও কখনো দেখিনি! মানিক, স্বীকার করতে লজ্জা নেই—মনের মাঝে আমি ভয়ের সাড়া পাচ্ছি। ভবতোষ মজুমদারের বজরায় আমরা জ্যান্তো মড়া দেখেছিলুম,* কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার, তার মধ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু এ কী কাণ্ড! বুলেট খেয়ে এরা মরে না, অথচ আজ অকারণেই এখানে এসে মরে পড়ে রয়েছে। মানুষের রক্ত-মাংস বুলেটকে অগ্রাহ্য করে, এটাই বা কী অস্বাভাবিক কথা!'

মানিক মূর্তিগুলোর উপরে আর একবার শিউরে-ওঠা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'জয়, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, এ মড়াগুলো কি অনেক দিনের পুরানো পচা মড়া বলে মনে হয় না? এই ঘরের

---

* 'জয়ন্তের কীর্তি' দ্রষ্টব্য

ভিতরে কি একটা কবরের ভাব আড়ষ্ট হয়ে নেই? এখানকার বাতাসেও যেন পচা মড়ার দুর্গন্ধ। আমার দেহ কেমন-কেমন করছে, আমার বমন করবার ইচ্ছে হচ্ছে—চল জয়, এই কবরের বিভীষিকার ভিতর থেকে পালিয়ে যাই!'

আচম্বিতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল।

জয়ন্ত ও মানিক চমকে ফিরে দাঁড়াল এবং ঘরের ভিতরে এক পা বাড়িয়ে আবির্ভূত হলো নবাবের সুদীর্ঘ মূর্তি—কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'মানিক—মানিক!—এস আমার সঙ্গে'—বলতে বলতে জয়ন্ত ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো।

তারা বাইরে বেরিয়ে দেখলে, নবাব তখন দালানের উপর দিয়ে ছুটছে।

—'মানিক, ওকে কিছুতেই আর পালাতে দেওয়া হবে না, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তবু ওকে ধরতেই হবে!'

নবাব হঠাৎ বাম দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হলো। জয়ন্ত সেখানে গিয়েই পেলে প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি—দুম্-দাম্ পায়ের শব্দে বুঝলে নবাব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। তারাও এক-এক লাফ মেরে দুই-তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে দোতলার দালানে। নবাব আবার এক জায়গায় গিয়ে অদৃশ্য হলো—সঙ্গে সঙ্গে দুম-দুম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

সেইখানে গিয়ে পড়ে মানিক বললে, 'এখন উপায় ?'

—'উপায় ? মিছেই কি আমি ব্যায়াম করি—ছয়-সাত মণ ওজনের মাল তুলে ছুঁড়ে ফেলে দি ?'

মানিক দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করলে—দরজা একটু কাঁপলও না। হতাশভাবে বললে, 'এ দরজা ভাঙতে গেলে হাতি আনতে হবে।'

—'কিছুই আনতে হবে না, আমার মাংসপেশীর জয় হোক'—বলেই জয়ন্ত দরজার উপরে পিঠ রেখে দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে এক-বার, দু-বার, তিন-বার। দড়াম করে খুলে গেল দরজা—সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে পড়ে গেল।

মানিক একলাফে জয়ন্তের দেহ টপকে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলে, নবাব একটা গরাদে-ভাঙা জানলা দিয়ে গলে বাইরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

মাটির উপরে লম্বমান অবস্থাতেই জয়ন্ত মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে, 'দেহের নিচের দিকে গুলি কর মানিক। লাফ মারলে আর ওকে পাব না!'

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই মানিকের রিভলভার গর্জন করে উঠল। বিকট আর্তনাদ করে নবাব জানলা ছেড়ে ঘরের ভিতরে বসে পড়ল।

জয়ন্ত ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ও মানিক এগিয়ে গিয়ে নবাবের দুই পাশে স্থান গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, এর মাথা টিপ করে রিভলভার ধরে থাকো। আমি এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দি'। এ একটু বাধা দিলেই রিভলভার ছুঁড়বে।'—জয়ন্ত হাতকড়া বার করলে, নবাব ভালো-মানুষের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

মানিকের রিভলভারের গুলি লেগেছিলো নবাবের উরুর পাশে। সেখান থেকে দরদর ধারে রক্ত ঝরছে।

তার ক্ষতটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, 'না, ভয় নেই। এ মরবে না।......তারপর নবাব, এইবারে তোমার নবাবির খবর বলো!'

তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে—ঘরের ভিতরে একটু একটু করে আসন্ন রাত্রির আভাস জেগে উঠছে। বাহির থেকে গাছের পাতারা তাদের মর্মর-বার্তা প্রেরণ করছে, তা ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

—'কী হলো নবাব, তুমি চুপ করে রইলে কেন?'

নবাবের সেই সাপের মতো নির্দয় চক্ষে এতক্ষণ পরে আবার আগুন ফিরে এলো। সে একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের রৌদ্রহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর জয়ন্ত ও মানিকের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সহজ ও শান্ত স্বরেই বললে, তোমরা কী জানতে চাও?'

—'তুমি মেয়েদের চুরি করে লুকিয়ে রেখেছো?'

—'জানি না।'

—'জানো না?'

—'না।'

—'এখানে তুমি কী করো?'

—'জানি না।'

—'তোমার ঐ ছয় স্যাঙাৎ মরলো কেন?'

—'জানি না।'

—'অর্থাৎ তুমি কিছুই বলবে না?'

—'না'

—'আমি এখনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তোমার চিবুকের তলায় ধরবো—ধীরে ধীরে তোমার দেহের মাংস পোড়াবো।'

—'পোড়াও, তবু কিছু বলবো না।'

—'আচ্ছা, আগে তো তোমায় নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটক করি, তারপর তোমার মুখ খোলবার ভালো ব্যবস্থাই করবো।'

—'একবার তো সে চেষ্টা করেছিলে। পেরেছিলে কি?'

—'ও, ভাবছো আবার তুমি পালাবে? বেশ, দেখা যাবে। এখন তো আমার সঙ্গে চলো!'

—'আমি এখান থেকে যাবো না।'

—'যাবে না? তোমার ঘাড় যাবে! আমরা তোমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবো!'

নবাবের দুই চক্ষু দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। জয়ন্তের দিকে চেয়ে অগ্নিবৃষ্টি করে সে বললে, 'তুমি আমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবে? লাথি মারতে মারতে? পারবে না!'

—'দেখবে, পারি কি না?'

নবাব আর জবাব দিলে না। হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসেছিল। সেই অবস্থায় তার দেহ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠলো, তার অগ্নিবর্ষী চক্ষু দু'টো মুদিত হয়ে গেলো,—তাকে দেখলেই মনে হয়, ধ্যানমগ্ন নিষ্কম্প এক প্রতিমূর্তি!

মানিক হেসে ফেলে বললে, 'এ আবার কী নতুন ঢঙ!'

জয়ন্ত বললে, 'জানোই তো প্রবাদ আছে—"দুরাত্মার ছলের অভাব নেই!" নবাব বাহাদুরের কালো আলখাল্লার তলায় কতো কলাকৌশল লুকানো আছে, কে তা জানে? বিড়াল আহ্নিকে বসেছেন, বোধহয় আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে!'

কিন্তু সে-সব কথা যে তার কানে ঢুকলো, নবাব তেমন কোনই ভাব প্রকাশ করলে না। তার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তখন যেন লুপ্ত

হয়ে গেছে—কেবল থেকে থেকে তার কপালের উপরের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। ওদিকে তার আহত উরু দিয়ে রক্ত ঝরে যে কাপড় ও ঘরের ধুলো ভিজিয়ে আরক্ত করে তুলছে, নবাবের সে খেয়াল

পর্যন্ত নেই। যন্ত্রণাও তার হচ্ছিলো নিশ্চয়, কিন্তু তার মুখে যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই ফুটে ওঠেনি!

মানিক জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো। জানলার ঠিক তলাতেই রয়েছে বালির স্তূপ। সেইদিকে জয়ন্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললে, 'জয়, নবাবটা কি রকম ধড়িবাজ দেখ! এখান থেকে বা তিনতলা থেকেও ঐ বালির

স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবার কোনো ভয়ই নেই। বিপদের সময়ে পালাবার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তবু সে পালাতে পারলে না, তোমার দেহের অদ্ভুত শক্তির জন্যে।'

—'আর তোমার রিভলভারের জন্যে।'

—'কিন্তু আর কতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবাবের ভণ্ডামি দেখবো? আধঘণ্টার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, নবাবকে এইবার জাগাও!'

কিন্তু তাকে আর জাগাতে হলো না, সে নিজেই আবার চোখ খুলে বললে, 'তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও? পারবে না।'

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে বললে, 'ওহো হো, তুমি বুঝি ধ্যানদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে যে তোমাকে এখান থেকে সরাবার শক্তি আমাদের হবে না?'

নবাবও দ্বিগুণ জোরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'তোমরা পারবে না—পারবে না! আমাকে এ-ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না! জানো, তোমরা কার সঙ্গে লাগতে এসেছো? আমাকে গুলি মেরে জখমই করো আর আমার হাতে হাতকড়িই পরিয়ে দাও, তবু আমি হবো তোমাদের প্রভু! পৃথিবীর কোনো সম্রাটের যে-শক্তি নেই, আমার বুকে আছে সেই বিপুল শক্তি! মানব-দানব-ভূত-প্রেত—আমার আজ্ঞা পালন করবে সবাই। আমি এই মৃত আলিনগরের একচ্ছত্র সম্রাট, এখানে আমার উপরে আর কারুর আজ্ঞা চলবে না, তোমাদেরও জীবন-মরণ এখন আমারই হাতে। তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, পারবে না, পারবে না! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—' তার ভীষণ ও অলৌকিক অট্টহাস্য সেই সুবিশাল মৃত্যু-প্রাসাদের মহাস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রত্যেক খিলানে খিলানে গিয়ে যেন আছড়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো,—ঘরের ছাদের তলা থেকে শয়তানের অভিশাপের মতোন কালো একঝাঁক বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকার দিয়ে

বোনা ডানা ঝট্‌পট্ করে জানলা দিয়ে গলে বাইরে উড়ে গেলো, কোথায় শুয়ে শুয়ে জুতোর কালির চেয়ে কালো একটা বিড়াল বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল, অট্টহাসির ঘটায় জেগে উঠে দরজার কাছে এসে আগুন-চোখে একবার ভিতরে উঁকি মেরে তীক্ষ্ণস্বরে একবার ম্যাও বলে প্রতিবাদ জানিয়েই আবার ছুটে পালালো।

হঠাৎ তার মূর্তির এতো পরিবর্তন হয়েছে যে নবাবের দিকে তাকালেও এখন বুক ধুকপুক করে ওঠে! আচম্বিতে তার এই ভাবান্তরের, এই আস্ফালনের কারণ কী? জয়ন্ত মনের ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো; কিন্তু তখনি জোর করে সেই ভাবটা দমন করে সে ধম্‌কে বলে উঠলো, 'নবাব, তোমার ও-বিদ্‌ঘুটে হাসি থামাও!'

নবাব তার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে গম্ভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, 'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় জীবনহারা জীবন্তের দল! সূর্যের চোখ কানা হয়েছে, দিনের চিলু নিবে গেছে, বাদুড়ের ঘুম ভেঙেছে, কালো বিড়াল জেগেছে, কবরের দরজা খুলেছে,—এইবারে তোরাও উঠে দাঁড়া, গোরস্থানে আলো জ্বাল, নরকের ফটকে সন্ধ্যাবাতি দে! ঝড়ে পড়ুক তোদের গায়ের ধুলো, জাগুক তোদের বুকে বুকে রক্ততৃষ্ণা, দুলুক তোদের গলায় গলায় নরমুণ্ডমালা! রাত তোদের ডাকছে, শ্মশান তোদের ডাকছে, আমি তোদের ডাকছি! ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় প্রাণহারা মহাপ্রাণীর দল!

জয়ন্ত সক্রোধে মাটির উপরে পদাঘাত করে বললে, 'মানিক, মানিক, আমরা কি এখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনবো? ঐ বদমাইসটার ঝাঁকড়া চুল ধরে মাটি থেকে টেনে তোলো তো দেখি, ও আমাদের সঙ্গে যায় কিনা?'

কিন্তু জয়ন্তের কথা মানিকের কানে ঢুকলো না, সে তখন কান পেতে আর একটা শব্দ শুনছিলো। একতলায় সমতালে পা ফেলে কারা

চলছে! ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্! যেন শিক্ষিত সৈন্যদলের পদশব্দ! ধুপ্-ধুপ্ ধুপ্-ধুপ ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্! যেন কাদের পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনার শব্দ! জয়ন্তেরও মুখ সাদা হয়ে গেলো। তালে তালে সেই পদশব্দ সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উপরে উঠছে।

নবাব আবার ডাক দিলে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় সজীব মৃত্যুর দল! আয়, আয়, আয়, আয়!'

ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্। শব্দ ক্রমেই নিকটস্থ হচ্ছে।

মানিক ছুটে দরজার কাছে গেলো। মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সিঁড়ি পার হয়ে প্রথমে যে-মূর্তিটা আবির্ভূত হলো, তার কপালে সেই বুলেটের দাগ। তার পিছনেই দেখা দিলো আর এক মূর্তি।

যেটুকু দেখলে তাই-ই যথেষ্ট! খানিক আগে একতলার কোণের ঘরের সেই তাপহীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহগুলোর মধ্যেই মানিক এদের দেখে এসেছে। দ্বিতীয় মূর্তির পিছনে যখন আবার একটা মূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দালানের উপরে এসে উঠলো, মানিক বেগে সেই জানলার কাছে দৌড়ে এসে বললে, 'জয়, জয়! বাইরে লাফিয়ে পড়ো! সেই মড়াগুলো জ্যান্ত হয়েছে!'

নবাব হাঁকলে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় কবরবাসীর দল!'

ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ ধুপ্-ধুপ্! দরদালান দিয়ে বাঁধা-তালে পা ফেলে তারা এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে, আরও এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি আসবার জন্যেও তারা কেউ যেন বেতালে পা ফেলবে না,—কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই সেই মৃত্যুচরের দল কাছে—আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুক ওরা! আমি ওদের ভয় করি না!'

মানিক তাড়াতাড়ি জয়ন্তের হাত ধরে জানলার দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'জয়, দুঃসাহসেরও সীমা আছে! মনে রেখো, বন্দুকের বুলেটও ওদের গতিরোধ করতে পারে না! ঐ ওরা এসে পড়লো! শিগগির লাফ মারো!

নবাব এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো—মুখে তার নিষ্ঠুর হাসি। কিন্তু মানিক তৎক্ষণাৎ তার এক পা লক্ষ্য করে আবার রিভলবার ছুঁড়লে, বিকৃত মুখে নবাব তীব্র চীৎকার করে আবার ভূতলশায়ী হলো।

প্রথমে জয়ন্ত, তারপরে মানিক জানলা গলে নিচেকার বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লো। তখনো একেবারে অন্ধকার হয়নি। শেষ আলোর শিখারা তখনো আকাশে আঁধারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

জয়ন্ত ও মানিক কোনদিকে না তাকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে নদীর পথে ছুটলো।

ছুটতে ছুটতে মানিক একবার পেছন ফিরে দেখলে, দোতলার ভাঙা জানলায় মুখ বাড়িয়ে আছে কতকগুলো রক্তশূন্য সাদা মূর্তি।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—'জয়! আরো জোরে—আরো জোরে ছোটো!'

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### মানুষে অমানুষে যুদ্ধের আয়োজন

এদিকে ফাঁড়ির সবাই ভেবেই অস্থির।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সকলে যখন জয়ন্ত ও মানিকের দেখা পেলো না তখন মনে করলে, তারা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, যথাসময়েই ফিরবে।

কিন্তু যথাসময়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেলো—কোথায় জয়ন্ত আর কোথায় মানিক!

সুন্দরবাবু মত প্রকাশ করলেন, 'ও দুই ছোকরাই অত্যন্ত বারফটকা! হুম্, এতো যে সাত-ঘাটের জল খেয়ে মরিস, তবু কি বেড়াবার শখ মিটলো না? আরে এ পোড়া দেশে দেখবার আছে কী?'

একটু বেশি বেলা করেই সেদিন দুপুরের খাওয়া শেষ করা হলো। তবু তাদের দেখা নেই।

বৈকালী চা-পানের সময় এলো।

অমিয় একবার জয়ন্ত ও মানিকের মোটঘাট নাড়াচাড়া করে বললে, 'জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই বেরিয়েছেন দেখছি। তাঁদের রসদের ব্যাগ দু'টোও নেই। তবে কি তারা আলিনগরেই গিয়েছেন?'

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, বলো কী? সেই যমালয়, যেখানে যমদূতেরা হানা দিয়ে ফিরছে, সেইখানে তারা দু'টো প্রাণী গিয়ে কী করতে পারবে?'

পরেশ ও নিশীথ বললে, 'অমিয় বোধহয় ঠিক আন্দাজ করেছে। নইলে এতক্ষণে তাঁরা ফিরে আসতেন।'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাদের ফেরবার

আশা ছেড়ে দাও! আর তারা ফিরছে না!'—এই বলে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কারুর সঙ্গে আর একটা কথাও কইলেন না।

সন্ধ্যা এলো। রাত হলো। সকলেরই মন খারাপ। মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ টেবিলের ধারে বসে চুপিচুপি পরামর্শ করছেন। সুন্দরবাবু মুড়ি দিয়ে সেইভাবেই পড়ে আছেন।

রাত্রের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হলো। অমিয় ডেকে বললে, 'উঠুন সুন্দরবাবু, খাবেন আসুন।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আমি খাবো না। জয়ন্ত আর মানিক বেঁচে নেই। আমার মন-কেমন করছে। আমার গলা দিয়ে খাবার গলবে না।' তাঁর গলা ধরা ধরা। বোধহয় মুড়ি দিয়ে কাঁদছেন।

মহম্মদ বললেন, 'আপনি না পুলিশে কাজ করেন। এতো সহজে কাবু হয়ে পড়লেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'পুলিশে কাজ করি বলে কি আমি মানুষ নই? আমার প্রাণ পাথর? আমি খাবো না।'

মহম্মদ বললেন, 'শুনুন সুন্দরবাবু। পরামর্শ করে ঠিক হলো যে কাল সকালেই আমরা সদল-বলে আলিনগরে যাত্রা করবো। সদর থেকে হুকুমও এসেছে। দু-দিন পরেই যেতুম, কিন্তু যে-রকম ব্যাপার দেখছি, আর দেরি করা চলে না।'

সুন্দরবাবু উঠে বসলেন, 'ঠিক বলছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু জয়ন্ত আর মানিককে কি পাওয়া যাবে? আলিনগর ভূতের রাজ্য!'

—'সুন্দরবাবু, ভূত-টুত সব বাজে কথা! কোনো বদমাইস ভূতের ভয় দেখায়। জয়ন্তবাবু বোকা নন—আত্মরক্ষা করতে জানেন।'

—'হুম্! সে বোকা নয় বটে, কিন্তু গোঁয়ার। তাই তার জন্যে ভয় হয়।'

—'কোনো ভয় নেই। আপনি খেতে বসুন।'

—'হুম্‌, আচ্ছা! দু'টো খাবার মুখে দি' তাহলে। কিন্তু কাল সকালেই যাচ্ছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কতো লোক নেবেন?'

—'আমরা পাঁচজন তো আছিই, আরো জন-বারো চৌকিদারও যাবে।'

—'জন-বারো? জন-চব্বিশ নেওয়া উচিত!'

—'তাহলে আরো দু-দিন অপেক্ষা করতে হয়। আপাতত অতো লোক নেই।'

—'না, না, অপেক্ষা নয়—ঐ জন-বারোতেই হবে।'

আহারাদির পর আরো খানিকক্ষণ পরামর্শ চললো। তারপর রাত বারোটা বাজলো দেখে মহম্মদ উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই সময় ফাঁড়ির দরজায় একখানা মোটর সশব্দে এসে দাঁড়ালো। মহম্মদ বিরক্ত-স্বরে বললেন, 'এত রাত্রে কে আবার 'কেস' নিয়ে জ্বালাতে এলো?'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো—দু'জনের পায়ের শব্দ।

সুন্দরবাবু তার বিপুল ভুঁড়ির ভার ভুলে গিয়ে শূন্যে এক লাফ মারলেন। মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, 'ও পায়ের-শব্দ আমি চিনি! জয়ন্ত আর মানিক আসছে!'

তারাই বটে। গায়ে, কাপড়-চোপড়ে ধুলো আর কাদা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কিন্তু মুখে প্রচণ্ড উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য।

সুন্দরবাবু একসঙ্গে তাদের দু'জনকে চেপে ধরে বললেন, 'আঃ, বাঁচলুম! কী ভাবনাটাই না হয়েছিলো, হুম্‌!'

মহম্মদ বললেন, 'কোথায় ছিলেন আপনারা। আমরা যে কাল সকালেই আপনাদের খুঁজতে আলিনগরে যাচ্ছিলুম!'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'কাল সকালে? না না, নবাবকে যদি ধরতে চান, আজ, এখনি চলুন!'

—'তার মানে ?'

—'নবাবের আড্ডা আমরা আবিষ্কার করেছি, মানিকের ছুই গুলিতে তার ছুই-পা খোঁড়া হয়ে গেছে, এমনকি নবাবের হাতেও আমরা হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এসেছি—দেরি করলে সে হয়তো সরে পড়বে।'

মহম্মদ বললেন, 'এতোই যখন করেছেন, তখন দয়া করে নবাবকে ধরে আনলেন না কেন ?'

—'ধরে আনলুম না কেন '—বলেই জয়ন্ত থেমে গেলো। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে শায়িত সেই ছয়টা মৃতদেহ। নিরালা, নীরব, নির্জন অট্টালিকার ধাপে-ধাপে সেই ধুপ্-ধুপ, ধুপ্-ধুপ্ করে জ্যান্ত মড়ার অলৌকিক পদশব্দ আবার যেন সে শুনতে পেলে স্বকর্ণে !......থেমে থেমে বললে, 'মহম্মদ সাহেব, বলতে পারেন, মড়া কখনো বাঁচে ?'

—'মড়া ?'

—'হ্যাঁ, ছয়টা মড়া আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিলো। তাই নবাবকে আনতে পারিনি। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

—'কী বলছেন !'

—'মানিককে জিজ্ঞাসা করুন ! আমি খালি পায়ের শব্দ পেয়েছি, মানিক স্বচক্ষে দেখেছে।'

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আমরাও তাদের দেখেছি !'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্ ! আমার কথাই সত্যি হলো। কাঙালের কথা বাসি হলে টিকে !'

মানিক বললে, 'আপনি কাঙাল নন সুন্দরবাবু, তিনশো টাকা মাইনে পান।

সুন্দরবাবু রেগে বললেন, 'ঠাট্টা কোরো না মানিক ! এখন ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না !'

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'এর ভিতরে নিশ্চয় কোনো কারসাজি

আছে। মড়া আক্রমণ করে? অসম্ভব!'

—'বেশ তো, এখনি দলবল নিয়ে চলুন না।'

—'তাও হয় না। যেতে হলে বড়ো বড়ো মোটর চাই। মোটর কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না।'

জয়ন্ত নাচারভাবে বললে, 'তাহলে কাল সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করি, কী আর করবো!'

পরিত্যক্ত আলিনগরের প্রাচীন পথ ধরে দু'খানা সাধারণ মোটর-গাড়ি ও একখানা মোটর-বাস অগ্রসর হচ্ছে। জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবু ছিলেন একখানা 'টু-সীটারে', জয়ন্ত নিজেই তার চালক। তার পরের গাড়িতে আছেন মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ। 'বাসে' আছে বারজন চৌকিদার, ড্রাইভারদের নিয়ে মোট একুশ জন লোক।

জয়ন্তের মতে একুশজন লোকই যথেষ্ট। সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করে বললেন, 'মোটেই যথেষ্ট নয়! হানাবাড়িতে একশো জন লোকও যথেষ্ট নয়! হুম্! একটা ভূত দেখা দিলে একশো জনের এক-জনেরও আর দেখা পাওয়া যাবে না! আর, এখানে একটা নয়—ভূত আছে নাকি ছয়-ছয়টা! বাপ্‌রে!'

মানিক বললে, 'একজনেরও দেখা পাওয়া যাবে না? তাহলে আপনিও কি পালাবেন?'

—'পালাবো না তো কি, নিশ্চয় পালাবো? আমি হচ্ছি পুলিশ, আমি ভূতের রোজা নই; ভূত দেখলে পালাবো না তো কি দাঁড়িয়ে থাকবো?'

—'তবে আপনি এলেন কেন?'

—'সেই ছয়টা লোক তো ভূত নাও হতেও পারে? হয়তো তোমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে! বিশেষ, এটা দিন-দুপুর। কে না জানে, দিন-দুপুরে ভূত বড়ো একটা দেখা দেয় না।'

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, 'কেন স্থন্দরবাবু, আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য শোনেননি ?'

—'কী শাস্ত্রবাক্য ?'

—'ঠিক দুপুর-বেলা, ভূতে মারে ঢেলা ?'

—'হুম্! আবার ঠাট্টা হচ্ছে ?'

গাড়িগুলো গোরস্থানে এসে উপস্থিত হলো। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'এখানেই সকলকে নামতে হবে।'

সকলে একে-একে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একসঙ্গে এতো লোকের ভিড় হতভাগ্য আলিনগর অনেক কাল দেখেনি। পথের উপরে শুয়ে একটা গোখরো সাপ নিশ্চিন্ত মনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিলো, সে তাড়াতাড়ি ফোঁস করে ফণা-তুলে উঠেই কালো বিদ্যুতের মতোন চকিতে একখানা পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

চারিদিকে তাকিয়ে মহম্মদ বললেন, 'এমন জায়গা কখনো দেখিনি! নগর বললেই লোকের মনে জেগে উঠে জনতার দৃশ্য। কিন্তু জনতাহীন—জলশূন্য সাগর! চারিদিকে খালি ভাঙা বাড়ি আর ঘুঘুর কান্না। দিনের বেলাতেই এখানে বুকের কাছটা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে ওঠে! এখানে একলা এলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক!'

জয়ন্ত অল্প হেসে বললে, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন, আমরাও রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি? কিন্তু এইটেই আপনার ভ্রম। এই পথে আসুন।'

গোরস্থানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মহম্মদ বললেন, 'কিন্তু একটা কিছু গোলমাল আছেই আছে, আপনারা যা দেখেছেন তা ভূতের চেয়েও আশ্চর্য। জ্যান্ত মড়ার কল্পনাও আমি করতে পারছি না!'

মানিক বললে, 'তারা যদি এখানে থাকে, তাহলে আপনিও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।'

জয়ন্ত বললে, 'অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়েছে। তারা কি আর এখানে আছে?'

সেই বিশাল অট্টালিকার বিবর্ণ উচ্চ চূড়া চতুর্দিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক-দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলে সেই বাড়ির যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সুন্দরবাবু একটু একটু করে ততোই পিছিয়ে পড়ছেন। ক্রমে তিনি চৌকিদারের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, পিছিয়ে থাকলে ভূতের আবির্ভাব হলে সর্বাগ্রে তিনিই দৌড় মারতে পারবেন।

মহম্মদ বললেন, 'অতো বড়ো বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে একশোজন লোকের দরকার।'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ি ঘেরাও করে যখন কোনো লাভ নেই, তখন ভিতরের উঠানে চৌকিদাররা অপেক্ষা করুক। আমরা ডাকলেই তারা যেন ছুটে আসে।'

সুন্দরবাবু মনে মনে বললেন, 'তারাই ছুটে আসবে বটে! ছুটে আসবে, না ছুটে পালাবে? ভূতের সঙ্গে লড়বে এই তালপাতার সেপাইরা! হুম!'

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## হুম্-হুম্-হুম্-হুম্

সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। এতগুলো জুতোর শব্দে অট্টালিকাবাসী নির্জনতা যেন চমকে উঠলো সবিস্ময়ে।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবলো, নবাব যদি এখনো এখানে থাকে, তাহলে এ পায়ের শব্দগুলো সেও শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

আর সেই জ্যান্ত মড়াগুলো? তারাও কি এখন উৎকর্ণ হয়ে তালে তালে পা ফেলে আক্রমণ করতে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে না?

সুন্দরবাবু মনে মনে ভাবছেন, এবারে তো খাঁচার ভিতরে ইঁদুরের মতো বাড়ির ভিতরে বন্দী হলুম। কোন্ দিক দিয়ে ভূত এলে কোন্ দিক দিয়ে পালানো উচিত, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। আর চৌকিদারদের সঙ্গে থেকে কোনো লাভ হবে না, এদের হাতে বন্দুক নেই!……তিনি দৌড়ে মহম্মদের সঙ্গ নিলেন।

জয়ন্ত সর্বাগ্রে একতলা দালানের সেই কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। চারিদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে হতাশভাবে বললে, 'তারা এখানে নেই।'

সুন্দরবাবু আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন,—'তারা নেই, বাঁচা গেছে। আপদ বিদেয় হয়েছে!'

মহম্মদ বললেন, 'আপনি ঘর ভুল করেননি তো?'

জয়ন্ত বললে, 'না। ঐ দেখুন।' বলেই সে 'টর্চ' টিপে মেঝের উপরে আলো ফেললে। মেঝের উপরে পুরু ধুলো। আর ধুলোর উপরে পাশাপাশি ছয়টা দেহের পরিষ্কার ছাপ।

মানিক বললে, 'এ-ঘরে মড়াগুলো ছিলো ঠিক মড়ারই মতো। তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি, নাকে হাত দিয়ে দেখেছি।'

মহম্মদ খালি বললেন, 'আশ্চর্য !'

সুন্দরবাবু সকলের পিছন থেকে উঁকি মেরে দেহের ছাপগুলো একবার দেখেই শিউরে উঠে বললেন, 'হুম্ ! আমার নাকে পচা মড়ার গন্ধ আসছে !'

মানিক বললে, 'সত্যি সত্যিই সেদিন এখানে মড়া-পচা গন্ধ ছিলো।'

মহম্মদ বললেন, 'সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি বেশি। আমি কোন গন্ধ পাচ্ছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'চৌকিদারদের উঠানের সব ঘর খুঁজে দেখতে বলুন। ততক্ষণে আমরা উপরটা ঘুরে আসি। কিন্তু বোধহয় মিথ্যা ঘোরাঘুরি। শিকার পালিয়েছে। আমরা যে আবার আসবো নবাব সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। সে বোকা নয়।'

দোতলার দালানের কোলে শুয়ে ছিলো সেই কালো বিড়ালটা। লোক দেখেই 'ম্যাঁও' বলে আপত্তি জানিয়ে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে।

মহম্মদ বললেন, 'হানাবাড়ির সব লক্ষণই এখানে আছে দেখছি !'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, কেবল কালো বিড়াল নয়, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দলে দলে কালো বাদুড়ও ঝুলছে। যেন আঁধারে তৈরি অতিকায় প্রজাপ্রতি !'

—'কেবল আসল দ্রষ্টব্যই নেই। ভূত, কি জ্যান্ত মড়া।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভূত আবার দ্রষ্টব্য কী, না থাকাই তো ভালো !'

যে-ঘরে নবাব আহত হয়েছিলো সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরে জনপ্রাণী নেই।

মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিশ্চল জড় পাথরের মূর্তি। তারপর হঠাৎ কি উৎসাহে তার বিপুল বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠলো। তারপর পকেট থেকে রুপোর শামুক বার করে দু-বার সশব্দে নস্য নিলে।

মানিক জানে, এটা জয়ন্তের বিশেষ আনন্দের লক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ সে এমন আনন্দিত হলো কেন?

মহম্মদ বললেন, 'বাড়ির সব ঘরই যে এমন খালি দেখব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

জয়ন্ত খুশি-গলায় বললে, 'সব ঘর হয়ত খালি নেই!'

—'কী করে জানলেন?'

—'এখনো ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না। আসুন আমার সঙ্গে।'

জয়ন্ত অগ্রসর হলো। আর সবাই চলল তার পিছনে পিছনে।

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত খুব ধীরে ধীরে দালান দিয়ে এগুতে লাগল। দালানের পূর্ব প্রান্তে একটা দরজা। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

মহম্মদ বললেন, 'এ দরজা বন্ধ করলে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'যেই-ই বন্ধ করুক, আমি খুলে দিচ্ছি। আপনাদের বন্দুক তৈরি রাখুন।'

তার বিপুল দেহের ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে গেল।

কিন্তু সেটা ঘরের দরজা নয়। অন্দর-মহলের দরজা।

জয়ন্ত আবার অগ্রসর হলো। অন্দরেও একটা উঠান রয়েছে, কিন্তু বাইরের মতন অত বড় নয়। আবার একটা দালান। তারপর আবার একসার সিঁড়ি। জয়ন্ত এবার নিচে নামতে লাগল। তারপর ডানদিকে ফিরে এগিয়ে চলল। সে আবার একটিপ নস্য নিলে, এবং মনের আমোদে শিস দিতে শুরু করলে।

মানিক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, জয়ন্ত কোথায় যাচ্ছে? এ বাড়ির কিছুই সে চেনে না, এদিকে কখনো আসেও নি, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে কোথায় যাচ্ছে সে? জয়ন্ত তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়, কী সূত্র সে পেয়েছে, কখন পেলে এবং কেমন করে পেলে?

দ্বিতীয় উঠানের পূর্ব প্রান্তে ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা ঘর। জয়ন্ত

সোজা সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার টর্চটা জ্বেলে কী যেন দেখলে।

সে ঘরেও কেউ নেই।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এলেন কেন ?'

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'দেখছি, এ ঘর দিয়ে বেরুবার আর কোন পথ নেই। তাহলে কোথায় গেল ?'

—'কে কোথায় গেল ?'

—'নবাব। সে এই ঘরেই ঢুকেছে। কিন্তু দরজা দিয়ে আর বেরোয় নি।'

মহম্মদ একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন, 'আপনার এমন আশ্চর্য অনুমানের কারণ কী ?'

—'কারণ ? রক্তের প্রমাণ মহম্মদ সাহেব, রক্তের প্রমাণ! আপনারা চোখ ব্যবহার করতে শেখেননি কেন ?'

—'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, গৃহতলে একটা সুদীর্ঘ কালো রেখা। ঘর থেকে মুখ বাড়িয়েও দেখলে, সে রেখা দালান দিয়ে সমান চলে গেছে। রক্ত জমাট বাঁধলে কালো দেখায়। এত বড় একটা সূত্রও তার চোখে পড়েনি বলে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করলে।

জয়ন্ত বললে, 'মহম্মদ সাহেব, শুনেছেন তো, মানিকের রিভলবারের গুলিতে কাল নবাবের উরু আর পা জখম হয়েছিল ? নবাব যেখান দিয়ে গিয়েছে, কিংবা তাকে যেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সারা পথেই রক্ত ঝরে ঝরে পড়েছে। সেই রক্তরেখা অনুসরণ করেই উপরের ঘর থেকে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। এখন বুঝতে পারলেন ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! জয়ন্ত, তুমি আমার কান মলে দাও।

আমরা কি চোখের মাথা খেয়েছিলুম? এমন সহজ প্রমাণটাও আবিষ্কার করতে পারিনি!'

মহম্মদ চমৎকৃত স্বরে বললেন, 'ধন্য জয়ন্তবাবু, ধন্য!…কিন্তু সে শয়তানটা গেল কোথায়?'

—সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। দেখছেন তো, রক্তের একটা রেখাই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। নবাব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আর একটা রেখাও দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদ সাহেব, আপনি সব চৌকিদারকে এখানে আসতে বলুন, আমি ততক্ষণ নবাবকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করি।'

মহম্মদ বাইরে গিয়ে বার-তিনেক বাঁশি বাজাতেই চৌকিদারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত 'টর্চ' জ্বেলে দেখে বললে, 'মানিক, রক্তের দাগ ঐ দেওয়ালের গায়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু দেওয়ালের সামনে গিয়ে নবাব অদৃশ্য হলো কেমন করে, সে তো আর হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে না?… হয়েছে, ঐ দেখ, দেওয়ালের গায়ে দুটো কড়া। এ-সব সেকেলে পুরানো বাড়িতে প্রায়ই গুপ্তদ্বার থাকে। মানিক, কড়া দুটো ধরে জোরে টান মারো তো!'

মানিক তাই করলে। খুব সহজেই দেওয়ালের খানিকটা অংশ হড়হড় করে দরজার মতো খুলে গেল। ভিতরে একটা পথ।

জয়ন্ত বললে, 'সবাই রিভলবার নাও। ছয়জন চৌকিদার গুপ্ত-দ্বারের সামনে পাহারা দিক। ছয়জন আমাদের সঙ্গে আসুক।'

পথটা গিয়ে আর একটা দরজার সামনে শেষ হয়েছে। দরজার সঙ্গে আর একবার জয়ন্তের শক্তিপরীক্ষা শুরু হলো। কিন্তু এ-দরজা জয়ন্তের প্রবল আক্রমণ তিন তিনবার ব্যর্থ করলে।

জয়ন্ত তখন দরজার উপরে পৃষ্ঠদেশ রেখে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল—'টর্চ'-এর আলোতে দেখা গেল, তার সারা মুখ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে।

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব চেষ্টা! মানুষ ও-দরজা গায়ের জোরে ভাঙতে পারে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

হঠাৎ মড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। জয়ন্ত সরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'দেখুন, ভেঙেছে কি না?'

মহম্মদ এগিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, দরজার দু-খানা কবাটই চৌকাট থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সসম্ভ্রমে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি অসাধারণ মানুষ!'

তারপর দু-তিনটে লাথি মারতেই হুড়মুড় করে পাল্লা দু-খানা ভেঙে পড়ল।

খোলা দরজা দিয়েই দেখা গেল, একখানা বড় হলঘর এবং ঘরের ওদিককার দেওয়ালের সামনে খাটের বিছানার উপরে হাসিমুখে বসে রয়েছে নবাব স্বয়ং!

জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, 'সেলাম আলিনগরের সম্রাট! ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি?'

নবাব খুব মিষ্ট গলায় বললে, 'এস।'

—'তোমার সেই জীবনহীন জীবন্তরা কোথায়?'

নবাব আবার ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বললে, 'বড় হঠাৎ এসে পড়েছ, তাদের জাগাবার আর সময় পেলুম না।'

—'তাহলে এ-জীবনে আর সময় পাবেও না!'—বলেই জয়ন্ত ভিতরে গিয়ে ঢুকল সর্বপ্রথমে। অন্য সবাই তার পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ সুন্দরবাবু 'ওরে বাপরে—হুম্!' বলে চেঁচিয়ে উঠে সামনে অমিয়কে পেয়েই দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।

সকলে ফিরে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দরজার দিকের দেওয়ালের তলাতেই পাশাপাশি শুয়ে আছে সেই ছয়টা মূর্তি। তাদের কারুর চোখ মোদা, কারুর চোখ আধা খোলা, কারুর চোখ পুরো খোলা। কিন্তু সব চোখই আড়ষ্ট—মড়ার মতো দৃষ্টিহীন!

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের বুকে হাত দিয়ে বললে, 'মহম্মদ সাহেব, দেখে যান—এই ঠাণ্ডা বুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন আছে কি না!'

কিন্তু মহম্মদের রুচি হলো না। দূর থেকেই বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছি ওগুলো মড়া।'

মানিক বললে, 'কিন্তু এই মড়াগুলোই সেদিন বেঁচে উঠেছিল।'

মহম্মদ অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

সুন্দরবাবু চোখ ছানাবড়া করে বললেন, 'ওরা আবার যদি জাগে? আবার যদি তেড়ে আসে? এই চৌকিদার! লাশগুলো শীগগির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা!'

কিন্তু চৌকিদাররা কেউ মড়া ছুঁতে রাজী হলো না।

নবাব হাসতে হাসতে বললে, 'ভয় নেই, ওরা কেউ আর জাগবে না। এইবারে আমিও ওদের মতো ঘুমিয়ে পড়ব।'

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, 'ঘুমিয়ে পড়বে—মানে?'

—'হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ব। তোমরা জ্যান্ত নবাবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই দেখ।' নবাব বিছানার উপর থেকে একটা খালি শিশি তুলে নিয়ে দেখালে।

—'তুমি বিষ খেয়েছ?'

—'হ্যাঁ। তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে, নইলে ওদের আর একবার জাগিয়ে শেষ-চেষ্টা করে দেখতুম। বিষ না খেয়ে উপায় কী?'

মহম্মদ বললেন, 'তুমি সত্যি সত্যিই ঐ মড়াগুলোকে বাঁচাতে পারো?'

—'পারি। অবিশ্বাস হচ্ছে? দেখবে?'

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, আর দেখে কাজ নেই! আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে!'

নবাব বললে, 'তোমরা কি পিশাচসিদ্ধ মানুষের কথা শোননি? আমি বহু সাধনায় সেই বিদ্যা অর্জন করেছি। নানান দেশের নানান

কবর খুঁজে আমি বেছে বেছে খুব জোয়ান আর টাটকা মড়া তুলে এনেছি। যখন দরকার হয় তখন আমি তাদের নিজের আত্মার অংশ দি'। কিন্তু ওদেরও দেহ তাজা রাখবার জন্যে জ্যান্ত জীবের

রক্তের দরকার হয়। তাই যখন ঐ মড়ারা বাঁচে, বনের জীব ধরে তাদের ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়, সুবিধা পেলে মানুষের রক্তও পান করে ; আর তারপর গোলামের মতো আমার হুকুমে ওঠে বসে চলে ফেরে। ......তোমরা আর কী জানতে চাও বল, আমার ঘুমোবার সময় ঘনিয়ে আসছে।'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি মেয়ে চুরি করতে কেন?'

হা-হা করে হেসে নবাব বললে, 'কেন ? বলেছি তো, আমি আলি-নগরের রাজা। তাই তো আমি নবাব নাম নিয়েছি। আমার বেগম নেই, তাই মেয়ে ধরে আনি বেগম করব বলে। কিন্তু একটা মেয়েও আমার বেগম হবার উপযুক্ত হলো না। তবু তাদের ধরে রেখেছি—মনের মতন বেগম পেলে পর তাদের বাঁদী করে রাখব বলে।'

অমিয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'কোথায় আমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছিস ?'

'পাশের ঘরে গিয়ে দেখগে।'

অমিয় নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠল, 'কোন্ দিক দিয়ে যাব ?'

—'ঐ দরজা দিয়ে।'

পশ্চিম দিকে একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল, সেদিকেও একটা পথ রয়েছে।

তারা তিনজনে ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—শীলা, শীলা !'

কে ক্ষীণ, কাতর কণ্ঠে সাড়া দিলে, 'দাদা ! দাদা !'

মিনিট-তিনেক পরেই অমিয় তার বোনের হাত ধরে ফিরে এল। নিশীথ ও পরেশের পিছনে পিছনে এল আরো তিনটি মেয়ে, সকলেই ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

ছয়টা মৃত মূর্তির দিকে তাকিয়েই শীলা আর্তনাদ করে আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে বলে উঠল, 'দাদা ! দাদা ! আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল !'

অমিয় বললে, 'আমরা এসে পড়েছি, আর তোর ভয় নেই শীলা !'

শীলা ভয়ে চোখ মুদে শুকনো গলায় বললে, 'কিন্তু ঐ মড়াগুলো ? ওরা যে এখানে রয়েছে ! ওরাই যে আমাকে ধরে এনেছে ! ওরা যে রোজ আমাকে ভয় দেখায় !'

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়তে অমিয় বললে, 'ওরা আর কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না ! ওদের আবার আমরা মাটির তলায় পুঁতে ফেলব।'

নবাব গম্ভীর স্বরে বললে, 'তোমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো? এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি! আমাকে মরতে দাও।'

মহম্মদ বললেন, 'তা হয় না! তুমি মরবে কি না কে জানে?'

নবাব টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা নির্ভয়ে যেতে পারো।'

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, 'চোখের সামনে তোমার মৃত্যু না দেখে আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারব না।'

নবাবের ঝিমিয়ে-আসা চোখে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে সে গর্জন করে বললে, 'কী, আমাকে একলা মরতে দেবে না? বটে!' হঠাৎ সে সিধে হয়ে উঠল, এবং তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

মানিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ও মরল নাকি?'

জয়ন্ত তীক্ষ্নদৃষ্টিতে নবাবের মুখের পানে চেয়ে রইল।

আচম্বিতে সুন্দরবাবু মেঝের উপরে প্রচণ্ড এক ঝাঁপ খেয়ে আছড়ে

পড়লেন এবং বেগে গড়াতে গড়াতে নবাবের খাটের তলায় ঢুকে পড়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'হুম্ হুম্ হুম্ হুম্!'

ওদিকে ঘরের ভিতরে আরম্ভ হয়েছে চিৎকার ও আর্তনাদের সঙ্গে বিষম হুটোপুটি ও ছুটোছুটি। চৌকিদাররা দল বেঁধে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্য তিনটি মেয়ে—কেবল শীলা তার দাদার দুই বাহুর উপরে এলিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই ছয়টা মৃতদেহ টলতে টলতে মেঝের উপরে উঠে বসেছে—তাদের প্রত্যেকেরই ভাবহীন চক্ষু একেবারেই বিস্ফারিত।

মহম্মদ পিছনে হটে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

মানিক উপর-উপরি রিভলবার ছুঁড়লে, কোন-কোন দেহে গুলি ঢুকে বীভৎস ছিদ্রের সৃষ্টি করলে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একফোঁটাও রক্ত বেরুলো না, কিংবা মূর্তিগুলোর মুখে-চোখে যন্ত্রণার আভাসটুকুও ফুটে উঠল না। কী ভয়ানক! সে অসম্ভব, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলেও বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়!

জয়ন্তের হঠাৎ তখন খেয়াল হলো, নবাব নিশ্চয় মরবার আগে শেষবার মড়া জাগাবার জন্যে ধ্যানাসনে বসেছে। সে এক লাফে বিছানার উপর গিয়ে পড়ে নবাবকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে। নবাব তীব্র কণ্ঠে 'আঃ' বলে শয্যায় এলিয়ে পড়ল।

ওদিকে সেই মুহূর্তেই ছয়টা মূর্তিই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার অবশ হয়ে প্রথমে বসে—তারপর মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। আবার তারা যে মড়া সেই মড়া।

জয়ন্ত হেঁট হয়ে নবাবের বুকে হাত দিলে। তার বুক স্থির। তার নাকে হাত দিলে। নিশ্বাস পড়ছে না।

মানিক খাটের তলা থেকে সুন্দরবাবুর দেহ টেনে বার করলে। তিনি তখন আর 'হুম্' বলছেন না। অজ্ঞান।

## গামা, হাসানবক্স, ছোটগামা

এবার আমরা প্রবেশ করব মল্লসভার মধ্যে। কিন্তু মাভৈঃ, আপনাদের কারুকে আমি 'বীরমাটি' মাখবার জন্যে আহ্বান করব না। 'বীরমাটি' কাকে বলে জানেন তো? আখড়ায় যে-মৃত্তিকাচূর্ণের উপর দাঁড়িয়ে পালোয়ানেরা কুস্তি লড়ে। সেই মাটি গায়ে মর্দন করে যোদ্ধারাই।

স্রষ্টা আমার দেহখানিকে যৎপরোনাস্তি একহারা করে গড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। কিন্তু ভ্রমক্রমে আমার মনকে দেহের উপযোগী করে গঠন করেন নি। শেষ পর্যন্ত মসীজীবী লেখক হয়েই জীবনসন্ধ্যায় বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছি বটে, কিন্তু আমার

বুকের মধ্যে যে মনের মানুষটি বাস করে সকলের অগোচরে, চিরদিনই সে আসীন হতে চেয়েছে কাপালিকের বীরাসনে। সত্য বলছি, অত্যুক্তি নয়।

অবশ্য তালপাতার সেপাইরাও দিবাস্বপ্ন দেখে এবং পুরু গদীর উপরে নিশ্চেষ্টভাবে তাকিয়া আঁকড়ে বসে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে। আমি কিন্তু কোনকালেই তাদের দলের লোক নই। ছেলেবেলা থেকেই নামজাদা ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট-হকি-ফুটবল খেলেছি, সাঁতার দিয়ে গঙ্গার এপার-ওপার হয়েছি, জিমনাস্টিক নিয়ে মেতেছি, 'গ্রিপ-ডাম্বেল' ও মুগুর ভেঁজেছি, 'চেস্ট-এক্সপ্যাণ্ডার' ও 'বার-বেল' ব্যবহার করেছি এবং ডন-বৈঠক দিয়েছি। অর্থাৎ বলীদের মধ্যে একটা কেওকেটা হবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করি নি। চোখের সামনেই ব্যায়াম করে কত একহারা দেখতে দেখতে দোহারা তারপর তেহারা হয়ে উঠল, আমি কিন্তু বরাবরই হয়ে রইলুম মূর্তিমান ভদ্রলোকের এককথার মতো একেবারেই একহারা। নাট্যকার অমৃতলাল যাকে "ভীম ভবানী" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, বাল্যকালে বিদ্যালয়ে সে আমার সহপাঠী ছিল। সে তখনও আমার মতো একহারা ছিল না বটে কিন্তু সেই দেহের তুলনায় পরে তার যে চেহারা হয়েছিল, তা অবিশ্বাস্য বলা যেতেও পারে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে মনে হোত যেন মাতঙ্গের পাশে পতঙ্গ।

বলবান লোকদের দেখবার জন্যে বরাবরই আমার মনের ভিতরে আছে উদগ্র আগ্রহ। বাল্যকাল থেকেই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় নানা আখড়ায় কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। কোথাও দঙ্গলের ব্যবস্থা হয়েছে শুনলে সেখানে যাবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে পারতুম না। বহুকাল (অর্ধ শতাব্দীরও) আগে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে কাল্লুর সঙ্গে কিক্কর সিংয়ের কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। তখন গামার নাম কেউ জানত না, কিন্তু কাল্লু ও কিক্কর ছিলেন ভারতবিখ্যাত। টিপে টিপে মায়ের পা ব্যথা করে দিয়ে কত খোসামোদের ও

অশ্রুত্যাগের পর যে সেই কুস্তি দেখবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলুম, তা আজও আমার স্মরণ আছে।

কিঙ্করের চেহারা ছিল যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়াবহ। মাথায় তিনি সাড়ে ছয় ফুটের চেয়ে কম উঁচু ছিলেন না এবং চওড়াতেও তাঁর দেহ ছিল যে কতখানি, বললে সে-কথা কেউ বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না (বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, তাঁর বুকের ছাতির মাপ ছিল আশী ইঞ্চি—যে-কথা শুনলে স্যাণ্ডো সাহেবও নিশ্চয় বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারতেন না)। আমি অনেক বড় বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু লম্বায়-চওড়ায় তাঁদের কেউই কিঙ্কর সিংয়ের সমকক্ষ নন। কাল্লুও ছিলেন বিপুলবপু, কিন্তু তাঁর বিপুলতা কিঙ্করের সামনে মোটেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। কাল্লু যে কিঙ্করকে হারাতে পারবেন, দেখলে তা কিছুতেই মনে করা যেত না। বর্তমান নিবন্ধমালায় স্বর্গীয় গুণীদের নিয়ে আলোচনা করবার কথা নয়, অতএব আমি সে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দিতে চাই না। কেবল এইটুকুই বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, ডেভিডের কাছে গোলিয়াথের মতো কাল্লুর কাছে কিঙ্করও হয়েছিলেন পরাভূত।

তার কয়েক বৎসর পরে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের উপরে আমি যে মহাবলবান মানুষটিকে দেখি, বিশেষ কারণে এখানে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেই ভারতের দেশে দেশে—এমন কি বাংলাতেও শত শত যুবক দৈহিক শক্তিচর্চায় একান্তভাবে অবহিত হয়েছে। আমি রামমূর্তির কথা বলছি। তিনি শারীরিক শক্তির যে-সব অভাবিত পরিচয় দিয়েছিলেন, সেদিন সকলেরই কাছে তা ইন্দ্রজালের মতোই আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল। তারপরে অনেকেই তাঁর কয়েকটি খেলার নকল করে নাম কিনেছেন ও কিনছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকতর দুরূহ কয়েকটি খেলা আজও কেউ চেষ্টা করেও আয়ত্তে আনতে পারেন নি। কারণ সে খেলাগুলির মধ্যে ফাঁকি বা প্যাঁচ ছিল না, রামমূর্তির মতো অমিত শক্তির অধিকারী

না হলে কারুরই সে-সব খেলা দেখাবার সাধ্য হবে না। রামমূর্তির প্রদর্শনী ছিল কেবল বাহুবল দেখাবার জন্যে নয়, অর্থ উপার্জনের জন্যেও বটে। তাই কোন কোন খেলাতে তিনি দর্শকদের চমকে অভিভূত করে দিতেন। কিন্তু যেখানে কৌশলের উপর থাকে প্রকৃত শক্তির প্রাধান্য, সেখানে রামমূর্তি আজও অদ্বিতীয় হয়ে আছেন।

আমি বাল্যকালেও দেখেছি, কলকাতার বহু বনিয়াদী ধনীর বাড়িতে ছিল স্থায়ী কুস্তির আখড়া। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সম্পদের জন্যে বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও ছিল পরিবারের ছেলেদের জন্যে নিয়মিত কুস্তি লড়বার ব্যবস্থা এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও কুস্তি লড়ার অভ্যাস করতে হোত। হয়তো সেইজন্যেই তিনি লাভ করেছিলেন অমন সুগঠিত পুরুষোচিত দেহ। তাঁর পিতামহ "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ছিলেন শৌখীন কুস্তিগীর।

কিন্তু বাঙালী নিজেকে যতই সভ্য ও শিক্ষিত বলে ভাবতে শিখলে, ব্যায়াম ও কুস্তি প্রভৃতিকে ততই ঘৃণা করতে লাগল। তার ধারণা হলো ও-সব হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ব্যক্তির ও ছোটলোকের কাজ। অথচ যে-দেশ থেকে সে লাভ করেছে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা, সেই প্রতীচ্যের উচ্চ-নীচ সর্বসাধারণের মধ্যে পুরুষোচিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার লোকপ্রিয়তা যে কত বেশি, সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করা দরকার মনে করে নি। সবল ইংরেজের কাছে দুর্বল বাঙালী পড়ে পড়ে মার খেত, তবু তার হুঁশ হোত না।

কিন্তু তারও ভিতরে ছিল যে একটা subconscious বা অব্যক্ত-চেতন মন, সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল মোহনবাগান যেদিন ফুটবল খেলার মাঠে 'শীল্ড ফাইন্যালে' প্রথম গোরার দলকে হারিয়ে দেয়। শত শত জ্বালাময়ী বক্তৃতাও যে বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে নি, একটি দিনের একটি মাত্র ঘটনায় তা হয়ে উঠল আশ্চর্যভাবে অতিশয় জাগ্রত। ইংরেজী সংবাদপত্রে সেই

সময়ে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল : মোহনবাগানের বিজয়-গৌরবে চারিদিকে যখন সাড়া পড়ে গিয়েছে, তখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দুই ব্যক্তি, তাদের একজন বাঙালী, আর একজন ইংরেজ। তারা পরস্পরের বন্ধু। বাঙালী পথিকটি বার বার এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ইংরেজ সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার আজ এ কি হলো বলতো ? তুমি আমাকে বার বার পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছ কেন ?' বাঙালী জবাব দেয়, 'দেখছ না, আজ আমাদের জাতিই যে এগিয়ে চলেছে।' কথাগুলি আমার এতই ভালো লেগেছিল যে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি।

আজকাল বাতাস কিছু বদলেছে। কিছুকাল থেকে দেখছি বাঙালী যুবকরাও দেহচর্চায় মন দিয়েছে এবং ব্যায়ামের নানা বিভাগে দেখাচ্ছে অল্পবিস্তর পারদর্শিতা। আদর্শ দেহ গঠনে, পেশী শাসনে, ভারোত্তলনে, মুষ্টিযুদ্ধে ও বাৎসরিক কুস্তি-প্রতিযোগিতায় বাঙালী যুবকদের কৃতিত্বের কথা শুনে এই প্রাচীন বয়সেও আমি তরুণের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠি। কিন্তু এইখানেই যথেষ্ট হয়েছে ভেবে থামলে চলবে না—অগ্রসর হতে হবে, আরো অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে, শাক্ত জাতি হিসাবে আমাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বসভার মাঝখানে।

জ্ঞানে নয়, বিদ্যায় নয়, সভ্যতায় নয়, সংস্কৃতিতে নয়, কেবলমাত্র পশুশক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল মুসলমানরা। এবং আজ পর্যন্ত নিরক্ষর মুসলমানরাও কেবল দৈহিক শক্তিসাধনারই দ্বারা ভারতের অন্যান্য জাতিদের পিছনে ঠেলে শীর্ষ-স্থান অধিকার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। আজ ভারতের তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মল্ল কে ? গামা এবং তার ছোট ভাই ইমাম বক্স। গামার বয়স বোধ করি এখন সত্তরের উপরে এবং ইমামেরও ষাটের উপরে। কিন্তু এখনও গামা যে-কোন যুবক প্রতিদ্বন্দ্বীরও সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে প্রস্তুত। বলেছেন, 'যে আমার ছোট ভাই

ইমামকে হারাতে পারবে, তার সঙ্গেই আমি লড়তে রাজী আছি।' কিন্তু ভারত বা য়ুরোপের কোন মল্লই তাঁর এ-চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহসী নয়। গামা অপরাজেয় হয়েই রইলেন। তাঁর আগে গোলাম পালোয়ানও ছিলেন এমনি অতুলনীয়।

কেবলই কি গামা ও ইমাম ? তাঁদের ঠিক নীচের থাকেই যাঁরা আছেন—যেমন হামিদা, গুঙ্গা, হরবন্স সিং, সাহেবুদ্দীন ও ছোট গামা প্রভৃতি আরো অনেকে ( এখানে অকারণে সকলের নাম করে লাভ নেই ), তাঁদের মধ্যে এক হরবন্স সিং ছাড়া আর সকলেই মুসলমান।

সেটা ১৯১৬ কি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ আমার ঠিক মনে নেই। আমি তখন কাশীধামে। গামা তখন ইংলণ্ডে গিয়ে জন লেম ও বড় বিস্কো প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশের শীর্ষস্থানীয় পালোয়ানদের হারিয়ে পৃথিবী-জোড়া উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশে ফিরে এসেছেন। দুইজন স্থানীয় বন্ধুর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবার বড় রাস্তায় ভ্রমণ করছি, হঠাৎ বন্ধুদের একজন বললেন, 'ঐ দেখুন, গামা পালোয়ান যাচ্ছেন।'

সাগ্রহে তাকিয়ে দেখলুম। পথ দিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন লোক, সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মধ্যমণির মতো। মাথায় পাগড়ি, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি, পায়ে নাগরা জুতো—পোশাকে আছে রঙ-বেরঙের বাহার। দাড়ি কামানো, মস্ত গোঁফ। দেহ অনাবৃত নয় বটে, কিন্তু বস্ত্রাবরণ ঠেলে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসছে যেন একটা প্রবল শক্তির উচ্ছ্বাস। ভাবভঙ্গিও প্রকাশ করছে তাঁর বিশেষ বীর্যবত্তা। অসাধারণ চোখের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে ব্যক্তিত্বকে। গামা চলে গেলেন, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলুম। মন বললে, দেখলুম বটে এক পুরুষসিংহকে।

তার কয়েক বৎসর পরে গামাকে দেখি কলকাতায়। তারিখ সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি বাল্যকালের সব কথাও হুবহু মনে রাখতে পারি, কিন্তু দশ-পনেরো বৎসর আগেকার কোন

বিশেষ তারিখ স্মরণ করতে পারি না। তবে মনে হচ্ছে অন্তত বত্রিশ বৎসর আগে কলকাতায় গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলে মস্ত এক কুস্তি-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ভারতের নানা প্রদেশ থেকে এসেছিলেন নামজাদা পালোয়ানরা—কেউ কুস্তি লড়তে, কেউ কুস্তি দেখতে। আমি একদিন সেই কুস্তির আসরে গিয়েছিলুম, গামার সঙ্গে হাসান বক্সের প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে। কিন্তু স্মরণ হচ্ছে অন্যান্য পালোয়ানদের কুস্তি হয়েছিল একাধিক দিবস ধরে।

আমি যেদিন যাই, সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন স্বর্গত বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র গুহ। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজের বক্সিং-এ 'হাফ-ব্লু', পরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে কিছুকাল প্র্যাকটিস করে মালয়ে গিয়ে আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট নাম কেনেন এবং নেতাজীর 'আই-এন-এ'-র এক পদস্থ কর্মচারী হন। সেই অপরাধে ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে। পরে তিনি মুক্তিলাভ করে আবার দেশে ফিরে আসেন। এই সেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁবুর ভিতরে বৃহতী জনতা। তার মধ্যে বাঙালী খুব কম, অধিকাংশই মুসলমান ও হিন্দুস্থানী—তারা চারিধারের গ্যালারি দখল করে বসে হাটবাজারের সোরগোল তুলেছে। রাজ্যের পালোয়ান সেখানে এসে জুটেছেন, তাঁদের মধ্যে দেখলুম বন্ধুবর শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুকেও। সেদিনকার কুস্তির বিচারক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

প্রথম দুই-তিনটি কুস্তির পরেই শুনলুম এইবার হবে ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার প্রতিযোগিতা। এই গামা হচ্ছেন প্রখ্যাত কাল্লু পালোয়ানের ছেলে। তিনি তখন সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, দেহ রীতিমত তৈরি, তার কোথাও মেদবাহুল্য নেই। কুস্তির খানিক আগে থাকতেই তিনি একটা কাঠের থাম ধরে দেহকে গরম করবার জন্যে খুব স্ফুর্তির সঙ্গে ক্রমাগত বৈঠক দিতে শুরু করলেন।

তারপর ভীম ভবানীর সঙ্গে ছোট গামার কুস্তি আরম্ভ হলো।

ভবানী বয়সেও বড় এবং তাঁর বিপুল দেহও অত্যন্ত গুরুভার,—চটপটে ছোট গামাকে দাঁড়িয়ে এঁটে উঠতে না পেরে তিনি নিলেন মাটি—অর্থাৎ আখড়ার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। ছোট গামা বহুক্ষণ ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করেও এবং অনেক প্যাঁচ কষেও তাঁকে চিৎ করতে পারলেন না, তবু বিচারকের অদ্ভুত রায়ে সাব্যস্ত হলো, জয়লাভ করেছেন ছোট গামাই! মল্লযুদ্ধে চিরকালই মাটি নেওয়ার রীতি আছে এবং ভূপতিত প্রতিযোগীকে চিৎ করতে না পারলে কুস্তি হয় সমান সমান। মাটি নেওয়া কুস্তির অন্যতম প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর যুদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন মহামল্ল গামা এবং হাসান বক্স। আজ পর্যন্ত আমি অনেক বড় পালোয়ান দেখেছি, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যে হাসান বক্সের কাছে তাঁদের সকলকেই হার মানতে হবে। সেই দেববাঞ্ছিত সুঠাম ও পরম সুন্দর দেহ একাধারে সুকুমার ও শক্তিদ্যোতক। নিখুঁত তাঁর মুখশ্রী। মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—যেন গ্রীক ভাস্করের গড়া আদর্শ পুরুষমূর্তি।

সেদিন গামার নগ্ন দেহও দেখলুম। যেমন বিরাট কবাট-বক্ষ, তেমনি পেশীবহুল বাহু, তেমনি বলিষ্ঠ ও অপূর্ব উরু। যেন মূর্তিমন্ত শক্তিমন্ত্র—তার চেয়ে বলীর মূর্তি কল্পনাতেও আনা যায় না।

হাসান বক্স যে একজন প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তা নইলে তিনিও গামাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতেন না এবং গামাও তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী হতেন না। হাসান বক্স ও গামার প্রতিযোগিতা একটা অত্যন্ত স্মরণীয় ও দর্শনীয় দৃশ্য বলেই সেদিন সেখানে অমন বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।

কিন্তু গামা হচ্ছেন গামা, তাঁকে বোঝাতে হলে অন্য কোন উপমা ব্যবহার করা চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর মল্ল তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুই-চার মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারেন নি।

হাসান বক্স তবু তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ যুঝলেন বটে, কিন্তু শেষ রাখতে পারলেন না। জয়ী হলেন গামাই।

সেই দিনই সেখানে দেখেছিলুম ভারতের আর এক অপরাজেয় মল্ল ইমান বক্সকে, যাঁর আসন গামার পরেই। অতি দীর্ঘ মূর্তি, অতি বলিষ্ঠ দেহ, হাতে প্রকাণ্ড একটি রূপোর গদা। তবু তাঁর দেহ উল্লেখযোগ্য নয় গামার মতো।

## যামিনী রায়

লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য থাকে, উচ্চশিক্ষিতদের দৃষ্টি প্রায়ই তার দিকে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একজন সত্যদ্রষ্টা কলাবিদ যখন সেই সব নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের ভিতর থেকেই অদৃষ্টপূর্ব সুষমা আবিষ্কার করে তুলে ধরেন সকলের চোখের সামনে, তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

নিরক্ষর গেঁয়ো কবির বাঁধা একটি গান শুনুন ঃ

'যা রে কোকিলা তুই,
আমার প্রাণপতি গেছে যে দেশে।
এমন করে জ্বালাতন
করিস্ নে আর নিত্যি এসে।
শুনে তোর কুহুস্বর
উসকে ওঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গাঙের পার,
তুই ছাড়্ গে তথা কুহুস্বর।'

এ হচ্ছে আকাটা হীরার মতো। শিক্ষিত কারিকর একেই মেজে ঘষে করে তুলতে পারেন অত্যন্ত অসাধারণ।

লোকসাহিত্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এবং তারপর লোকসঙ্গীতও যে কি বিচিত্র সৌন্দর্যের খনি, সুরকার রবীন্দ্রনাথ তারও উজ্জ্বল প্রমাণ দিতে বাকী রাখেন নি। আগে যে-সব সুর হেটো বা মেঠো বলে শিক্ষিতদের গানের বৈঠকে ঠাঁই পেত না, তিনি সেইগুলিকে এমন সুকৌশলে ব্যবহার করে জাতে তুলে নিয়েছেন যে, বিদ্বজ্জনদেরও মনের প্রত্যেক ভাব তারা ব্যক্ত করতে পারে অনায়াসেই। কেবল তাই নয়, মার্গসঙ্গীতের যে-সব রাগ-রাগিণী আগে নিজেদের কৌলিন্যগর্ব বজায় রাখবার জন্যে লোকসাধারণের পথ মাড়াতে রাজী হোত না, তিনি তাদেরই ধরে মেঠো ভাটিয়ালী ও বাউল প্রভৃতি চলতি সুরের সঙ্গে মিলিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে সৃষ্টি করে গিয়েছেন অপূর্ব সৌন্দর্যলোক।

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর বলেছেন, "Everything is Folk!" তাঁর মতে, ভারতের মতো লোকনৃত্যের বিপুল ভাণ্ডার পৃথিবীর আর কোথাও নেই। যথার্থ গুণীর হাতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে লোকনৃত্যও অনন্যসাধারণ হয়ে উচ্চশ্রেণীর রূপরসিকদেরও আনন্দ বিধান করতে পারে। উদয়শঙ্করের এই মত যে অভ্রান্ত, তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত গ্রাম্য উৎসব, ঘেসেড়া, ভীল, বিদায়ী ও রাসলীলা প্রভৃতি নৃত্য দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

দরিদ্ররা ধনপতি হলে পূর্ব-দারিদ্র্যের কথা ভুলে যায়, নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীর লোক বলে মনে করে। তাদের বংশধররা আবার আরো উঁচু ধাপে উঠে নিজেদের অভিজাত বলে ভাবতে থাকে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত তুলে দিতে চায়। সকল শ্রেণীর শিল্পই ছিল আগে লোকশিল্প। কবিতা, গান, নাচ ও ছবির জন্ম হয় লোকসাধারণের মধ্যেই। তারপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্ট ভুলে যায় নিজের শৈশবের কথা, লোকসাধারণের ধারণার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সগর্বে প্রচার করে—আমি অভিজ্ঞ, আমি বড়লোক, আমি ছোটলোকের খেলনা নই।

দশ হাজার বৎসর আগে ফ্রান্স ও স্পেন ছিল অসভ্য। কিন্তু তখনকার শিল্পীরা গিরিগুহার দেওয়ালে যে-সব ছবি এঁকে রেখেছিল বর্তমান যুগের মানুষরাও তা দেখে অবাক হয়ে যায়। তারপর যুগে যুগে চিত্রকলা যাত্রা করেছে বিভিন্ন পথে, নিজেকে আবদ্ধ করেছে নানা বিধিবিধানের বন্ধনে, আদিম স্বাভাবিকতা হারিয়ে হরেক রকম 'ইজম্'-এর দাসত্ব করে হতে চেয়েছে বিচিত্র, হতে চেয়েছে লোক-সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য।

কিন্তু আজও পৃথিবীর যেখানে অসভ্য জাতিরা আদিম মানুষদের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সেখানকার শিল্পীরা কাজ করে, ছবি আঁকে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার পদ্ধতিতেই। কাল হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার 'বুসম্যানরা' আধুনিক যুগের লোক। কিন্তু তাদের আঁকা ছবি দেখলে মনে পড়বে সেই দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদেরই কাজ—কি রেখায়, কি বর্ণে, কি পরিকল্পনায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের আধুনিক বংশধরদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথাই বলা যায়।

পাশ্চাত্য দেশের একাধিক অতি-আধুনিক শিল্পী ফিরে যেতে চাইলেন আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগের দিকে। ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, হোলম্যান হাণ্ট ও রোসেটি প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন চিত্রকরের দৃষ্টি ছিল যেমন রাফাএল প্রভৃতির পূর্ববর্তী যুগের দিকে, এঁরাও তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন দশ হাজার বৎসর আগেকার শিল্পীদের দ্বারা। তাই এঁদের হাতের কাজে খুঁজে পাওয়া যায় আদিম শিল্পের প্রভাব। হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সার্বজনীন হবে না এবং হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে না চলমান মেঘের ছায়ার মতো এই সাময়িক রেওয়াজ, তবু আদিম কালের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা যে আকৃষ্ট করেছে অতি-আধুনিকদেরও, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কেবল আদিম ছবি কেন, শিশুদের আঁকা যে সব ছবি দেখলে আগে আমাদের কাকের ছানা বকের ছানার কথা

স্মরণ হোত, তার ভিতরেও এঁরা পাচ্ছেন নূতন নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান।

আমাদের দেশেও প্রকাশ পাচ্ছে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি।

ছেলেবেলায় যখন গুরুজনদের সঙ্গে কালীঘাটে যেতুম এবং চিত্রকলার ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতুম না, তখন আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করত সেখানকার পটুয়ারা। তাদের কর্মশালার প্রান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী ও বিস্মিত চোখে নিরীক্ষণ করতুম পটুয়াদের হাতের কাজ। নিজের মনে তারা এঁকে যেত ছবির পর ছবি, কেমন নিশ্চিত হাতে রেখার পর রেখা টেনে, কত অবলীলাক্রমে। অধিকাংশই ছিল গার্হস্থ্য ছবি, লোকে হেলাভরে বলত কালীঘাটের পট। সেগুলিকে কেউ আর্টের নিদর্শন বলে গ্রহণ করত না এবং তাদের ক্রেতাও ছিল না শিক্ষিত ভদ্রলোকরা। কিন্তু আজ উচ্চশ্রেণীর রূপরসিকদের মুখেও তাদের প্রশংসা শোনা যায় এবং ঘটা করে কালীঘাটের পটের প্রদর্শনী খুললে তা দেখবার জন্যে মনীষীরাও আগ্রহ প্রকাশ করেন। আগে আমরা যাদের তাচ্ছিল্য করে 'পোটো' বলে ডাকতুম, আজ তাদের শিল্পী বলে স্বীকার করতেও আমরা নারাজ নই। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে বৈকি। আর তা বদলাচ্ছে বলেই আজ শিল্পী যামিনী রায় পেয়েছেন অসংখ্য সমঝদার।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি সহজে বা অকারণে বদলায় না, তা পরিবর্তিত হতে পারে প্রতিভার প্রভাবেই। অনেকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশে সচিত্র প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়ে আসছে, সেই সব পটের সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছিলেন সুপরিচিত। তাদের বিষয়বস্তু, তুলির লিখন এবং পরিকল্পনা কালীঘাটের পটের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত হলেও তা দেখে কারুর মনে জাগেনি কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সংস্কৃত ভাষারও চেয়ে সে-সব ছবির ভাষা ছিল অধিকতর মৃত। তা দেখে পরিতৃপ্ত হোত নয়নমন, ঐ পর্যন্ত। বাউল বা মেঠো সুর শুনেও আমাদের মন নাড়া পেয়েছে, কিন্তু তবু তাদের মুখনাড়া খেতে হয়েছে উপেক্ষণীয়

লোকসঙ্গীত বলে এবং বৈঠকী ওস্তাদরাও দিতেন না তাদের পাত্তা ; তাদের উচ্চাসনে তুলে পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার জন্যে দরকার হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মতো সরস্বতীর বরপুত্রকে।

বাংলাদেশে বড় বড় শিল্পীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রাচীন বাংলার ঘরোয়া পট রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করে যে বর্তমান কালেও যুগোপযোগী উচ্চশ্রেণীর কলাবস্তু প্রস্তুত করা যেতে পারে, এটা দেখবার মতো দৃষ্টিশক্তির অভাব ছিল যথেষ্ট। আমাদের শিল্পীরা যখন প্রতীচ্যের নানাবিধ "ইজম্"-এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, যামিনী রায় তখন রূপলক্ষ্মীর মূর্তি গঠনের জন্যে উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত হলেন গৌড় বাংলার নিজস্ব ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে। কিন্তু তিনিও একেবারে নিজের পথ কেটে নিতে পারেন নি। প্রথম প্রথম তিনিও এমন সব ছবি এঁকেছিলেন, যাদের ভিতর থেকে আবিষ্কার করা যায় পাশ্চাত্য প্রভাব, চৈনিক প্রভাব বা অন্য কোন প্রভাব। তারপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল কেন জানি না ; হয়তো বঙ্গকুললক্ষ্মী মাইকেলের মতো তাঁকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"

শিল্পী যামিনী রায়ের অপরূপ রেখাকাব্যগুলি বাংলার খাঁটি প্রাণ-পদার্থ দিয়ে গড়া। তার মধ্যে "বহু যুগের ওপার থেকে" ভেসে আসে সাবেক বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ এবং সেই সঙ্গে পাওয়া যায় হাল বাংলার পরিচিত প্রাণের ছন্দ। নব নব পরিকল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রসরূপের যে নির্মল আনন্দ, কোথাও কোন বিজাতীয় মনোবৃত্তির এতটুকু ছোঁয়া করতে পারে না তাকে পরিম্লান। নিশ্চিত হাতের টানে আঁকা চিত্রার্পিত ও লীলায়িত রেখার সমারোহের মধ্যে সর্বত্রই অনুভব করা যায় ভাবসাধক শিল্পীর মনের গভীর নিষ্ঠা। এই বিকৃত ও

অধঃপতিত অতিসভ্যতার যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও, নব্য বাংলার এক শিল্পী ঠাকুরঘরে ঢুকে ইষ্টদেবীর গঙ্গোদকে ধোয়া পূজাবেদীর শুচিশুভ্রতা এমনভাবে রক্ষা করতে পেরেছেন দেখে মনে জাগে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে পরম পুলক।

পথ ঠিক হয়ে গেল—সে পথের শেষ নেই। জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আর্ট অনন্ত। শিল্পী যামিনী রায় সাধনমার্গে অগ্রসর হলেন এবং এখনো অগ্রসর হচ্ছেন। হালে "মাসিক বসুমতী"তে তাঁর আঁকা "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ" নামে ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে। একটি মাত্র কঙ্কালসার মূর্তি বা অন্য কোন মর্মন্তুদ বীভৎস দৃশ্য নেই। অত্যন্ত সহজ প্রতীকের সাহায্যে নিরন্ন গৃহস্থবাড়ির অরন্ধনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুকাল আগে তাঁর চিত্রশালায় গিয়েছিলুম। দেখলুম তিনি এক অভিনব বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছেন।

স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিউবিস্টদের পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে কয়েকখানি ছবি এঁকেছেন। সেই সব ছবি দেখে বিখ্যাত রূপরসিক ডক্টর এইচ্‌ কজিন্স মতপ্রকাশ করেছিলেন, যে দেশে কিউবিজমের জন্ম সেই য়ুরোপের শিল্পীরাও তেমন চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন না। তার কারণ, গগনেন্দ্রনাথ নকলিয়ার কর্তব্য পালন করেন নি। প্রতিভাবান ভারতীয় শিল্পীর হাতে এসে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল য়ুরোপীয় পদ্ধতি।

কলকাতায় বড়দিনের মরসুমে চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। গত তিন চার বৎসরের প্রদর্শনী দেখে মনে ধারণা হয়, বাংলার অতি-আধুনিক চিত্রকলা ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। শিল্পীর পর শিল্পী পাশ্চাত্য সব 'ইজম্‌' নিয়ে প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তা পরিপাক করতে পারেন নি একেবারেই। ফলে সে-সব উদ্ভট ছবি পাশ্চাত্য 'ইজম্‌'-এর ব্যর্থ ও নিরর্থক অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে কোথাও তাদের ঠাঁই নেই।

এখন যামিনী রায়ের নূতন পরীক্ষার কথা বলি। য়ুরোপের মধ্যযুগের ধুরন্ধর চিত্রকররা খ্রীষ্টের জীবনীমূলক অজস্র ছবি এঁকেছেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কীয় সেই সব নরনারীর মূর্তিকে যামিনী রায় এঁকে দেখিয়েছেন বাংলার নিজস্ব পটরচনাপদ্ধতিতে। শিল্পী নকল বা প্রভাবের ধার ধারেন নি, দেখাতে চেয়েছেন দেশী পদ্ধতিতে বিদেশী মানুষদের। বাংলার পটশিল্পে খ্রীষ্টদেব ও মেরী মাতা! শিল্পী অসঙ্গতির মধ্যেই অন্বেষণ করেছেন সঙ্গতির ছন্দ। প্রাচীনকালে গান্ধারের ভারতীয় ভাস্কররাও বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়বার সময়ে এই রকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা গ্রীক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

যামিনী রায় একাধিকবার বাংলা রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পরিকল্পকের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তিনি বাংলার পটপদ্ধতি বর্জন করেন নি। বাংলার পট হচ্ছে প্রধানত আলঙ্কারিক আর্ট। তাই রঙ্গমঞ্চের উপরেও তার মধ্যে হয়নি ছন্দঃপাত।

শিল্পী যামিনী রায় আজ হয়েছেন যশস্বী। কেবল স্বদেশী বিদেশী বহু প্রখ্যাত রূপরসিকের অভিনন্দন নয়, লক্ষ্মীলাভও করেছেন। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত তাঁর যাত্রাপথ হয়নি কুসুমাস্তৃত। তাঁর রেখায় লেখা কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই তাঁর আর্ট হয় Abstract, তিনি প্রচার করতে চান অমূর্তকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বকথিত "বাঙলায় দুর্ভিক্ষ" ছবিখানির উল্লেখ করতে পারি। ওর মধ্যে চিন্তাশীলতা থাকতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ অমূর্ত শিল্প নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে প্রস্তুত নয়। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আমার বাড়িতে তাঁর আঁকা চিত্রাবলী দেখে সেগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমি সাধ্যমত তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই জন্যেই বহুকাল পর্যন্ত তিনি অর্থকর লোকপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি।

তিনি আমার দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁকে জানি ঘনিষ্ঠভাবেই। সময়ে সময়ে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে দারুণ অর্থকষ্ট। দারিদ্র্য অপমানকর নয় বটে, কিন্তু বহু শিল্পীর পক্ষেই মারাত্মক। শিল্পী যামিনী রায় বিনা অভিযোগে মৌনমুখে এই দারিদ্র্য-জ্বালা সহ্য করেছেন, তবু নিজের পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন লোকপ্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি, কলালক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েই পরিতুষ্ট ছিলেন। অবশেষে জয়লাভ করেছে প্রতিভাই। যে লক্ষ্মীদেবীর হাতে থাকে ঝাঁপি আর পায়ের তলায় থাকে পেচক, অবশেষে তাঁরও মুখ হয়েছে প্রসন্ন।

## শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি

কত ফুল মুকুলেই ঝরে পড়ে, আবার কত ফুল খানিক ফুটে উঠেও আর ভালো করে ফোটে না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে পরলোকে যাত্রা করতে হয়েছে বালকবয়স পার হয়েই—আঠারো উতরে উনিশে পা দিয়ে। এই বয়সেই তিনি নিজের জন্যে একটি নূতন পথ কেটে নিয়েছিলেন। কিন্তু দু'দিনেই ফুরিয়ে গেল তাঁর সেই পথে পদচারণ করবার মেয়াদ। আঠারো শতাব্দীতে আঠারো বৎসর বয়সে বিলাতের কবি চ্যাটারটন মারা পড়েন। ইংরেজরা এই অকালমৃত্যুর জন্য আজও দুঃখ প্রকাশ করে। সুকান্তের কথা মনে করলেই আমার চ্যাটারটনের কথা স্মরণ হয়।

উঠতি বয়সে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ও আমি স্বর্গীয় কুমুদনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে হামেশাই ওঠা-বসা করতুম। কাব্য-কাকলীর মধ্য দিয়ে কেটে যেত দীর্ঘকাল। কুমুদনাথ খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তাঁর স্বকীয়তা ছিল যথেষ্ট, কারুর দ্বারাই হন নি তিনি প্রভাবান্বিত। রবীন্দ্রনাথের দেখাদেখি আজকাল মিলহীন কবিতা লেখার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু কুমুদনাথ ছাড়া তাঁর সমসাময়িক কোন কবিই বেমিল

কবিতা-রচনা করতেন বলে মনে পড়ে না। এখানেও ছিল তাঁর নূতনত্ব। "বিল্বদল" নামে তাঁর রচিত একখানি কবিতার বইও সমালোচকদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন। লোকেও ভুলে গেল তাঁর কথা।

আবার এমন সব কবিরও নাম করতে পারি, উদীয়মান অবস্থায় অল্পবিস্তর যশ অর্জন করেই ছেড়ে দিয়েছেন যাঁরা কাব্যসাধনা। কেন যে ছেড়ে দিয়েছেন, তা ভালো করে বোঝা যায় না। হতে পারে, তাঁরা হয়তো কবিতা রচনা করতেন খেলাচ্ছলেই, ছিল না তাঁদের কবি হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিংবা হয়তো তাঁদের প্রেরণা ছিল স্বল্পজীবী। যেমন কোন কোন ছোট নদী গান গেয়ে জলবেণী দুলিয়ে খানিকদূর এগিয়ে হারিয়ে যায় ঊষর মরু-সিকতায়।

এমনি একজন কবি হচ্ছেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়। যাঁদের লেখার জোরে চলত "অর্চনা" পত্রিকা, তিনি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। গদ্যও লিখতেন, পদ্যও লিখতেন—যদিও কবিতার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি এবং কবিতা রচনা করে তিনি পাঠকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম "লয়"। একদিক দিয়ে নামটি সার্থক হয়েছে, কারণ তারপর ফণীন্দ্রনাথের আর কোন কাব্যপুঁথি বাজারে দেখা দেয় নি। তিনি আজও বিদ্যমান, কিন্তু কবিতার খাতায় আর কালির আঁচড় কাটেন না। তাঁর ছিল নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গি ও বক্তব্য, তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট সম্ভাবনা। তিনি ধনী না হলেও অর্থাভাবে কষ্ট পান নি, আজও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে নিশ্চিন্ত মনে সরকারী পেন্সন ভোগ করছেন। কেন তিনি কবিতাকে ত্যাগ করলেন? নিশ্চয়ই প্রেরণার অভাবে। শক্তির চেয়েও কার্যকরী হচ্ছে প্রেরণা।

তিনি লেখা ছেড়েছেন বটে, কিন্তু "অর্চনা"-দলের আরো কেউ কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কিনেছেন এবং আজও লেখনী ত্যাগ করেন নি। যেমন শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

( ফণীন্দ্রনাথের অনুজ )। আমিও "অর্চনা"-য় হাতমক্স করতুম—লিখতুম কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।

ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত আছে আমার জীবনস্মৃতির খানিকটা। প্রায় প্রত্যহই তাঁর বাড়িতে আমাদের একটা সাহিত্য-বৈঠক বসত এবং মাঝে মাঝে সেখানে এসে যোগ দিতেন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। খোশগল্পের সঙ্গে সঙ্গে চলত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। অক্ষয়কুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সতীর্থ ও কবিবর বিহারীলালের শিষ্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন"-এর লেখক। তাঁর মুখে শুনতে পেতুম সেকালকার সাহিত্যিকদের কথা। কোন কোন দিন ফণীন্দ্রনাথ হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন, আর আমি গাইতুম গান। সেই কাঁচা বয়সে জীবনে ছিল না কোন কাজেরই ঝুঁকি, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শুধু অকারণ পুলকেই গাইতে পারত প্রাণ ক্ষণিকের গান ক্ষণিক দিনের আলোকে। সেদিন আর ফিরে আসবে না; মানুষের জীবন, সাহিত্য ও চারুকলাও হয়েছে এখন বস্তুতন্ত্রী।

অনেকে অকালে ঝরে পড়েছেন এবং অনেকের প্রেরণা অল্প-দিনেই ফুরিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সময়ের কথা বললুম, বাংলা সাহিত্যের দরবারকে তখন মুখরিত করে তুলেছিল বহু কবির কলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি অগ্রজগণ বিরাজমান ছিলেন সগৌরবে। উদীয়মান কবিরূপে প্রশস্তি অর্জন করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি। কয়েকজন মহিলা কবিও তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন—যেমন কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী দাসী প্রভৃতি। 'মাইনর' কবিরূপে সুপরিচিত ছিলেন রমণীমোহন ঘোষ, বরদাচরণ মিত্র ও রসময় লাহা প্রভৃতি।

কাব্যজগৎ যখন সরগরম, তখন তাঁদের পরে দেখা দেন

শ্রীকালিদাস রায়। বহু পত্রিকার পাতা ওল্টালেই দেখতে পেতুম এই তিনজন কবির কবিতা—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীকালিদাস রায়।

আজকের পাঠকরা জীবেন্দ্রকুমারকে জানে না। তাঁর দেশ ছিল চট্টগ্রামে। কলকাতার সাহিত্য-পরিষদ ভবনে একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন পঙ্গু, পদযুগল ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যশ্রম ছিল অশ্রান্ত। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর রাশি রাশি রচনা পড়ুয়াদের সামনে এসে হাজির হোত। কাব্যকুঞ্জে বাস করেই বোধ হয় তিনি নিজের পঙ্গু দেহের দুঃখ ভুলতে চাইতেন। "নির্মাল্য" "তপোবন" ও "ধ্যানলোক" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি পরলোক গমন করেন।

কুমুদরঞ্জনও পাড়াগেঁয়ে কবি। বহুকাল আগে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম আমাদের "ভারতী"-র বৈঠকে। ছোটখাটো একহারা মানুষ, সাদাসিধে বেশভূষা ও কথাবার্তা, কোনরকম চাল নেই। গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক, নজরুল ইসলাম কিছুদিন তাঁর কাছে ছাত্রজীবন যাপন করেছিলেন। কুমুদরঞ্জনের বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে তিনি কবিজীবন শুরু করেছিলেন, আজও তা সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে। আগেও রচনা করতেন রাশি রাশি পদ্য এবং এখনো পত্রিকায় পত্রিকায় কবিতা পরিবেশন করেন ভুরি পরিমাণেই। তিনিই হচ্ছেন সত্যকার স্বভাবকবি। শহর থেকে নিরালা পল্লীপ্রকৃতির শ্যামসুন্দর স্নিগ্ধছায়ায় বসে আপন মনে গান গেয়ে যায় বনের পাখি, তিনি হচ্ছেন তারই মতো।

কালিদাসও গোড়ার দিকে দস্তুরমত কোমর বেঁধে নিযুক্ত হয়েছিলেন কবিতারচনাকার্যে এবং বেশ কিছুকাল ধরে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে গিয়েছিলেন কবিতার কারখানা। কিন্তু ইদানীং তিনি যেন উৎসাহ হারিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চান। সম্পাদকের তাগিদে

কখনো-কখনো রচনা করেন দুই একটি কবিতা। কুমুদরঞ্জনের মতো কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও সত্তর বৎসর বয়সেও বিনা তাগিদে পরম উৎসাহে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু করুণানিধান ও কালিদাস ষাট পার হবার আগেই কবিতার সঙ্গে করে এসেছেন দুয়োরানীর মতো ব্যবহার। করুণানিধান তো লেখনী ত্যাগ করেই বসে আছেন। কয়েক বৎসর আগে আমি যখন "ছন্দা" পত্রিকার সম্পাদক, করুণানিধানের কাছ থেকে একটি কবিতা প্রার্থনা করি। তিনি পত্রোত্তরে জানালেন, কবিতা-টবিতা তাঁর আর আসে না।

কালিদাস কিন্তু একেবারে কলম ছাড়েন নি। মাঝে মাঝে অস্বল্প পদ্য এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় গদ্য রচনা নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। তিনি নাকি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন, যা আমার চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাহিত্যনিবন্ধগুলি আমি পড়ে দেখেছি। সেগুলি সুখপাঠ্য রচনা।

তিনি নিজেও শিক্ষাব্রতী। স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখে অর্থ পাওয়া যায়, জীবনধারণের জন্যে যা অত্যন্ত দরকার। কবিতা যশ দিতে পারে, কিন্তু বিত্ত দেবার শক্তি থেকে সে বঞ্চিত। সংসারী হয়ে জীবনের উত্তরার্ধে এই সত্যটা উপলব্ধি করেই হয়তো কবিতার ঝোঁক কমে গিয়েছে কালিদাসের।

হয় "যমুনা", নয় "মর্মবাণী" কার্যালয়ে বসে আমি একদিন কবি করুণানিধানের সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলুম। এমন সময়ে একটি যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোহারা চেহারা, মুখখানি হাসি-হাসি, কিন্তু সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তার ঘনকৃষ্ণ বর্ণের দিকে। তিনি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে করুণানিধানকে প্রণাম করলেন।

করুণানিধান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি কবি কালিদাস রায়।"

মনে মনে ভাবলুম, পুত্রের বর্ণ দেখেই পিতা বোধ হয় নামকরণ

করেছিলেন, অনেকের মতো কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলে মনকে দিতে চান নি প্রবোধ।

তারপর জেনেছিলুম কালিদাস কালো চামড়ার তলায় ঢেকে রেখেছেন নিজের পরম শুভ্র ও শুদ্ধ চিত্তটিকে। দলাদলির ধার ধারেন না, বড় বড় সাহিত্যবৈঠকেও তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জনতা থেকে দূরে একান্তে থাকতেই ভালোবাসতেন। প্রাণ খুলে সমসাময়িকদের প্রশংসা করতে পারেন। যখন আমার "যৌবনের গান" নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হোত না বললেই চলে এবং এখনো তাঁর দেখা পাই কালেভদ্রে এখানে ওখানে। হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম, এক-খানি পত্রিকায় "যৌবনের গান"-এর উপরে কালিদাসের লেখা একটি প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

কালিদাস কবিতার বই প্রকাশ করেছেন অনেকগুলি—যেমন "কুন্দ", "পর্ণপুট", "বল্লরী", "রসকদম্ব", "ব্রজবেণু", "লাজাঞ্জলি", "ঋতুমঙ্গল" ও "ক্ষুদকুঁড়া" প্রভৃতি। যখন কাশিমবাজারের স্কুলে পড়তেন, পদ্য লেখা শুরু করেছিলেন তখন থেকেই। মাসিক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করবার আগে সভায় প্রথম যে কবিতা পাঠ করেন, তার মধ্যে ছিল মদ্য ও মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ। আজও তাঁকে 'পিউরিট্যান' কবি বলে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি হবে না। স্কুলের চেয়ারে বসে হয়েছেন পাকা মাস্টারমশাই—ছেলেদের দেন হিতোপদেশ। বাড়িতে ফিরে কবির আসনে আসীন হয়েও তিনি লেখেন না আর প্রেমের কবিতা। তিনি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর ভক্ত এবং নিজেও পরম বৈষ্ণব। অথচ বৈষ্ণব কবিরা হচ্ছেন প্রধানত প্রেমের কবিই, এটা দেখেও প্রেমকে তিনি 'বয়কট' করে বসে আছেন।

মাথার চুল পাকলে কেউ যে প্রেমের কবিতা লেখে, এটাও তিনি পছন্দ করেন না। আমি তখন পঞ্চাশ পার হয়েছি। আমার এক

সাহিত্যিক বন্ধু এসে বললেন, "কবি কালিদাস রায় অভিযোগ করছিলেন, এ বয়সে হেমেন্দ্র প্রেমের কবিতা লেখে কেন ?"

উত্তরে আমি বললুম, "পঞ্চাশোর্ধ্বেও মনে বনে যাবার ইচ্ছা জাগেনি, তাই।"

তার পরেও তো কেটে গিয়েছে এক যুগ। এই সেদিনও "মাসিক বসুমতী"-তে লিখেছি কয়েকটি প্রেমের কবিতা। কবির দেহ নিশ্চয়ই বয়োধর্মের অধীন কিন্তু কবির মনের কি বয়স আছে ? সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বয়সেও লিখেছেন প্রেমের কবিতা, প্রেমের গান, প্রেমের গল্প। তাঁর একটি কবিতার খানিকটা তুলে দিলুম ঃ

"ওরে কবি সন্ধ্যা হয়ে এল,
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক।
ব'সে ব'সে ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে
শুনতেছ কি পরকালের ডাক ?
কবি কহে, সন্ধ্যা হ'ল বটে,
শুন্‌ছি ব'সে ল'য়ে শ্রান্তদেহ
এ পারে ঐ পল্লী হ'তে যদি
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ !
যদি হেথায় বকুলবনচ্ছায়ে
মিলন ঘটে তরুণ-তরুণীতে,
দুটি আঁখির 'পরে দুইটি আঁখি,
মিলিতে চায় দুরন্ত সঙ্গীতে ;—
কে তাহাদের মনের কথা ল'য়ে
বীণার তারে তুলবে প্রতিধ্বনি,
আমি যদি ভবের কূলে ব'সে
পরকালের ভালোমন্দই গণি !"

বোধ হয় স্কুলমাস্টারী করলে মানুষের মন বুড়িয়ে যায়

তাড়াতাড়ি। কয়েক বৎসর আগে টালিগঞ্জে কালিদাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সদরে বাড়ির নাম লেখা রয়েছে—"সন্ধ্যার কুলায়"। বাড়ির নামেও জীবনসন্ধ্যার ইঙ্গিত! কবির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আসন্ন অন্ধকারে তিনি শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের নীড় বেঁধে নিয়েছেন। কবির পক্ষে এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

কালিদাসকে ভালোবাসি, কিন্তু আজকের কালিদাসকে আমার পছন্দ হয় না। ভাবতে ভালো লাগে সেদিনকার কালিদাসের কথা, যেদিন তিনি কবিতা শুরু করেছিলেন এই বলে—"নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" স্মরণ আছে, কবিতাটি মন্ত্রশক্তির মতো পাঠকদের কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কবিতাটি ফিরত লোকের মুখে মুখে, তা মুখস্ত করে ফেলেছিল বালক-বালিকারা পর্যন্ত।

স্মরণ আছে, কবিতাটির খ্যাতি দেখে কোন কোন সাহিত্যিকের মনে হয়েছিল হিংসার উদ্রেক। অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পুরাতন সাহিত্য হাতড়ে তাঁরা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন, এ কবিতাটি হচ্ছে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত! আসলে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

কালিদাসের পরে আর একজন সুকবি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেন শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং ঠিক তাঁর পরেই ধূমকেতুর মতো আত্মপ্রকাশ করেন নজরুল ইসলাম।

একদিন নাট্য-নিকেতনে ( এখন 'শ্রীরঙ্গম্' ) বসে অভিনয় দেখছি। আমার পাশেই ঠিক পাশাপাশি আসন গ্রহণ করেছেন নাট্যকার শ্রীমন্মথনাথ রায় ও কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন।

এমন সময়ে নজরুলের আবির্ভাব।

এসেই তিনি সচীৎকারে বলে উঠলেন, "আরে, এ কি তাজ্জব ব্যাপার! রঙ্গালয়ে মন্মথের পাশে সাবিত্রী! হলো কি?"

সত্যই তো, সাবিত্রীর সঙ্গে মন্মথ—এমন কথা মহাভারতেও লেখে না। সেখানে যাঁরা ছিলেন, সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এমনি ভাবে লোককে হাসাতে পারতেন নজরুল। কিন্তু আজ তাঁর নিজের হাসবার এবং অন্যকে হাসাবার পালা ফুরিয়ে গিয়েছে। ভেবে দুঃখ পাই।

## যতীন্দ্র গুহ ( গোবরবাবু )

স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন ধনী ও সুরসিক ব্যক্তি। তাঁর বসতবাড়ি ছিল মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে পূর্বদিকের প্রায় শেষ প্রান্তে। সেইখানে প্রায়ই—বিশেষ করে প্রতি শনিবারে হোত বন্ধু-সম্মিলন। যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন নবীন ও উদীয়মান ব্যারিস্টার। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরও অভাব ছিল না। নরেনবাবুর সাহিত্যবোধও ছিল, তাই একাধিক সাহিত্যিকও যেতেন তাঁর বৈঠকে। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছি আমি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়েছিল নরেনবাবুরই অর্থানুকূল্যে।

একদিন সেই বৈঠকে গিয়ে দেখলুম এক অসাধারণ মূর্তি। বিপুলবপু—যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। দেখলেই বোঝা যায়, বিষম জোয়ান তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে অমিত-শক্তির প্রত্যেকটি লক্ষণ। বাঙালীদের মধ্যে তেমন চেহারা দুর্লভ।

জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তিনি হচ্ছেন নরেনবাবুর আত্মীয় পালোয়ান গোবরবাবু।

গোবরবাবু! তার আগেই তাঁর নাম এর-তার মুখে কিছু কিছু শুনতে পেতুম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কিছুই নয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষের অভাব সেখানে লোকে মস্ত বলে ধরে নেয় এরণ্ডকেই। কবি বলেছেন, "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব।" এদেশে তখন কেউ

আখড়ায় গিয়ে মাসকয়েক কুস্তি লড়লেই পালোয়ান বলে নাম কিনে ফেলত। কিন্তু গোবরবাবু যখন তরুণ (প্রায় বালক) বয়সে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান, তখন তিনি সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লদের সগর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁর কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল "প্রবাসী" পত্রিকায়।

প্রথমে তাঁর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করে স্কটল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর ক্যাম্পবেল। তাকে হার মানতে হলো গোবরবাবুর কাছে। তারপর তাঁর সঙ্গে লড়তে আসে জিমি ইসেন। বেজায় তার খাতির, কারণ সে ছিল সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন—অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুর মল্ল। ইংরেজরা মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছিল যে, এই ছোকরা কালা আদমি তাদের সেরা পালোয়ানের পাল্লায় পড়ে নাস্তানাবুদ ও হেরে ভূত হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ালো অন্যরকম। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পরেই ইসেন বুঝতে পারলে, গোবরবাবুর কাছে সে নিজেই ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ছে। তখন নাচার হয়ে অন্যায় উপায়ের দ্বারা নিজের মান বাঁচাবার জন্যে সে কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের প্যাঁচ কষলে—অর্থাৎ গোবরবাবুকে করলে মুষ্ট্যাঘাত। কিন্তু নাছোড়বান্দা গোবরবাবু কুস্তির প্যাঁচেই তাকে করলেন কুপোকাত। "দুর্বল" বলে কীর্তিত বাঙালীর ছেলে হলো ইংলণ্ডের সর্বজয়ী মল্ল!

"প্রবাসী" পত্রিকায় এই অভাবিত "রোমান্সের" কাহিনী পাঠ করবার পর থেকেই আমি হয়ে পড়েছিলুম গোবরবাবুর একান্ত ভক্ত। সাহিত্যে ও ললিতকলায় কোনদিনই বাঙালীর সাধুবাদের অভাব হয় নি। কিন্তু মল্লযুদ্ধেও বাঙালী যে বলদর্পিত ইংরেজদের গর্ব খর্ব করতে পারবে, সেদিন পর্যন্ত এটা ছিল একেবারেই কল্পনাতীত। কিন্তু তখনও আমাদের মন ছিল এমন চেতনাহীন যে বৃটিশ-সিংহের ঘরে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করে প্রথম বাঙালীর ছেলে যেদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেদিন পুষ্পমাল্য, পতাকা নিয়ে

তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করবার কথা কারুর মনেই উদয় হয় নি। বোধ হয় আমরা ভাবতুম, পালোয়ান উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলেই গণ্য হতে পারে না। আজও কি জাগ্রত হয়েছে আমাদের চেতনা? কত দিকে কত সফরী স্বল্পজলে লাফঝাঁপ মেরে এখানে জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার প্রথম দিগ্বিজয়ী বাঙালী যোদ্ধাকে তাঁর স্বদেশ আজ পর্যন্ত দিয়েছে কি কোন অভিনন্দন?

নরেনবাবুর মজলিসে জাতির গৌরব এই বঙ্গবীরকে সামনা-সামনি পেয়ে আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

একটা কথা ভেবে প্রায়ই আমার মনে জাগে বিস্ময়। স্বাধীন ভারতের হামবড়া কর্তাব্যক্তিরা আজ বাঙালীকে কাবু ও কোণঠাসা করবার জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল এই সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভারতের অন্য কোন দেশের লোকই বাঙালীকে দু-চোখে দেখতে পারে না। অথচ এই বাঙালী জাতিই উচ্চতর অধিকাংশ বিভাগে সর্বপ্রথমে আধুনিক ভারতের মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করেছে। বাগ্মিতার জন্যে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথমে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। আর্য-ধর্মপ্রচারের দ্বারা ভারতের দিকে পৃথিবীর দৃষ্টি সর্বপ্রথমে আকৃষ্ট করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক বলে সর্বপ্রথম খ্যাতিলাভ করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ভারতীয় আধুনিক কাব্য যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে, নোবেল পুরস্কার লাভ করে তা সর্বপ্রথম প্রমাণিত করেছেন বঙ্গসাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাচ্য চিত্রকলাপদ্ধতি প্রবর্তিত করে আধুনিক ভারত-শিল্পকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বপ্রথমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় অভিনেতৃ সম্প্রদায় নিয়ে সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্য দেশে দেখা দিয়েছেন নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। ভারতীয় নৃত্যকলাকে নবজন্ম দিয়ে প্রতীচ্যকে অভিভূত করেছেন

সর্বপ্রথমে নটনম্বুর শ্রীউদয়শঙ্কর এবং ভারতবর্ষ যে অধৃষ্য মল্লের দেশ, এ-সত্য য়ুরোপের চোখে আঙুল দিয়ে সর্বাগ্রে দেখিয়েছিলেন গোবরবাবু ও শ্রীশরৎকুমার মিত্র; কারণ তাঁরাই গামা, ইমামবক্স, গামু ও আহম্মদ বক্স প্রভৃতিকে সঙ্গে করে সর্বপ্রথমে নিয়ে গিয়েছিলেন য়ুরোপে। এর আগেও আরও দুইজন ভারতীয় পালোয়ান অবশ্য য়ুরোপে গিয়েছিলেন। প্রথম হচ্ছেন প্রাচীন ভুটান সিং; কিন্তু যুবক হেকেনস্মিথের কাছে তিনি পরাজিত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন গোলাম, ভারতে আজ পর্যন্ত যাঁর নাম অতুলনীয় হয়ে আছে। কিন্তু তুর্কী পালোয়ান আহম্মদ মদ্রালীর কাছে হার মানতে হয়েছিল তাঁকেও। কিন্তু গামা ও ইমামবক্স য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের অনায়াসেই ভূমিসাৎ করে অজেয় নাম কিনে দেশে ফিরে আসেন। সেই-ই প্রথম য়ুরোপে ভারতীয় পালোয়ানদের জয়যাত্রার সূত্রপাত।

মল্লযুদ্ধের দিকে গোবরবাবুর প্রবৃত্তি হয়েছিল সহজাতসংস্কারের জন্যেই। বাংলাদেশে এই পুরুষোচিত ক্রীড়ার চর্চা চলে আসছে তাঁদের পরিবারে বহুকাল থেকেই। তাঁর পিতামহ অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু প্রভূত অর্থের মালিক হয়েও সাধারণ নিষ্কর্মা ধনীদের মতো কমলবিলাসীর জীবনযাপন করতেন না। মুক্তকচ্ছ হয়ে বৈষ্ণবী মায়া নিয়ে তাঁরা মেতে থাকেননি, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে তাঁরা হয়েছিলেন বীরাচারী শক্তিসাধক। বাড়িতেই ছিল তাঁদের বিখ্যাত কুস্তির আস্তানা, সেখানকার মাটি গায়ে মাখেননি, ভারতের প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। এবং অম্বুবাবু ও ক্ষেতুবাবু নিজেরাও ছিলেন প্রখ্যাত কুস্তিগীর, তাদের নাম ফিরত লোকের মুখে মুখে। কেবল বাংলাদেশে নয়, বাংলার বাইরেও। গোবরবাবুর পিতৃদেবকেও আমি দেখেছি। তিনিও কুস্তি লড়তেন কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু খুব সম্ভব লড়তেন। কারণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিনিও ছিলেন বিশালকায়। এমন বলী বংশে জন্মগ্রহণ করলে যোদ্ধা না হওয়াই অস্বাভাবিক।

ধীরে ধীরে গোবরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ জমে উঠতে লাগল। এবং ধীরে ধীরে আমার সামনে খুলে যেতে লাগল তাঁর প্রকৃতির নূতন নূতন দিক। সাধারণত লোকের বিশ্বাস, পালোয়ানরা কেবল কুস্তি লড়ে, মুগুর ভাঁজে ও ডন-বৈঠক দেয় এবং অবসরকালে ভোম হয়ে থাকে ভাঙের নেশায়। জানি না গোবরবাবু বাঙালী বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছে কিনা, কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝলুম, পালোয়ানকুলেও প্রহ্লাদ জন্মায়।

নরেনবাবুর বাড়িতে কেবল গালগল্পের মজলিস বসত না। প্রতি শনিবারে সেখানে নাতিবৃহৎ মাইফেলের আয়োজন হোত এবং প্রতি শনিবারের সন্ধ্যায় কেবল নামজাদা স্থানীয় শিল্পীরা নন, বাংলার বাইরেকার ভারতবিখ্যাত গাইয়ে-বাজিয়েও এসে আসরে আসীন হতেন। এমন দিন ছিল না, গোবরবাবু যেদিন সেখানে হাজিরা না দিতেন। কেবল হাজিরা দেওয়া নয়, তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যেত, সঙ্গীতসুধা পান করছেন তিনি প্রাণ-মন-কান ভরে। সস্তায় সমঝদার সাজবার জন্যে থেকে থেকে বাঁধা বুলি কপচে উঠতেন না, চুপ করে বসে বসে উপভোগ করতেন গানবাজনা। পরে শুনলুম তিনি নিজেও সঙ্গীতশিল্পী, তাঁকে তালিম দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ব্যাঞ্জোবাদক স্বর্গীয় ককুভ খাঁ।

ক্রমে গোবরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো আরো ঘনিষ্ঠ। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনাও হতে লাগল। বুঝলুম পালোয়ানি প্যাঁচের মধ্যে পড়ে তাঁর মস্তিষ্ক আড়ষ্ট হয়ে যায় নি, তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ আছে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুললেও তাঁর মুখ বন্ধ হয় না, স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধেও খবরাখবর রাখবার জন্যে তাঁর আগ্রহের অভাব নেই।

তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বসতুম গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায়। আর-একজন সাহিত্যিক সেখানে শিকড় গেড়ে বসলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। গালগল্প হোত, খেলাধূলার আলোচনা হোত,

দুনিয়ার বিখ্যাত বলবান ব্যক্তিদের কথা হোত, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া হোত না। সেখানে আরো যে-সব ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গোবরবাবুর আখড়ার শিক্ষার্থী পালোয়ান এবং মাঝে মাঝে আসরাসীন হতেন বিখ্যাত ভীম ভবানীও। উচ্চতর আলোচনা পরিপাক করবার শক্তি তাঁদের ছিল না বটে, তবে তাঁরা চুপচাপ বসে বসে শুনতেন আমাদের কথোপকথন। এর আগেই বলেছি, ভীম ভবানী এক সময়ে বিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়ে শক্তিচর্চা নিয়ে মেতে ওঠেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যদি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অল্পবিস্তর অবহিত হতেন, তাহলে সিদ্ধির পথে নিশ্চয়ই হতে পারতেন অধিকতর অগ্রসর।

দেহে ও মনে সমানভাবে শিক্ষিত যোদ্ধারা যে কতদূর অগ্রসর হতে পারেন, আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জেনে টুনির কথা স্মরণ করলেই সে-সত্য উপলব্ধি করা যায়। উচ্চশিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে টুনি ছিলেন বিদ্বজ্জনদেরই একজন, অথচ মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন আট নয় বৎসরকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার মাত্র হেরে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা হ্যারি গ্রেবের কাছে। কিন্তু তারপরেই তাঁকে উপর-উপরি তিনবার হারিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। টুনি যে বৎসর মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করেন, সেই বৎসরেই ( ১৯১৯ খ্রীঃ ) জ্যাক ডেম্প্‌সি "পৃথিবীজয়ী" উপাধি লাভ করেন। তারপর থেকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আর রইল না। একজন মাত্র মুষ্টিযোদ্ধাকে তাঁর সমকক্ষ বলে সকলে মনে করত, তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সের জর্জেস কার্পেনটিয়ার। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেম্প্‌সি তাঁকেও মাত্র চার রাউণ্ডে হারিয়ে দিলেন। তারই তিন বৎসর পরে টুনিও হারিয়ে দিলেন কার্পেনটিয়ারকে এবং ডেম্প্‌সিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের জগতে ডেম্প্‌সি তখন বিরাজ করছেন নেপোলিয়নের মতো, তাঁর নাগাল ধরবার জন্যে টুনিকে যথেষ্ট

বেগ পেতে হয়। অবশেষে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে টুনির সঙ্গে ডেম্প্‌সির শক্তিপরীক্ষা হয় এবং দশ রাউণ্ডের মধ্যে ডেম্প্‌সি হেরে যান। "পৃথিবীজেতা" উপাধি হারিয়ে পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্যে পর বৎসরেই ডেম্প্‌সি আবার টুনির সঙ্গে মুখোমুখি হন এবং আবার হেরে যান। ডেম্প্‌সির পতনের পর টুনি হলেন পৃথিবীজেতা মুষ্টিযোদ্ধা ও বিপুল বিত্তের অধিকারী, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করলেন চিরবিদায়। বললেন, "আমি হাতে বক্সিং-এর দস্তানা পরেছিলুম কেবল টাকা রোজগারের জন্যে। আমার সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, আর লড়াই নয়, এবার থেকে লেখাপড়া নিয়ে আমি কাল কাটাতে চাই।" আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, টুনি হচ্ছেন একমাত্র "হেভি-ওয়েট" যোদ্ধা, পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করবার পরেও যিনি অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিদায় নিতে পেরেছিলেন। আর সবাই অতিরিক্ত টাকার লোভে যৌবনসীমা পেরিয়েও বার বার লড়াই করেছেন এবং অবশেষে মান ও উপাধি হারিয়ে সরে পড়েছেন চোখের আড়ালে। টুনি ছিলেন বিদ্বান, এ ভ্রম তিনি করেননি। এখন তাঁর বয়স তিপান্ন বৎসর চলছে এবং মুষ্টিযুদ্ধের আসর থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই। কেবল টুনি নন, আমেরিকার আরো কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধা উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বকালেই অতুলনীয় জ্যাক জনসন। শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে কোন-দিনই হারাতে পারতো কিনা কে জানে, কিন্তু "পৃথিবীজেতা" উপাধি ত্যাগ না করলে পাছে তাঁকে শ্বেত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়, সেই ভয়ে জ্যাক জনসন দায়ে পড়ে জেস উইলার্ড নামে এক নিকৃষ্ট যোদ্ধার কাছে যেচে হার মানতে বাধ্য হন।

জনসন জাতে নিগ্রো এবং পেশায় মুষ্টিযোদ্ধা বটে, কিন্তু তাঁকেও অন্তত বিদ্বৎকল্প বলা যেতে পারে। কারণ সাংবাদিকরা যখনই তাঁর কাছে গিয়েছেন তখন প্রায়ই তাঁর মুখে শুনেছেন দর্শনশাস্ত্রের

কথা। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর পালোয়ানদের মধ্যে গোবরবাবু ছাড়া আর কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন বলে জানি না। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ দুই পালোয়ানই ( গামা ও ইমাম ) নিরক্ষর।

গোবরবাবু যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গিয়ে শ্বেতদ্বীপ জয় করেন, তখন মরিস ডিরিয়াজ নামে একজন প্রথম শ্রেণীর পালোয়ান প্যারিস শহরে একটি মস্ত দঙ্গলের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখানে কুস্তি লড়েছিলেন বহু শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান। গোবরবাবুও সেই দঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত সেটা ১৯১২ কি ১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। জ্যাক জনসন তখন শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডাদের অত্যাচারে আমেরিকা ছেড়ে প্যারিসে পালিয়ে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে গোবরবাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

কেবল কুস্তির কৌশল নয়, পালোয়ানদের দৈহিক শক্তির উপরেও যথেষ্ট নির্ভর করতে হয়। গায়ের জোরে স্যাণ্ডো যে গামার চেয়ে বলবান ছিলেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। গোবরবাবুও একজন মহাবলী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর মুখে মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক জনসনের সহ্যক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির যে বর্ণনা শুনেছি, তা চমকপ্রদ ও বিস্ময়জনক।

বক্সারদের মুষ্টি আর ভারতীয় পালোয়ানদের "রদ্দা", এ দুই-ই হচ্ছে ভয়াবহ ব্যাপার। যাদের অভ্যাস নেই, মহাবলবান হলেও বড় পালোয়ানের হাতের এক রদ্দা খেলে তারা মাটির উপরে আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু জ্যাক জনসন একদিন শখ করে গোবরবাবুকে তাঁর ঘাড়ের উপরে রদ্দা মরবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। গোবরবাবু তাঁকে বিশ-পঁচিশবার রদ্দা মারেন সজোরে, কিন্তু জনসন একটুও কাতর না হয়ে হাসিমুখে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন।

তারপর জনসন একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে গিয়ে গোবরবাবুকে বলেন, "এইবারে আমাকে ঘুষি মারো দেখি।" কিন্তু এমনি তাঁর

ক্ষিপ্রকারিতা ও পাঁয়তারার কায়দা যে, বহু চেষ্টার পরেও গোবরবাবু জনসনের দেহ স্পর্শ করতেও পারেননি।

গোবরবাবুর বৈঠকখানায় আমরা বেশ কিছুকাল সানন্দে কাটিয়ে দিয়েছিলুম। সন্ধ্যার পর প্রায়ই সেখানে আসতেন অদ্বিতীয় সরদ-বাদক স্বর্গীয় ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, স্বর্গীয় ওস্তাদ গায়ক জমীরুদ্দিন খাঁ, প্রসিদ্ধ তবলাবাদক স্বর্গীয় দর্শন সিং ও গায়ক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি শিল্পীগণ। গুণীরা বইয়ে দিতেন সুরের সুরধুনী এবং লীলায়িত হয়ে উঠত আমাদের মন তারই ছন্দে ছন্দে। এক-একদিন আমাদের সৌন্দর্যের স্বপ্নভগ্ন হোত প্রায় ভোরের বিহঙ্গকাকলির সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর গোবরবাবুর আবার দীর্ঘকালের জন্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গেলেন আমেরিকার দিকে।

## ইয়াঙ্কিস্থানে বাঙালী মল্ল

অনেক সময় কেবল কৌশলেই প্রতিপক্ষকে কুপোকাৎ করা যায়। আমি এমন লাঠিয়াল দেখেছি, যার ক্ষুদে একহারা চেহারা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তার সামনে অতিকায়, মহাবলবান ব্যক্তিও লাঠি হাতে করে দাঁড়াতে পারে নি।

কুস্তিতেও প্রতিপক্ষকে কাবু করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে, প্যাঁচ। কাল্লু পালোয়ানের কাছে কিক্কর সিং হেরে গিয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। অথচ কেবল শারীরিক শক্তির উপরেই যদি কুস্তির হারজিত নির্ভর করত, তাহলে কাল্লুর সাধ্যও ছিল না কিক্করকে হারিয়ে দেবার। কারণ কিক্কর যে কাল্লুর চেয়ে ঢের বেশি জোয়ান ছিলেন এ-বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে আর একটি কথা। ইতিপূর্বেই গামা

বনান হাসান বক্সের কুস্তির কথা বর্ণনা করছি। জয়লাভের পর গামা যখন বিজয়গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে একটি মস্ত রুপোর গদা কাঁধে করে আখড়ার চারিদিক পরিক্রমণ করছেন, তখন দর্শকদের আসন থেকে হঠাৎ এক জাপানী ভদ্রলোক উঠে এসে গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। সবাই তো রীতিমত অবাক, কারণ গামার সঙ্গে জাপানীটির চেহারা দেখাচ্ছিল বালখিল্যের মতোই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু জাপানীটি ছিলেন যুযুৎসু যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ। বললেন, গামা যদি জামা-কাপড় পরে আসেন তাহলে তিনি তখনি তাঁর সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গামা হচ্ছেন কুস্তির খলিফা, যুযুৎসুর প্যাঁচ তাঁর অজানা, কাজেই জাপানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অথচ গামা কেবল প্যাঁচের জোরে লড়েন না, তাঁর দেহেও আছে প্রচণ্ড শক্তি। এমন কথাও জানি, গামা তাঁরও চেয়ে আকারে ঢের বড় ও ভারী ওজনের বিখ্যাত পালোয়ানকে পিঠে নিয়ে সিধে হয়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

গোবরবাবুও একজন মহাশক্তিধর। বহুকাল আগে বিডন রো নামক রাস্তায় তাঁর যে আখড়া ছিল, সেখানে আমি মাঝে মাঝে কুস্তি লড়া দেখতে যেতুম। সেই আখড়ায় দেখেছিলুম আমি ভীষণ এক মুগুর। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি গুরুভার—ওজনে হবে কয়েক মণ। ভেবেছিলুম সেটা সেখানে রক্ষিত আছে হয়তো কেবল শোভাবর্ধনের জন্যই, কারণ তেমন মুগুর নিয়ে কেউ যে ব্যায়াম করতে পারে, আমার কাছে তা সম্ভবপর বলে মনে হয় নি। কিন্তু পরে শুনলুম ব্যায়ামের সময়ে গোবরবাবু সেই মুগুর ব্যবহার করেছেন।

সেখানে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল। মস্ত বড় একটি পাথরের হাঁসুলি। তারও ওজন বোধ করি দেড় মণের কম হবে না। শুনলুম সেই হাঁসুলি গলায় পরে গোবরবাবু দেন ডন-বৈঠক। পুরাতন "প্রবাসী" পত্রিকায় হাঁসুলি-পরা গোবরবাবুর একখানি ছবিও প্রকাশিত হয়েছিল।

গোবরবাবুর বৈঠকখানার আনন্দ-আসর উঠে গেল, কারণ প্রধান বৈঠকধারী পাড়ি দিতে চললেন মহাসাগরের ওপারে। তেমন জমাট আসর ভেঙে যাওয়াতে মন একটু খুঁতখুত করেছিল বটে কিন্তু বন্ধুবর সিন্ধুপারে যাচ্ছেন শ্বেতাঙ্গদলনে, এটা ভেবে মনের সে-খুঁতখুতনি সেরে যেতে দেরি লাগল না।

অতঃপর বাঙালী পাঠকদের অবগতির জন্যে পাশ্চাত্য দেশের মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে দুই-চার কথা বলা দরকার মনে করছি, কারণ তার সঙ্গে ভারতীয় মল্লযুদ্ধের পার্থক্য আছে অল্পবিস্তর। এ-দেশে অনেক সময়ে হাল্কা ওজনের পালোয়ানের সঙ্গে ভারী ওজনের পালোয়ানের প্রতিযোগিতা হয় এবং কোনক্রমে প্রতিপক্ষকে একবার চিত করে দিতে পারলেই লড়াই ফতে হয়ে যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের আইন-কানুন আলাদা।

সেখানে কুস্তি হয় প্রায় সমান ওজনের পালোয়ানদের মধ্যে। ওজন অনুসারে পালোয়ানদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়, যেমন হেভিওয়েট, লাইট হেভিওয়েট, মিডল ওয়েট, ওয়েল্টার ওয়েট ও লাইট ওয়েট প্রভৃতি। বক্সিংয়ের মতো কুস্তিতেও সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় গুরুভার বা হেভিওয়েট পালোয়ানদের।

গুরুভার পালোয়ানদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন টম কোর্নস, জ্যাক কারকিক, ইডান লিউইস, য়ুসুফ ( তুর্কী ), জর্জ হেকেনস্মিথ, ফ্রাঙ্ক গচ ( অজেয় অবস্থাতেই কুস্তি ছেড়ে দেন ), জো স্টেচার, আর্ল ক্যাডক, স্টানিসলস বিস্কো, টম জেঙ্কিন্স ও ডাঃ রোলার প্রভৃতি।

তিনবার কুস্তি লড়া হয়। যে বেশিবার প্রতিপক্ষকে মাটির উপরে চিত করে ফেলতে পারে, জয়ী হয় সেই-ই। কিন্তু কেবল চিত করলেই চলে না, ভূপতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই স্কন্ধ এক সময়েই মাটি স্পর্শ করা চাই ( এ-দেশে গামা ও হাসান বক্সের কুস্তির সময়ে দেখেছি, হাসান বক্সকে আধা-চিত করেই গামা জয়ী বলে নাম কিনেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে ও-রকম জয় নাকচ হয়ে যেত )।

বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে যারা পরে পরে পৃথিবীজেতা কুস্তিগীর বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে এই ঃ জর্জ হেকেনস্মিথ (১৯০৩—১৯০৮) ; ফ্রাঙ্ক গচ (১৯০৮—১৯১৬) ; জো স্টেচার (১৯১৬—১৯১৮) ; আর্ল ক্যাডক (১৯১৮) ; জো স্টেচার (১৯২০) ; ডবলিউ বিস্কো (১৯২১) ; এডওয়ার্ড লুইস (১৯২১) ; স্টানিসলস বিস্কো (১৯২২) এবং এডওয়ার্ড লুইস (১৯২২)। লুইসের পর আর কারুর নাম করা বাহুল্য মাত্র, কারণ তিনি পৃথিবীজেতা থাকতে থাকতেই গোবরবাবুর সঙ্গে তাঁর কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়।

য়ুরোপ-আমেরিকাতেও সাধারণত মনে করা হয়, একান্তভাবে পশুশক্তির সাধনা করে কুস্তিগীররা নেমে যায় মনুষ্যত্বের নিম্নতম ধাপে। কিন্তু এডওয়ার্ড লুইস এ-শ্রেণীর লোক নন। তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত ভদ্রলোক। প্রথম কুস্তি আরম্ভ করে তিনি ডাক্তার রোলার (যিনি ভারতের গামার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন), চার্লি কাটলার, ফ্রেড বিল ও আমেরিকাসের কাছে হেরে যান। কিন্তু তারপর একাগ্রচিত্তে সাধনা করে তিনি সত্য সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর দক্ষ ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। তিনি একরকম হাতের প্যাঁচ আবিষ্কার করেন, তার চাপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দম বন্ধ হয়ে আসত। তাঁর এই প্যাঁচ সামলাতে না পেরে সবাই হেরে যেতে লাগল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক শহরে একটি সার্বজাতিক কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে (নিশ্চয় ভারতবর্ষ ছাড়া) পৃথিবীর সর্বদেশের পঞ্চাশ জন বিখ্যাত পালোয়ান যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু লুইস তাঁর দারুণ হাতের প্যাঁচের জোরে পরাজিত করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই। সেই থেকে তাঁর নাম হয় স্ট্র্যাঙ্গলার (বা শ্বাসরোধকারী) লুইস।

লুইস প্রথমে হারান পৃথিবীজেতা জো স্টেচারকে। তারপর স্টানিসলস বিস্কোর কাছে হেরে (১৯২২) ঐ বৎসরেই আবার তাঁকে হারিয়ে পৃথিবীজেতা উপাধি লাভ করেন।

পরে ঐ উপাধি হারিয়েও মল্লসমাজে লুইসের মানমর্যাদা ছিল

যথেষ্ট। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে পঁচিশ জন বিখ্যাত পালোয়ান ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে লুইসেরও এখানে আসবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত তিনি আসেন নি, কারণ এলে পরে নিশ্চয়ই তাঁকে মুখে চুণ-কালি মেখে দেশে ফিরে যেতে হোত। ভারতীয় মল্লদের কেল্লা রক্ষা করেছেন তখন অপরাজেয় গামা এবং ইমাম বক্স। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন ভূতপূর্ব পৃথিবীজেতা শ্বেতাঙ্গ মল্ল স্টানিসলস বিস্কো পাতিয়ালায় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে গিয়ে এক মিনিট পূর্ণ হবার আগেই ভূতলশায়ী হয়েছিলেন। এবারেও বিদেশী মল্লদের ক্রমাগত লাফালাফি করতে দেখে গামা ঘোষণা করলেন—"এই আমি ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলুম। আমি এক দিনে এক আখড়ায় দাঁড়িয়ে একে একে পঁচিশ জন সাহেবের সঙ্গে লড়ব। যদি কেউ আমাকে হারাতে বা আমার সঙ্গে সমান সমান হতে পারেন, তাহলে তিনিই পাবেন ঐ পাঁচ হাজার টাকা।" গামা তখন বৃদ্ধ, বয়স উনষাট বৎসর। কিন্তু ঐ পঁচিশ জনের একজনও সাহস করে তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী হলো না! আর তারা গামা বা ইমামবক্সের সঙ্গে লড়বে কি, তাদের অধিকাংশই হেরে গিয়েছিল ভারতীয় মল্লসমাজে তখনও পর্যন্ত অখ্যাতনামা হরবন্স সিংয়েরই কাছে।

আমাদের গোবরবাবু আমেরিকায় যান স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসেরই সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু তিনি তখন পৃথিবীজেতা পালোয়ান এবং গোবরবাবু হচ্ছেন একে কালা আদমি, তার উপরে নবাগত। বহুকাল আগে তিনি ইংলণ্ডের সেরা সেরা পালোয়ানকে ভূমিসাৎ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সে পরিচয় বিশেষ কোন কাজে লাগল না। আমেরিকায় কালা আদমিরা হচ্ছে চোখের বালির মতো। আমি গোবরবাবুর মুখেই শুনেছি, আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে তাঁর প্রবেশাধিকারই ছিল না। যেখানে বর্ণবিদ্বেষ এমন প্রবল, সেখানে সুবিচারের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। এমন কি ইংরেজরাও

প্রথমে গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে আমলে আনতে রাজী হয় নি। আসল কথা শ্বেতাঙ্গদের মুল্লুকে কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াই করতে যাওয়া অনেকটা বিড়ম্বনারই মতো। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাম্পিয়ন জিমি ইসেন শেষ পর্যন্ত গোবরবাবুর কাছে হারতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু লড়তে লড়তে সে যখন মুষ্টিযুদ্ধের আশ্রয় নিয়েছিল, তখন শ্বেতাঙ্গ বিচারক তা 'ফাউল' বলে গণ্য করে নি। তবু কপাল ঠুকে গোবরবাবু বেরিয়ে পড়েছিলেন ইয়াঙ্কিদের দর্পচূর্ণ করবার জন্যে। তবে নতুন করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্যে তাঁকে উপরে উঠতে হলো সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার। গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন মাত্র একবার—তাও পরিণত বয়সে। এবং সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যদিও এ-দেশে থাকতে নানা আখড়ায় তিনি কুস্তি লড়েছেন অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মল্লের সঙ্গেই। শুনেছি একবার ইমামবক্সের সঙ্গেও কুস্তি লড়ে তিনি সমান সমান হয়েছিলেন। তাঁর নিজেরই আখড়ায় ছিলেন মাহিনা-করা প্রথম শ্রেণীর পালোয়ানরা। যদিও গোবরবাবু ভারতীয় কুস্তিগীরদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন নিজের নখদর্পণে, তবু আখড়ার কুস্তি নিয়ে বাইরে নাড়া-চাড়া করার রেওয়াজ নেই।

আখড়ার কুস্তিতে পালোয়ানরা নিজেদের সম্যক শক্তি ব্যবহার করেন না। প্রদর্শনী বা exhibition কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধেও অনেকটা ঐ ব্যাপারই দেখা যায়। যোদ্ধাদের কাছে তা হচ্ছে প্রায় খেলার সামিল, জনসাধারণকে আনন্দদানই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান যোদ্ধারা ঐ কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধের প্রদর্শনীতে প্রতিপক্ষের শক্তির মাত্রা কতকটা আন্দাজ করে নিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সালিভান ও কর্বেটের বিখ্যাত মুষ্টিযুদ্ধের উল্লেখ করা যায়। মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে জন এল সালিভান যখন অদ্বিতীয় এবং কারুর কাছে কখনো পরাজিত হন নি, সেই সময়ে উদীয়মান যোদ্ধা জেমস জে কর্বেটের সঙ্গে তাঁর

প্রদর্শনী-যুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। কর্বেট তার আগেই একজন সাধারণ যোদ্ধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় তাঁকেই হেভী ওয়েটে সবচেয়ে চতুর যোদ্ধা বলে স্বীকার করা হয়। প্রদর্শনী-যুদ্ধে সালিভানের সঙ্গে মাত্র চার রাউণ্ড লড়েই কর্বেট তাঁর শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়ে পর বৎসরেই ( ১৮৯২ ) তাঁকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে "পৃথিবীজেতা" নাম কেনেন।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর নামজাদা ভারতীয় পালোয়ানদের সঙ্গে বারংবার ধস্তাধস্তি করে গোবরবাবুও যে তাঁদের শক্তির পরিমাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছিলেন, এ-কথা অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তবু তিনি এদেশী পালোয়ানদের সঙ্গে প্রকাশ্যে কুস্তি না লড়ে বার বার পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের বিজয়গৌরব। প্রথমবার তিনি গামা ও ইমামবক্স প্রভৃতিকে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে আসেন। দ্বিতীয়বার নিজেই গিয়ে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে পরিচিত হন। তৃতীয়বার তিনি যান আমেরিকায় সর্বোচ্চ "পৃথিবীজেতা" উপাধি অর্জন করবার জন্যে।

কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্যে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে অসামান্য কায়িক শ্রম। বৎসরের পর বৎসর ধরে তিনি শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের পর পালোয়ানকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর তখনকার কথা নিয়ে আমি যথাসময়ে বাংলা পত্রিকায় আলোচনা করেছি। বাংলা কাগজওয়ালারা যা তা ব্যাপার নিয়ে প্রচুর আবোল তাবোল বকতে পারেন, কিন্তু বাঙালীর এই অতুলনীয় কীর্তি নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন নি। গোবরবাবুর অবদান বাংলাদেশে প্রায় অবিখ্যাত হয়ে আছে। গামা মাত্র দুইজন শ্রেষ্ঠ শ্বেত পালোয়ানকে ( রোলার ও বিস্কো ) হারিয়ে নাম কিনেছেন, কিন্তু গোবরবাবু ধূলিলুণ্ঠিত করেছেন দলে দলে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাকে।

ভারতের আর কোন পালোয়ানই এত বেশি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হন নি।

সবাই যখন হার মেনে পথ ছেড়ে দিলে, তখন বাকি রইল কেবল সর্বোচ্চ শ্রেণীর দুইজন মাত্র অধৃষ্য কুস্তিগীর। গুরুভার স্ট্র্যাঙ্গলার এডওয়ার্ড লুইস এবং পৃথিবীজয়ী লঘুতর গুরুভার (লাইট হেভি-ওয়েট) অ্যাড স্যান্টেল। গোবরবাবু প্রথমে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করলেন অ্যাড স্যান্টেলকে। দুজনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু স্যান্টেল দাঁড়াতে পারলেন না গোবরবাবুর সামনে। বাঙালীর ছেলের মাথায় উঠল পৃথিবীজয়ীর মুকুট। আর কোন ভারতীয় মল্ল আজ পর্যন্ত এই সম্মান অর্জন করতে পারেন নি। এরপরে গোবরবাবুর সামনে রইলেন কেবল স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস।

## বাঙালী মল্লের অভিযান

লাইট-হেভি ওয়েটে পৃথিবীজেতা পদবী লাভ করার মানেই হচ্ছে অসামান্য সম্মানের অধিকারী হওয়া, কারণ সমগ্র পৃথিবীর প্রথম বা সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লের পরেই লাইট-হেভি ওয়েটের আসন। গামা থেকে আরম্ভ করে আর কোন ভারতীয় মল্লই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। গামা কেবল ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লরূপে "জনবুল বেল্টে"-র অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র গোবরবাবুই ঐ পদবী লাভ করতে পেরেছেন। যে বাংলাদেশে দুই যুগ আগে উচ্চশ্রেণীর কুস্তিগীর ছিল দুর্লভ, সেই সময়েই গোবরবাবু অভাবিত ভাবে প্রমাণিত করেছিলেন যে, কেবল জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে নয়, বীরাচারীর কর্তব্য পালনে সকলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যাঘ্রভূমি বঙ্গভূমির সন্তান।

ফুটবল খেলার মাঠে মোহনবাগান প্রথম "শীল্ড" বিজয়ী হয়ে অর্জন করেছে চিরস্মরণীয় কীর্তি। মোহনবাগানের সম্মানকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেই বলতে পারি, ফুটবলের মাঠে জয়লাভ করা যায় প্রধানত ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যেই। তার নিরিখ নির্ণীত হয় যদি শারীরিক শক্তি হিসাবে, তাহলে এখনো কোন বাঙালী দলই কোন নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলের জয়পতাকাকেও নমিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ! তার উপরে আমরা নিম্নতর শ্রেণীর ইংরেজ দলকে হারাতে পারি স্বদেশে বসেই। খাস বিলাতে গিয়ে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর পেশাদার দলকে হারাতে পারে, ভারতবর্ষে এমন ফুটবল খেলোয়াড়ের দল বোধ করি আজ পর্যন্ত গঠিত হয় নি।

গোবরবাবুর পক্ষে সবচেয়ে শ্লাঘনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর সম্বল ছিল কূট-কৌশলের সঙ্গে অমিত দৈহিক শক্তি। উপরন্তু সাত সাগরের পারে বিদেশ-বিভুঁয়ে সিংহের বিবরে গিয়ে তিনি পরাস্ত করে এসেছেন পশুরাজকে। কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের স্বদেশে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠদের বাহুবলে হারিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করবেন বাংলার এক ছেলে, এটা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

আগেই বলেছি, পাঞ্জাবকেশরী গামা অতুলনীয় ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান হলেও, পাশ্চাত্য দেশ তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সম্যকরূপে পরিচিত নয়। কারণ তিনি সেখানকার উল্লেখযোগ্য দুইজনের বেশি পালোয়ানের ( ডাঃ রোলার ও বিস্কো ) সঙ্গে কুস্তি লড়েন নি। আর গোবরবাবু, পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে সেখানকার সর্বশ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে শক্তিপরীক্ষা করেছেন।

জো স্টেচার হেভি ওয়েটে পৃথিবীজয়ী হয়েছিল দুইবার ( ১৯১৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত ; এবং ১৯২০ )। বিস্কোও দুইবার ঐ উপাধি লাভ করেছিল। গোবরবাবুর সঙ্গে তাদের লড়াই হয় একাধিকবার।

কখনো জিতেছেন গোবরবাবু কখনো জিতেছে তারা। জিম লণ্ডস ও সনেনবার্গও পরে হয়েছিল পৃথিবীজয়ী। প্রথম ব্যক্তি গোবরবাবুর সঙ্গে সমান সমান হয়েছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি হেরে গিয়েছিল তাঁর কাছে। এ-ছাড়া আরো যে কত নামজাদা শ্বেতাঙ্গ পালোয়ান গোবরবাবুর পাল্লায় পড়ে ভূমিচুম্বন করেছিল, এখানে তার ফর্দ দাখিল করবার জায়গা নেই। মোট কথা, এত বেশি শ্বেতাঙ্গ পালোয়ানের গর্ব খর্ব করতে পারেন নি আর কোন ভারতীয় মল্ল।

অ্যাড স্যান্টেলকে হারাবার পর আমেরিকার স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস ছাড়া গোবরবাবুর যোগ্য আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। সুতরাং গোবরবাবু তাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি ; অক্ষমতার জন্যে নয়, বিচারকের সমূহ অবিচারে। কালোর অদ্বিতীয়তা যখনই প্রমাণিত হবার উপক্রম হয়, ধলোরা এমনি সব উপায়েই মান বাঁচাবার চেষ্টা করে।

তার আর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, জ্যাক জনসন বনাম জেস উইলার্ডের মুষ্টিযুদ্ধ। কালা আদমী পৃথিবীজেতার আসনে অটলভাবে উপবিষ্ট, এর জন্যে শ্বেতাঙ্গদের মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই আগেই বলেছি, গুপ্তহত্যার ভয় দেখিয়ে জনসনকে হার মানতে বাধ্য করা হয়েছিল, নইলে উইলার্ডের মতো যোদ্ধা তাঁর পাশে দাঁড়াবারও যোগ্য ছিল না। উইলার্ড যখনই দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যোদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখনই পরাজিত হয়েছেন। গানবোট স্মিথ কখনো পৃথিবীজেতা হতে পারেননি। জনসনের সামনে গেলে তাঁর অবস্থা হোত হয়তো তোপের মুখে উড়ে যাবার মতো। তাঁর আর উইলার্ডের দেহের ওজন ছিল যথাক্রমে ১৮৫ ও ২৫০ পাউণ্ড এবং দেহের দীর্ঘতা ছিল যথাক্রমে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। তবু উইলার্ড জিততে পারেননি। টম ম্যাক্‌-মোহন নামে এক সাধারণ যোদ্ধার কাছেও তিনি হেরে গিয়েছিলেন। এমন একটা বাজে লোকের কাছেও শ্বেতাঙ্গদের মানরক্ষার জন্যে

জনসন হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। উইলার্ড পরে জ্যাক-ডেম্প্‌সি ও লুইস ফির্পোর সামনেও দাঁড়াতে পারেন নি, অথচ জনসন তারপর বহু যোদ্ধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকবারেই জয়ী হয়েছেন। এমনকি জনসনের বয়স যখন তেতাল্লিশ বৎসর, তখন তাঁর চেয়ে বয়সে সতেরো বছরের ছোট হোমার স্মিথও তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

গোবরবাবু ভারতবর্ষে প্রকাশ্যভাবে একবার মাত্র কুস্তি প্রতি-যোগিতায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেবারেও বিচার-প্রহসন হয়নি বটে, কিন্তু হয়েছিল বিচার-বিভ্রাট। সে-কথা পরে বলব।

আমেরিকায় কুস্তি প্রতিযোগিতা লোকপ্রিয় হয়েছে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কিন্তু সেখানকার পেশাদার কুস্তিগীররা টাকার লোভে প্রায়ই কৃত্রিম যুদ্ধের (বা Mock fight) ব্যবস্থা করত বলে কুস্তির প্রতি লোকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। বর্তমান শতাব্দীতে কুস্তির মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসের "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভের পর থেকেই মল্ল-যুদ্ধের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় সকলের দৃষ্টি।

ডাঃ বি এফ রোলারের পেশা হচ্ছে ডাক্তারী, কিন্তু মল্লযুদ্ধেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। শুনেছি অল্পকালের জন্যে তিনি "পৃথিবীজেতা" উপাধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতরূপে কিছু বলতে পারি না। তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা ছিলেন বলেই গামার সঙ্গে তাঁর কুস্তি হয়েছিল, অবশ্য সে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইসও উঠতি বয়সে একবার তাঁর কাছে হেরেছিলেন।

ডাঃ রোলার বলেন, "ফ্রাঙ্ক গচ (তিনি 'পৃথিবীজেতা' উপাধি বজায় থাকতে থাকতেই পূর্ণ গৌরবে অবসর নিয়েছিলেন) একজন মহামল্ল ছিলেন বটে কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর পূর্ণ গৌরবের যুগেও বর্তমান কালের দুই-তিনজন কুস্তিগীর তাঁকে হারিয়ে দিতে পারতেন। গচ যখন নাম কিনেছিলেন, তখনকার কুস্তিগীররা ছিলেন মধ্যম

শ্রেণীর। স্ট্র্যাঙ্গলার লুইস গচের চেয়ে বলবান আর ওজনে ভারী এবং চাতুর্যে ও গতির ক্ষিপ্রতায় তিনি গচের চেয়ে কম যান না। হাতের প্যাঁচের ( head-lock ) দ্বারা তিনি গচকে পরাজিত করতে পারতেন।"

লুইসের মাথার উচ্চতা ছিল ছয় ফুট। উঠতি বয়সে যখন তিনি ডাঃ রোলার প্রভৃতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ পাউণ্ড। কিন্তু যখন গোবরবাবুর সম্মুখবর্তী হন, তখন ছিলেন দস্তুরমত গুরুভার। গোবরবাবুরও দেহ বিরাট— যেমন দৈর্ঘ্যে ( বোধ করি তিনি ছয় ফুটের চেয়ে মাথায় উঁচু ), তেমনি প্রস্থে।

লুইসের সবচেয়ে বড় প্যাঁচ ছিল "হেড-লক"। অন্যান্য পালোয়ানরা নিজেদের মাথা এগিয়ে দিয়ে তাঁকে তা অভ্যাস করবার সুযোগ দিতে সম্মত হোত না, কারণ সে প্যাঁচ কষলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসতো। লুইস তাই কতকগুলো কাঠের নরমুণ্ড তৈরি করিয়ে নিয়েছিল—সেগুলোর ভিতর হোত ফাঁপা। দু-ভাগ করা ফাঁপা মাথার, মাথার ভিতরে থাকত খুব জোরালো স্প্রিং—যেমন থাকে স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেলের ভিতরে। বাহুর চাপ দিয়ে স্প্রিংয়ের বিরুদ্ধে কাঠের মাথার দুই অংশ এক করতে গেলে দরকার হোত একজন মহাবলবান ব্যক্তির চূড়ান্ত শারীরিক শক্তি। এই প্যাঁচ অভ্যাস করতে করতে লুইসের বাহুর কতকগুলো পেশী অসাধারণ স্ফূর্তিলাভ করেছিল।

কিন্তু ভারতীয় পালোয়ানদেরও মানসিক তূণে সঞ্চিত আছে অসংখ্য মারাত্মক প্যাঁচ, বিলাতী কুস্তিগীররা তার খবর রাখে না। এইজন্যেই গামা ও ইমামবক্স প্রমুখ পালোয়ানদের পাল্লায় পড়ে ডাঃ রোলার, বিস্কো ও জন লেম প্রভৃতি বিলাতী যোদ্ধারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়েছিলেন পপাত ধরণীতলে। সুতরাং লুইসের "হেড-লক"-এর নামে শ্বেতাঙ্গ কুস্তিগীরদের হৃদ্‌কম্প হলেও গোবরবাবুর ভয়ের কারণ ছিল না।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুর কুস্তি শুরু হলো। লুইস ভেবেছিল তার "হেড-লক"-এর বিষম ধাক্কা সহ্য করতে পারবেন না গোবরবাবু। কিন্তু তাঁর ভ্রম ভাঙতে দেরি লাগল না। খানিকক্ষণ কুস্তির পর সে গোবরবাবুকে একবার চিত করতে পারল বটে, কিন্তু তাকেও হতে হলো চিতপাত। গতবারেই বলেছি, পাশ্চাত্য দেশে তিনবার (সময়ে সময়ে পাঁচবারও) কুস্তি লড়বার পর হার-জিত সাব্যস্ত হয়। দুইবারের পর লুইস ও গোবরবাবু হলেন সমান সমান। তৃতীয়বারে যে চিত হবে, হার মানতে হবে তাকেই।

কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৃতীয়বার অবতীর্ণ হয়েই লুইস নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, গোবরবাবু বড় সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী নন, তাঁর কাছে তার হারবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। প্রতিযোগীদের কেউ যখন নিয়মবিরুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখনই বোঝা যায়, নিজের সক্ষমতা সম্বন্ধে তার মনে জেগেছে সন্দেহ। তাই গোবর-বাবুকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে বহুকাল আগে ইংরেজ কুস্তিগীর জিমি ইসেন যা করেছিল, লুইসও তাই করলে—অর্থাৎ কুস্তি ছেড়ে বক্সিংয়ের আশ্রয় নিলে। গোবরবাবুকে করলে সে মুষ্ট্যাঘাত! যেমন অন্যায়কারী যোদ্ধা, তেমনি অসাধু বিচারক। কৃষ্ণাঙ্গের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত, এইটেই হচ্ছে পাশ্চাত্য বিধান। কারণ জিমি ইসেন ঘুষি মারলেও বিচারক "ফাউল" করেছে বলে তাকে বসিয়ে দেননি, লুইসও মুষ্টি ব্যবহার করে পরাজিত বলে স্বীকৃত হয়নি—মল্লযুদ্ধের আইন অনুসারে যা হওয়া উচিত।

বিচারক দেখেও কিছু দেখলেন না বটে, কিন্তু গোবরবাবু এতটা ব্যভিচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যখন কুস্তি থামিয়ে বিচারকের দিকে ফিরে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেন, লুইস তখন পিছনদিক থেকে এসে তাঁর পা ধরে প্রচণ্ড এক টান মারলে। অতর্কিতে এমন অভাবিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে

গোবরবাবু মাটির উপরে আছড়ে পড়লেন এবং মাথায় পাটাতনের চোট লেগে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বিচারক লুইসকেই জয়ী বলে মেনে প্রমাণিত করলেন, পাশ্চাত্য দেশেও কাজীর বিচার হয়। এইজন্যেই আমি বলেছিলুম, যেখানে বর্ণবিদ্বেষ প্রবল, সেখানে সুবিচারের আশা থাকে না বললেই চলে।

লুইসের সঙ্গে গোবরবাবুকে আর কুস্তি লড়বার সুযোগ দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি লাইট-হেভি ওয়েটে পৃথিবীজেতা কুস্তিগীরের পদে বহাল থেকেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন। এই পদের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আর তিনি সাগরপারে পাড়ি দেন নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ থেকেও কেউ এসে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ঐ পদবী কেড়ে নিতে পারে নি। তাঁর "পৃথিবীজেতা" বলে সম্মান অক্ষুণ্ণই আছে।

গোবরবাবু কলকাতায় আবার নিজের বৈঠকে এসে জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর ঘরে আবার আরম্ভ হলো আমাদের আনন্দ-সম্মিলন। পুরাতন দিনের গল্প, আমেরিকার গল্প, ললিতকলার গল্প, গান-বাজনাও বাদ পড়ল না।

তারপরই গোবরবাবু বড় গামাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে চারিদিকে জাগিয়ে তুললেন এক বিশেষ উত্তেজনা। পাঞ্জাবকেশরী নামে বিখ্যাত গামা, পৃথিবীর বড় বড় পালোয়ানরাও যাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা পায় না! একটু চমকিত হলুম বটে, কিন্তু গোবরবাবুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের অভাব ছিল না। নিজের ও বড় গামার শক্তি-সামর্থ্য না বুঝে হঠকারীর মতো নিশ্চয় তিনি প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হবেন না।

শিবনারায়ণ দাসের গলিতে বরাটবাড়ির পিছনকার অঙ্গনে কুস্তির এক সুবিস্তৃত আখড়া তৈরি করা হলো। নিয়মিতভাবে কুস্তি অভ্যাস করবার জন্যে গোবরবাবু পশ্চিম থেকে আনালেন গুট্টা সিং নামে এক বিখ্যাত পালোয়ানকে। দিনে দিনে তাঁর দেহ

অধিকতর তৈরি হয়ে এমন সুগঠিত হয়ে উঠল, দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। বাঙালীর তেমন পুরুষসিংহ মূর্তি আমি আর দেখি নি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুত হতে লাগল। কাগজে যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে এবং মণ্ডপের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সার্থক হলো সেই প্রবাদবাক্য—'মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙেন'! হঠাৎ দারুণ ডিপথিরিয়া রোগে গোবরবাবু একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন, তারপর দীর্ঘকাল ধরে তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বড় গামার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা আর হলো না। আয়োজন-পর্বেই গোবরবাবুর বহু সহস্র টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল—সবই হলো ভস্মে ঘৃতাহুতির মতো।

তারপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবরবাবুর সঙ্গে ছোট গামার যখন কুস্তি হয়, তখন ছোট গামা যুবক ও তিনি বয়সে প্রৌঢ়। সে কুস্তি দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু ভারতীয় ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ শচীন্দ্র মজুমদার যা বলেছেন, এইখানে আমি সে-কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিলুম :

'আমার মনে হয় গোবরবাবুর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছিল। কুস্তির একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে যে লড়তে লড়তে আখড়ার সীমানায় গিয়ে পড়লে বিচারক কুস্তি ক্ষণিকের জন্যে বন্ধ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আখড়ার মাঝখানে এসে লড়তে হুকুম দেবেন। নূতন করে লড়বার সময়ে পূর্বে যে যে-অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে কুস্তি আরম্ভ হবে। গোবরবাবু ও ছোট গামা যখন সীমানার দড়ির উপর গিয়ে পড়লেন, বিচারক তাঁদের আখড়ার মাঝে আসতে হুকুম দিলেন। গোবরবাবু প্রতিপক্ষকে ছাড়লেন বটে কিন্তু প্রতিপক্ষ হুকুম অগ্রাহ্য করে গোবরকে চিত করে দিলেন। দর্শকগণ গামার জয়-জয়কার করে উঠল এবং বিচারকও ভড়কে গিয়ে তাদের সমর্থন করেন। এ-ধরনের বিচার একাধিকবার কলকাতায় দেখা গেছে।

······বিচারকের দোষে একজনের চেষ্টা বিফল হলে আপসোস করবার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়।'

ছোট গামা কলকাতায় এসে তুইবার কুস্তি লড়েছিলেন বাঙালী মল্লের সঙ্গে এবং তুইবারই জয়ী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন বিচার-বিভ্রাটের ফলে। টীকা অনাবশ্যক।

গোবরবাবুর অসাধারণ শারীরিক শক্তি সম্পর্কীয় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক গল্প আমি জানি। কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, অতএব এইখানেই রুদ্ধ হলো আমার লেখনীর গতি।

## দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমারের পিতৃদেব প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কাহিনী মৎলিখিত 'যাঁদের দেখছি' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। সে বোধ হয় চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা—ঠিক তারিখ মনে নেই। সেই সময়েই আমি দেখি দিলীপকুমারকে। আমি তখন তরুণ যুবক এবং দিলীপ কুমার বালক।

তারিখের কথা ভুলেছি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেদিনের ছবিটি।

একতলার বৈঠকখানা। উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি টেবিল, তার সামনে চেয়ারে আসীন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর তুই পাশে দণ্ডায়মান পুত্র দিলীপকুমার ও কন্যা মায়া দেবী। পূর্ব দিকে উপবিষ্ট আমরা—অর্থাৎ স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, 'অর্চনা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস চন্দ্র, সুকবি শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায় ও আমি।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপসিংহকে অবলম্বন করে

একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। রচনাকার্য কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তিনি খবর পান, দ্বিজেন্দ্রলালও রচনা করেছেন 'রাণা প্রতাপ' নাটক। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র লেখনী ত্যাগ করেন। পরে সেই অসমাপ্ত নাটকখানি 'অর্চনা'-র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণদাসবাবু 'অর্চনা'-র সেই সংখ্যাগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের সামনের টেবিলের উপরে স্থাপন করলেন। সাগ্রহে সেগুলিকে টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঠে নিযুক্ত হলেন দিলীপকুমার।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। বাংলা দেশের ও বিলাতের অভিনয়কলা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা এবং স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তুলনাও করলেন। স্পষ্ট বললেন, আর্ভিংয়ের চেয়ে গিরিশচন্দ্র নিরেস অভিনয় করেন না।

পিতা যখন অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর্ভিংয়ের তুলনায় নিযুক্ত, বালক দিলীপকুমারও তখন যে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে নিজের পিতাকে তুলনা করতে ব্যস্ত হয়ে আছেন, সেটা টের পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

হঠাৎ 'অর্চনা' থেকে চোখ তুলে তিনি বলে উঠলেন, 'বাবা, বাবা, গিরিশবাবুর প্রতাপসিংহের চেয়ে তোমার 'রাণা প্রতাপ' আরো ভালো বই হয়েছে!'

পুত্রের কাছ থেকে এই অযাচিত ও অলিখিত 'সার্টিফিকেট' লাভ করে দ্বিজেন্দ্রলাল সহাস্যে মুখ ফিরিয়ে করলেন দিলীকুমারের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত। আমাদের সকলেরই মুখে ফুটল কৌতুকহাসি।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাথে দেখা করতে গিয়েছি কয়েকবার, কিন্তু আর কোনদিন পিতা ও পুত্রকে একসঙ্গে দেখিনি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়নি। আবার যখন দেখা হলো, আমি তখন প্রৌঢ় ও দিলীপকুমার এসে দাঁড়িয়েছেন যৌবনের প্রান্তভাগে।

ইতিমধ্যে তাঁর খবর পেয়েছি মাঝে মাঝে। মন দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। এঁর-ওঁর-তাঁর কাছে গান শিখছেন। গোড়ার দিকে তাঁর একজন সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বকুবাবু ( তাঁর ভালো নামটি ঠিক মনে পড়ছে না, তিনি ছিলেন সুগায়ক এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপেও অল্পবিস্তর নাম কিনেছিলেন )। তারপর শুনলুম, দিলীপকুমার য়ুরোপে যাত্রা করেছেন।

য়ুরোপ প্রত্যাগত দিলীপকুমারকে অভিনন্দন দেবার জন্যে রাম-মোহন লাইব্রেরীতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সেইখানে আবার তাঁর দেখা পাই এবং প্রথম তাঁর গান শুনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের ভক্ত হয়ে পড়ি। সেইদিনই বুঝতে পারি, সঙ্গীতসাধনায় তিনি সিদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছেন কতখানি! তাঁর একটি-মাত্র গানই তাঁকে উঁচুদরের শিল্পী বলে চিনিয়ে দিতে পারে।

তারপর এখানে-ওখানে দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা হয়। আলাপ জমে। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিজের গানের আসর বসলেই তিনি পত্র লিখে আমাকে আমন্ত্রণ করতে ভোলেন না। আমিও 'সঙ্গীত-সুধা তরে পিপাসিত চিত্ত' নিয়ে যথাস্থানে হাজিরা দিতে ভুলি না— কখনো একাকী এবং কখনো সপরিবারে। এইভাবে তিনি যে কতদিন আমাদের আনন্দবিধান করেছেন, তার আর সংখ্যা হয় না।

দিলীপকুমারের সঙ্গীতশিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি কেবল সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্যদের কাছে তালিম নিয়ে এলেম লাভ করেননি, গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে এখানকার অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর ধুরন্ধর গায়ক-গায়িকার সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছেন। আমি যখন সাপ্তাহিক 'বিজলী'-র নিয়মিত লেখক, সেই সময়ে ঐ পত্রিকায় দিলীপকুমারের দেশে দেশে সফরের কাহিনী ও গায়ক-গায়িকাদের বিবরণী প্রকাশিত হোত। সেই পরম উপাদেয় রচনাগুলি আমি সাগ্রহে পাঠ করতুম। সেগুলি কেবল সুখপাঠ্য নয়, শিক্ষাপ্রদও বটে। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দিলীকুমার যে ধারণা পোষণ

করেন, ঐ নিবন্ধগুলির মধ্যে তার বিশদ পরিচয় আছে। অধিকাংশ স্থলেই তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলে যায় অবিকল।

কিন্তু কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেই দিলীপকুমার প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, য়ুরোপে থাকতে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও। সেখানেও তিনি শুনেছেন অনেক ভালো ভালো শিল্পীর গান এবং তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেনও যে অনেক কিছুই, এটুকু অনুমান করাও কঠিন নয়।

তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পিতার বিখ্যাত পুত্র—চলতি কথায় যাকে বলে "বাপ কো বেটা"। তাঁর বাবা নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, গান গেয়েছেন ও সুরসৃষ্টি করেছেন। দিলীপকুমারও ঔপন্যাসিক, কবি, প্রবন্ধকার, সুরকার ও গায়ক। নাটকও রচনা করেছেন একাধিক। এদেশে বহু পরিবারেই বংশানুক্রমে সঙ্গীতের অনুশীলন চলে। এ-সব পরিবারের শিল্পীদের বলা হয় "ঘরানা গায়ক"। দিলীপকুমারও তাই। কেবল তিনি ও তাঁর পিতা নন্, তাঁর পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও ছিলেন খ্যাতিমান সঙ্গীতবিদ্।

তাঁর উপন্যাস পেয়েছে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে প্রশংসা। তাঁর কবিতাও লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি। কিন্তু আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ওঁদের কাছে আমার মতামত তুচ্ছ। তবু এইটুকুই খালি বলতে পারি, দিলীপকুমারকে আমিও সুলেখক বলে গণ্য করি বটে, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হই তাঁর গানের দিকেই। তাঁর আসল কৃতিত্ব সঙ্গীতক্ষেত্রেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কাব্য ও চিত্র প্রভৃতিকে যেমন ধরে রাখা যায়, গান, নাচ ও অভিনয়-কলাকে তেমন চিরস্থায়ী করা যায় না। গায়কের, নর্তকের ও অভিনেতার জীবনদীপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ব্যক্তিগত আর্ট চলে যায় মানুষের দেখাশোনার বাইরে। তবু লোক পরম্পরায় মুখে মুখে ফেরে তাঁদের নাম। তানসেন আজও মরেন নি। গ্যারিক আজও

অমর। পাবলোভা আজও বেঁচে আছেন। দিলীপকুমারকেও বাঁচতে হবে ঐ সঙ্গীতস্মৃতির জগতেই।

বাংলা গানে তিনি এনেছেন একটি অভিনব ঢঙ বা ভঙ্গি, যা সম্পূর্ণরূপেই তাঁর নিজস্ব। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাপদ্ধতি, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি, শিশিরকুমারের অভিনয়-পদ্ধতি ও উদয়শঙ্করের নৃত্যপদ্ধতি সম্যকভাবেই তাঁদের ব্যক্তিগত, অগণ্য পদ্ধতির মধ্যেও তারা স্বয়ংপ্রধান হয়ে বিরাজ করে, দিলীপ-কুমারের গান গাইবার পদ্ধতিও সেই রকম অপূর্ব। ওস্তাদী "ব্যাকরণে"-র দ্বারা কণ্টকিত ও উৎপীড়িত না করেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দ্বারা যে সর্বশ্রেণীর শ্রোতার শ্রবণেই মধুবর্ষণ করা যায়, দিলীপ-কুমারের আসরে আসীন হলেই পাওয়া যায় সে প্রমাণ। কি উন্মাদনা আছে তাঁর গানে, কি রসের ব্যঞ্জনা আছে তার সুরে, আর কি কলকণ্ঠের অধিকারী ও দরদী গায়ক তিনি! চিত্তও তাঁর নির্মুক্ত, কোন গানই তাঁর কাছে উপেক্ষিত নয়। থিয়েটারি গান ও থিয়েটারি সুর ওস্তাদদের আসরে অচ্ছুৎ হয়ে থাকে, দিলীপকুমার তাকে আদর করে নিজের কণ্ঠে টেনে নেন। বাংলা রঙ্গালয়ে থিয়েটারি সুরে গেয় গিরিশচন্দ্রের একটি সেকেলে গান আছে—"রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"। ঐ গান আর ঐ সুর দিলীপকুমারের কণ্ঠগত হয়ে কি সুধাসুমধুর হয়ে উঠেছে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে সে প্রমাণ পাকা হয়ে আছে।

ভালো গায়কের গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমারের আগ্রহ সর্বদাই সজাগ। আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সতীশচন্দ্র রায় বহুকাল সঙ্গীতসাধনা করে এখন পরলোকগমন করেছেন। এক সময়ে ভালো গায়ক বলে তাঁর প্রচুর প্রসার ছিল। গ্রামোফোনের রেকর্ডেও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনেকগুলি গান। একদিন তাঁর গান শোনবার জন্যে দিলীপকুমার এলেন আমাদের বাড়িতে। তারপরও একাধিকবার তিনি আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন, তবে পরের

গান শুনতে নয়, নিজের গান শোনাতে।

তারপর দিলীপকুমার করলেন সন্ন্যাস গ্রহণ, চলে গেলেন পণ্ডিচেরীর অরবিন্দাশ্রমে। সেখানকার জন্যে দান করলেন নিজের সর্বস্ব। বোধ করি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই আর একজন অতুলনীয় সঙ্গীতশিল্পীও পণ্ডিচেরী যাত্রা করে একেবারেই ভেস্তে গিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু সুখের বিষয় যে দিলীপকুমার সন্ন্যাসী হয়েও সঙ্গীত ও সাহিত্যকে ত্যাগ করেননি।

পণ্ডিচেরীতে গিয়েও তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেননি। একাধিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে যখনই তাঁর রচনা প্রার্থনা করেছি, তখনই তা পেয়েছি। তাছাড়া আমাকে তিনি পত্র লিখতেন প্রায়ই এবং আমাকেও পত্র লেখবার জন্যে অনুরোধ করতেন। তাঁর বহু পত্রই আমি রক্ষা করেছি, সেগুলির মধ্যে আছে সাহিত্য ও সঙ্গীতের কথা। নিজের কথাও আছে। তাঁর একখানি সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলুম—পত্রের তারিখ হচ্ছে উনত্রিশে নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ঃ

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে খুব হাসলাম। আপনার কবিতা ("ছন্দা"র) বেশ লেগেছিল। আপনার গানগুলি পেয়ে সুখী হলুম। দেখব কি করা যায়। সুর মাথায় না এলে মুস্কিল। কিন্তু আপনার আরো কয়েকটা গান পাঠাবেন। প্রেমের গানও দু-একটা পাঠাবেন কিন্তু—আমি প্রেমের গান যে একেবারেই গাই না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সেদিন Chopin-এর একটি জর্মন গানের অনুবাদ করেছি, আপনাকে পাঠাচ্ছি—ঐ ছন্দে মিলে সুরে। যদি ভালো লাগে "ছন্দা"-য় ছাপবেন। কিন্তু ভালো না লাগলে দোহাই ধর্ম, ছাপাবেন না—আমি কিছু মনে করব না।

দেখুন প্রিয়বর, একটা কথা বলে রাখি অত্যন্ত সরল বিনয়ে। কাব্যজগতেও আমি সাধ্যমত সত্যপন্থী হতে চেষ্টা করি। কিন্তু

ফলে অনেক বন্ধু হারিয়েছি—কারুর কারুর কাব্যকে ভালো বলতে না পারার দরুন। আপনার বন্ধুত্ব আমার কাছে সত্যই কাম্য বলেই ভয় হয়, পাছে আপনার সব গানকে ভালো বলতে না পারলে আপনিও আমাকে বিসর্জন দেন। আপনার একজন প্রিয় কবির কবিতা আমার ভালো লাগে না। তিনি আমাকে বহু উপরোধ করেছেন তাঁর কাব্য সমালোচনা করতে—আমি করতে পারিনি—যদিও তাঁর কাজের কোথাও নিন্দা করিনি—কিন্তু তিনি চটে গেলেন মোক্ষম।...... আমার গান কবিতা কিছুও যদি আপনার ভালো না লাগে তবু আপনার প্রীতিকে আমি সমানই চাইব, কেননা আমি সার বুঝি ভালোবাসার অহেতুক স্নেহকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এই-টুকুই আমি চাই—আর কিছু না।......প্রগলভতা মার্জনা করবেন ঃ তবে আপনি প্রবীণ লোক, অনেক দেখেছেন শুনেছেন, কাজেই মনে হয় বুঝবেন আমার সঙ্কোচ ও আক্ষেপ। পুজো সংখ্যা "ছন্দা" একখানা আমাকে পাঠাবেন ? যেখানা পাঠিয়েছিলেন সেটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, তাঁর কাছেই আছে" প্রভৃতি।

কিন্তু আমার ভাগ্যে সে দিলীপকুমার আজ একেবারেই বদলে গেছেন। পত্রালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। কলকাতায় এলেও খবর নেন না বা গানের আসরে আমন্ত্রণ করেন না। কারণ ঠিক জানি না। তবে একটা কারণ হয়তো এই ঃ কয়েক বৎসর আগে তাঁর রচিত "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্যায্য মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে-সব উক্তি আমি মেনে নিতে পারিনি, আমিও কয়েক সপ্তাহ ধরে "দৈনিক বসুমতী"-তে তার প্রতিকূল আলোচনা করেছিলুম। দিলীপ-কুমারের অভিমানের কারণ হয়তো তাই। উপরের পত্রে লিখেছেন, সত্যপন্থী হয়ে তিনি অনেক বন্ধুকে হারিয়েছেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই আমিও হারিয়েছি তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু তবু আমি তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি। আজও তাঁকে আমি আগেকার মতোই

ভালোবাসি। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদকে ব্যক্তিগত জীবনে টেনে আনতে আমি অভ্যস্ত নই।



## কৃষ্ণচন্দ্র দে

আধুনিক বাংলার লোকপ্রিয় সঙ্গীত-ধুরন্ধরদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে ঊর্ধ্বাসনের অধিকারী। সে আসনের উচ্চতা কতটা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই; কিন্তু কোন কোন বিভাগে কৃষ্ণচন্দ্রের আর্ট অতুলনীয় ও অননুকরণীয় হয়ে আছে, এ-কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র এখন ষাটের পরের ধাপে এসে পড়েছেন (তাঁর জন্ম ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে)। স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে প্রথম যেদিন তাঁর গান শুনি, তখন তিনি বয়সে যুবক। সেদিন শিক্ষার্থী হলেও তিনি ছিলেন নামজাদা উদীয়মান গায়ক। তারও বহু বৎসর পরে যখন ওস্তাদ বলে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছেন, তখনও সঙ্গীতকলার প্রত্যেক বিভাগে নতুন কিছু শেখবার জন্যে তাঁকে শিক্ষার্থীর মতো আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখেছি। লাটিনে চলতি উক্তি আছে—আর্ট অনন্ত, কিন্তু জীবন হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। সংস্কৃতেও অনুরূপ বাণী আছে—"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পাশ্চ আয়ুঃবহবশ্চ বিঘ্নাঃ।" এমন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আমি কয়েকজন দেখেছি, যাঁরা ভুলে যেতে চান এই পরম সত্যটি। কৃষ্ণচন্দ্র এ শ্রেণীর শিল্পী নন। নিয়তি তাঁকে দয়া করেনি। ভগবান তাঁকে চক্ষুষ্মান করেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাল্যবয়স পর্যন্ত দুই চোখ দিয়ে তিনি উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন সুন্দরী এই বসুন্ধরার দৃশ্য-সঙ্গীত—আলোছায়ার ছন্দ, ইন্দ্রধনুবর্ণের আনন্দ, কান্তারশৈলের সৌন্দর্য ও চলমান তরঙ্গিনীর নৃত্য। কিন্তু কৈশোরেই বঞ্চিত হন

দৃষ্টির ঐশ্বর্য থেকে। জন্মান্ধ চোখের মর্যাদা ততটা বোঝে না। কিন্তু চক্ষুরত্ন লাভ করেও তা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এর চেয়ে চরম দুর্ভাগ্য কল্পনা করা যায় না।

বন্ধ হয়ে গেল লেখাপড়া। ভগবানদত্ত দৃষ্টি হারালেন বটে, কিন্তু নিয়তি তাঁর ভগবানদত্ত সুকণ্ঠ কেড়ে নিতে পারলে না। কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীতসাধনায় নিযুক্ত হয়ে রইলেন একান্তভাবে। ষোলো বৎসর বয়সে স্বর্গত সঙ্গীতবিদ শশিমোহন দে-র শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং তারপর সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, গয়ার মোহিনীপ্রসাদ, প্রফেসর বদন খাঁ ও করমতুল্লা খাঁ প্রভৃতির কাছে সাগরেদী করে টপ্পা, ঠুংরী ও খেয়ালে নিপুণতা অর্জন করেন। কীর্তনবিদের কাছে কীর্তন শিক্ষা করেছেন পরিণত বয়সেও। শুনেছি ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁও তাঁকে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করেছেন।

অন্ধ হয়ে বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ির লেখাপড়া বন্ধ হয়নি। একাধিক ভাষায় তিনি অর্জন করেছেন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আলাপ করে বুঝেছি, তাঁর মধ্যে আছে যথেষ্ট সাহিত্যবোধ ও কাব্যানুরাগ—অধিকাংশ ওস্তাদ গায়কের মধ্যে যার অভাব অনুভব করেছি।

প্রথমে পূর্বোক্ত নরেনবাবুর বাড়িতে এবং পরে বিশ্ববিখ্যাত পালোয়ান শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুর বাড়িতে প্রায়ই বসত উচ্চশ্রেণীর গান-বাজনার বৈঠক। গান গাইতেন স্বর্গীয় ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের গান শেষ হলেও প্রায় মধ্যরাত্রে সরদ নিয়ে বসতেন অনন্যসাধারণ শিল্পী করমতুল্লা খাঁ সাহেব। তবলায় সঙ্গত করতেন স্বর্গীয় দর্শন সিং। সময়ে সময়ে আসর ভাঙত শেষ রাতে। জমীরুদ্দীন ও কৃষ্ণচন্দ্রের গানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত।

আমাদের ওস্তাদ গায়কদের গানের গলা হয় অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সঙ্গীতকলার কোন কলকৌশলই তাঁদের অজানা থাকে না। শাস্ত্রের সব বিধিনিষেধ মেনে তাঁরা গান গেয়ে যেতে পারেন যন্ত্রচালিতবৎ,

কোথাও একটু-আধটু এদিক ওদিক হতে দেখা যায় না। এ হিসাবে তাঁদের নিখুঁত বলতে বাধে না। কৃষ্ণচন্দ্রও আগে গান গাইতেন ঐ ভাবেই।

কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে আসে তাঁর গান গাইবার পদ্ধতি। আগেই বলেছি, কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে আছে প্রভূত কাব্যরস, মানে না বুঝে সুরে কেবল কথা আওড়ানো নিয়েই তিনি তুষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না, কথার অর্থ অনুসারে সুরের ভিতরে দিতে লাগলেন চমৎকার ভাবব্যঞ্জনা (Expression)। একে নাটকীয় কোন কিছু (Dramatic) বলুন, বা কল্পপন্থা ( Romantic ) বলেই ধরে নিন; কিন্তু এই পদ্ধতিতে গানের ভিতর যে যথেষ্ট প্রাণসঞ্চার করা যায়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সর্বপ্রথমে বাংলা গানের ঐ ভাবব্যঞ্জনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সেই জন্যেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কথা ও সুর সর্বদাই আপন আপন মর্যাদা বাঁচিয়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে।

গ্রামোফোনের রেকর্ডে বিশ্বনাথ ধামারী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্যদের বাংলা গান ধরা আছে। সেগুলি শুনলেই উপলব্ধি করতে পারবেন, তাঁদের গানের মধ্যে আছে সুরতাললয়ের প্রচুর মুনশীয়ানা এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিখুঁত গায়ক। কিন্তু যাঁরা গানের শব্দগত ভাবব্যঞ্জনা খুঁজবেন, তাঁদের গানে তাঁরা সে জিনিসটি খুঁজে পাবেন না। ঐ-সব সুরে তাঁরা যদি অন্য গানের কথাও ব্যবহার করেন, তাহলেও ইতরবিশেষ হবে না। ওস্তাদ গায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণচন্দ্রই গানের এই ভাবব্যঞ্জনার দিকে ঝোঁক দেন। তিনি যখন প্রথম রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন, তখনই এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশির-সম্প্রদায়ের বা রবীন্দ্রনাথের,—কার প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমি বলতে পারি না।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করেন,

তখন দুইজন সঙ্গীতবিদ তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন—স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুদাস ছিলেন কলাবিদ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-নাথের গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তখন ওস্তাদ গায়কদের অন্যতম। তাঁরা দুজনেই সম্প্রদায়ের প্রথম পালা "বসন্তলীলা"-র সুর সংযোজনার ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সময়ে গানের ভূমিকা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দেবার জন্যেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি বড়ই নারাজ, বললেন, "থিয়েটারে গান গাইলে গায়কসমাজে আমার জাত যাবে।" এদেশে যাঁরা বড় গায়ক হতে চেয়েছেন, তাঁরা বরাবরই চলতেন রঙ্গালয়কে এড়িয়ে। বাংলা রঙ্গালয়ে যাঁরা সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন—যেমন রামতারণ সান্ন্যাল, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতি—তাঁরা সঙ্গীতবিদ হলেও ওস্তাদ-সমাজের অন্তর্গত ছিলেন না। পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় অন্য রকম ব্যাপার। শালিয়াপিন ও ক্যারুসো প্রমুখ গায়করা ওস্তাদ বলে অক্ষয় যশ অর্জন করেছেন রঙ্গালয়ের গীতাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেই। ভাগনর প্রমুখ অমর সুরকাররা সুর সৃষ্টি করেছেন রঙ্গালয়ের গীতিনাট্যের জন্যেই।

যা হোক শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করানো গেল। "বসন্তলীলা" পালায় তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে অবতীর্ণ হয়ে কয়েকখানি গান গেয়ে লাভ করলেন অপূর্ব অভিনন্দন। তার পরে দেখা দিলেন "সীতা" পালায় বৈতালিকের ভূমিকায়। আমার রচিত "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" গানটি তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠের গুণে এমন উতরে গেল যে, তারপর থেকে ফিরতে লাগল পথে পথে লোকের মুখে মুখে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও ভ্রম ভেঙে গেল। রঙ্গালয়ের সম্পর্কে এসে গায়কসমাজে তাঁর খ্যাতি একটুও ক্ষুণ্ণ হলো না, ওদিকে জনসমাজে হয়ে উঠলেন তিনি অধিকতর লোকপ্রিয়।

তাঁকেও পেয়ে বসল থিয়েটারের নেশা। শিশির-সম্প্রদায় থেকে মিনার্ভা থিয়েটারে, তারপর রঙমহলে তিনি কেবল গানের সুর সংযোজনা নিয়েই নিযুক্ত হয়ে রইলেন না, রঙ্গমঞ্চের উপরেও দেখা দিতে লাগলেন ভূমিকার পর ভূমিকায় এবং প্রমাণিত করলেন, দৃষ্টিহারা হয়েও তিনি করতে পারেন উল্লেখযোগ্য অভিনয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোন না কোন দিক দিয়ে নাট্য-জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বজায় না রেখে পারেন নি। সাধারণ রঙ্গালয় ছেড়েছেন বটে, কিন্তু বাস করছেন চলচ্চিত্রের জগতে। সেখানেও সুর দিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন, অভিনয় দেখিয়েছেন, পরিচালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে উপ্ত ছিল যে গুপ্ত নাট্যনিপুণতা, শিশির-সম্প্রদায়ের প্রসাদেই ফলেছে তাতে সোনার ফসল।

এক সময়ে আমি সঙ্গীত রচনার প্রেরণা লাভ করতুম কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই। আমার রচিত গান গাইবার জন্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং আমার কাছ থেকে চাইতেন গানের পর গান। এবং আমিও সমর্পণ করতুম গানের পর গান তাঁর হাতে। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জমীরুদ্দীন খাঁ, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর ও শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি আরো বহু শিল্পী আমার অনেক গানে সুর সংযোজন করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আমার যত গানে সুর দিয়েছেন তার আর সংখ্যাই হয় না। তাঁর গলায় নিজের গান শোনবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতুম এবং বাংলার জনসাধারণের ঔৎসুক্যও যে কম ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমার দ্বারা রচিত ও কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা গীত 'নয়ন য' দিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইবো গো', 'চোখের জলে মন ভিজিয়ে যায় চলে ঐ কোন্ উদাসী', 'মন-কুসুমের রংভরা এই পিচকারীটি রাধে', 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে' ও 'শিউলী, আমার প্রাণের সখি, তোমায় আমার লাগছে ভালো' প্রভৃতি আরও বহু গানের অসাধারণ লোকপ্রিয়তা দেখে।

হ্যাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠের ইন্দ্রজাল উপভোগ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতুম সত্য সত্যই। তিনিও আমাকে হতাশ করতেন না। প্রতি মাসেই অন্তত একবার করে সদলবলে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন এবং আমাকে শুনিয়ে দিতেন গানের পর গান। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল এবং আমার রচিত বাংলা গান কিছুই বাদ যেত না। কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাত্রি হয়ে উঠত গভীর, কিন্তু আমাদের কোনই হুঁশ থাকত না, হারিয়ে ফেলতুম সময়ের পরিমাপ।

কখনো কখনো পূর্ণিমার রাত্রে তেতলার ছাদের উপর বসত গানের আসর। নীলাকাশে চাঁদমুখের রুপোলী হাসি, সামনে জ্যোৎস্না-পুলকিত গঙ্গার চলোর্মি-সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের অমৃতায়মান কণ্ঠে সুরের সুরধুনী, এই বিচিত্র ত্রয়ীর মিলনে দৃশ্য ও শ্রাব্য সৌন্দর্যে চিত্ত হয়ে উঠত ঐশ্বর্যময়। পূর্ণিমার সেই বৈঠকে মাঝে মাঝে এসে যোগ দিতেন চিত্রতারকা কল্যাণীয়া শ্রীমতী চন্দ্রাবতী বা অন্য কোন গুণীজন। তাঁদের উপস্থিতি অধিকতর উপভোগ্য করে তুলত বৈঠককে। আজ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি—হায়, সে আনন্দের মুহূর্তগুলি আর ফিরে আসবে না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র আজও বিদ্যমান বটে, কিন্তু আমার সহধর্মিণীর পরলোকগমনের পর ভেঙে গিয়েছে সেই আনন্দের আসর।

যাঁরা ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ওস্তাদ আখ্যা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্যাদা রাখতে পারেন না। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে একান্ত নারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র এ-শ্রেণীর ওস্তাদ নন। তাঁর কণ্ঠে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সঙ্গীতও। কেবল তাই নয়, যে কোন শ্রেণীর সঙ্গীতে আছে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর সিদ্ধ সাধনা সর্বতোমুখী।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একজন আজ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হচ্ছেন ত্রিপুরার কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মণ।

## প্রথম

### আবার সেই ত্রিমূর্তি

ঘন ঘন কড়া-নাড়ার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে চড়া-গলায় চিৎকার ঃ

"জয়ন্ত, জয়ন্ত, ওহে ভায়া! বলি, ঘুম ভাঙল নাকি?"

দরজা খুলে গেল। জয়ন্তের চাকর মধুর আবির্ভাব।

—"এই যে মধু। তোমার মনিব কি করছেন বাপু?"

—"মানিকবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছেন।"

—"বল কি! এরি মধ্যে চায়ের আসর বসে গেছে? হুম্!"

ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর সুন্দরবাবু বিপুল উৎসাহে সুমুখ থেকে মধুকে সরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন—কারণ তিনি জানতেন যে, এ-বাড়ির প্রভাতী চায়ের আসর হচ্ছে দস্তুরমত সমারোহের ব্যাপার! চায়ের নামেই চন্‌মন্ করে উঠেছে তাঁর উদরস্থ ক্ষুধা।

আসরে প্রবেশ করেই সুন্দরবাবু তাঁর সেই বিখ্যাত 'হুম্' শব্দটি সজোরে উচ্চারণ করলেন।

জয়ন্ত বললে, "আরে আরে সুন্দরবাবু যে! আসুন, আসুন।"

—"তোমাদের চা-পর্ব শেষ হয়ে গেছে দেখছি।" সুন্দরবাবুর কণ্ঠে নিরাশার সুর।

জয়ন্ত বললে, "রবীন্দ্রনাথের ভাষা ঈষৎ বদলে আমি বলতে পারি—

"উঁহু, শেষ করা কি ভালো ?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
দি নিবিয়ে আলো' !"

সুন্দরবাবু ভুরু কুঁচ্‌কে বললেন, "আমি কাব্যি-টাব্যি বুঝি না। ওর মানেটা কি হলো ?"

—"ওর মানেটা হলো এই যে, তেল যখন ফুরোয়নি আলো আবার জ্বলতে পারে—অর্থাৎ চা আবার আসতে পারে !"

—"চা আবার আসতে পারে ? সাধু, সাধু !"

মানিক বললে, "কিন্তু সুন্দরবাবু, আজকে তরল চায়ের সঙ্গে নিরেট আর কিছু প্রার্থনা করবেন না।"

—"কেন ? দু-চারখানা ওমলেটও পাব না ?"

—"পেতে পারেন, কিন্তু খারাপ ডিমের ওমলেট খেতে হবে !"

—"খারাপ ডিম মানে ? পচা ?"

—"ধরুন তাই। আমাদের ডিমগুলো এবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

—"কিন্তু তোমাদের প্লেটে তো দেখছি এখনো দু-এক টুকরো ওমলেট বিরাজ করছে !"

—"আমরা খারাপ ডিমের ওমলেট খেয়েছি।"

—"ধেৎ, তাও কি সম্ভব ?"

—"কেন সম্ভব নয় ? বাজারের বাজে চায়ের দোকানের মালিকরা ডিম খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দেয় নাকি ? খদ্দেরদের সেই সব ডিমের ওমলেট খাইয়েই তারা পয়সা আদায় করে। খারাপ ডিমের ওমলেট গরম-গরম খেলে কিছু টের পাওয়া যায় না কিনা !"

—"কিন্তু অসুখ করতে পারে তো ?"

—"তা পারে। হয়তো কলেরা হবার সম্ভাবনাও থাকে।"

—"বাপ রে, এ-সব জেনে-শুনেও তোমরা খারাপ ডিমের ওমলেট খেয়েছ?"

—"খেয়েছি। সুন্দরবাবু, লোভ ভারী পাজী জিনিস।"

—"অমন লোভের মুখে আমি মরি ঝাড়ু! আমি আজ ওমলেট খেতে চাই না।"

জয়ন্ত হেসে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে মধু, সুন্দরবাবুর জন্যে—"

জয়ন্তের কথা শেষ হবার আগেই 'ট্রে' হাতে করে মধু হাসতে হাসতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে বললে, "আমাকে আর ডাকছেন কেন বাবু? সুন্দরবাবুকে দেখেই আমি খাবার তৈরি করে ফেলেছি।"

—"কি খাবার তৈরি করেছ? ওরে বাবা, ওমলেট?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ওমলেট খেতে ভালোবাসেন বলে—"

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে মাথা এবং হাত নেড়ে বললেন, "না, না, আমি পচা ডিমের ওমলেট খেতে মোটেই ভালোবাসি না। ওগুলো বরং জয়ন্ত আর মানিককে দাও।"

মানিক খিল্‌খিল্ করে হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, ওমলেট না খেলে আপনিই ঠকে যাবেন।"

—"হুম্, ঠকি ঠকব। পচা ডিমের ওমলেট খেয়ে আমি পটল তুলে জিততে চাই না।"

—"কি করে জানলেন পচা ডিম?"

—"তুমিই তো বললে বাপু?"

—"আমি আপনার সঙ্গে একটু মস্করা করছিলুম।"

—"মস্করা? আমার সঙ্গে মস্করা করছিলে? আস্কারা পেয়ে দিনে দিনে তুমি বড্ড বেড়ে উঠেছ? দেখছি একদিন তোমার সঙ্গে আমাকে মল্লযুদ্ধ করতে হবে।"

মানিক নিজের দুই উরুতে চপেটাঘাত করে বললে, "বেশ তো, আজকেই একহাত হয়ে যাক্ না?"

—"যাও যাও ডেঁপো ছোকরা! আমি ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করতে চাই না!"

—"ঠিক কথা বলেছেন, এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন। আপাতত ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ না করাই ভালো, কারণ ঐ হাতেই আপনাকে এখনি ওমলেট ভক্ষণ করতে হবে!"

—"মানিক, তোমার মুখ দেখলে আমার রাগ হয়! জয়ন্ত, তোমার এই বন্ধুটির জন্যে আমাকে এ-বাড়িতে আসা বন্ধ করতে হবে দেখছি।"

জয়ন্ত বললে, "মানিক, সুন্দরবাবুর পিছনে তুমি এমন করে লেগে থাকো কেন বল দেখি?"

মানিক বললে, "ওঁকে ভারী ভালোবাসি কিনা!"

সুন্দরবাবু বললেন, "যাও, যাও! তোমার ভালোবাসা পেতে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি জয়ন্তের সঙ্গে পরামর্শ করতে।"

—"কি পরামর্শ সুন্দরবাবু?" জয়ন্ত বললে।

—"বলছি ভায়া বলছি। আগে রাগটা খানিক সামলে নি। মানিকের জন্যে দেখছি আমার 'ব্লাড-প্রেসার' বেড়ে যাবে।"

## দ্বিতীয়

## শনি-মঙ্গলের কাণ্ড

চা-পর্ব সমাপ্ত হলো। একখানা গদী-মোড়া আরাম-আসনে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে, পরিতৃপ্ত উদরের সমস্ত আনন্দ একটিমাত্র "হুম্" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে সুন্দরবাবু বললেন, "বড়ই গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি দাদা!"

জয়ন্ত বললে, "কি রকম?"

—"একেবারে নতুন রকম মামলা। মামলার সূত্র ডুব মেরেছে সমুদ্রের অগাধ জলের তলায়। ডুবুরী হয়ে সেই সূত্র উদ্ধার করবার ভার পড়েছে এই হতভাগ্যেরই উপরে।"

—"মামলাটা কিসের?"

—"খুনের। একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনটে খুন।"

—"ঘটনাক্ষেত্র?"

—"রতনপুর, চব্বিশ পরগণার একটি বড় গ্রাম।"

—"আপনি কলকাতা-পুলিশে কাজ করেন, এ মামলার ভার আপনার উপরে পড়েছে কেন?"

—"ও-অঞ্চলের পুলিশ এখানকার সাহায্য প্রার্থনা করেছে।"

জয়ন্ত একটু উৎসাহিত হয়ে বললে, "তাহলে বোধ হচ্ছে মামলাটার ভিতরে কিঞ্চিৎ বস্তু আছে।"

—"বস্তু না ছাই। আমি তো দেখছি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া।"

—"ধোঁয়ার তলাতেই থাকে আগুন। মামলাটা বুঝিয়ে বলুন দেখি। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করুন।"

—"শোনো তবে। মহেন্দ্রনাথ ঘটক হচ্ছেন রতনপুর গ্রামের একজন বড় গৃহস্থ। এখন তাঁর বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রথম জীবনে কোন্ রাজ-'স্টেটে' ম্যানেজারের পদে বসে তিনি বেশ কিছু

টাকা রোজগার করেন। এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের গ্রামে এসে বসেছেন। যে টাকা জমিয়েছেন, তারই সুদের মহিমায় ইহকালের জন্যে তাঁর আর কোনই ভাবনা নেই। এমন কি নিজের মোটর ছাড়া রাজপথে তিনি এক পদ অগ্রসর হন না। বাড়িতে প্রায়ই উৎসবাদির সমারোহ হয়। কেবল গ্রামের মাতব্বররা নন, কলকাতা থেকেও তাঁর অনেক হোমরা-চোমরা বন্ধু সেই-সব উৎসবে যোগ দিতে আসেন।

কিছুদিন আগে এই রকম আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন মহেন্দ্রবাবুর এক মামাতো ভাই, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ। তিনিও খুব ধনী লোক।

সেদিনটা ছিল শনিবার। সন্ধ্যার সময়ে বৈঠকখানায় বসে মহেন্দ্রবাবু সুরেন্দ্রবাবু আর রতনপুর থানার দারোগা কৈলাসবাবু আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে করছিলেন গল্পগুজব। কি কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রবাবু বললেন, "আমাদের গ্রামের খুব কাছেই একটি ডাকাতে-কালীর মন্দির আছে। মন্দিরটি অনেককালের পুরানো। আগে সেখানে প্রতি শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে নরবলি দেওয়া হোত। এখন দেবীর ডাকাত-ভক্তরা আর নেই, প্রতি শনি আর মঙ্গলবারে নরবলিও আর দেওয়া হয় না, এমন কি মায়ের নিত্য পূজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ, যে-কোন দিন দেবীর মাথার উপরে হুড়মুড় করে ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু ঐ ভগ্ন-মন্দিরের জীর্ণ দেবতার নাম শুনলে এ-অঞ্চলের লোক আজও আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আজও মানুষের রক্ত খাবার লোভে প্রতি শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে ঐ ডাকাতে-কালীর পাষাণ-মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই ঐ দুই দিনের রাত্রে এ-অঞ্চলের কোন লোকই ঐ মন্দিরের কাছ দিয়েও হাঁটে না। শোনা গেছে, বহুকাল আগে কোন কোন দুঃসাহসী লোক শনি-মঙ্গলের রাত্রে গুজবের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে মন্দিরের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি।

পরদিন প্রভাতে মন্দির-চত্বরে পাওয়া গিয়েছিল তাদের মৃতদেহ।”

মহেন্দ্রবাবুর কথা শুনে কলকাতা থেকে আগত সুরেনবাবু আর এখানকার থানার দারোগাবাবু একসঙ্গে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

সুরেনবাবু বললেন, ‘আমি হচ্ছি পয়লা নম্বরের নাস্তিক, চোখে দেখা যায় না বলে ভগবানকেই মানি না, আর আমাকেই তুমি কিনা এই পাড়াগেঁয়ে গুজবে বিশ্বাস করতে বলো?’

দারোগাবাবু বললেন, ‘আমি হচ্ছি পুলিশ। মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ভূত পেত্নী বা তন্ত্র-মন্ত্র কিছুই আমরা মানি না। কালী বলে কোন দেবী সত্য সত্যই আছেন কিনা জানি না, কিন্তু এটা আমি জানি আর মানি যে, জড় পাথরের ভিতরে কোনদিনই জীবন-সঞ্চার হয় না।’

মহেন্দ্রবাবু বললেন, ‘আমি কারুকেই কিছু বিশ্বাস করতে বা মানতে বলছি না। কিন্তু আজই তো শনিবারের রাত। গুজবের সত্যতা পরীক্ষা করবার মতো বুকের পাটা আমার নেই, কিন্তু তোমাদের সাহস থাকে তো তোমরা দু-জনে অনায়াসেই একসঙ্গে ঐ মন্দিরটা একবার দেখে আসতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, এ-বিষয়ে আমার কোন দায়িত্বই নেই।’

দারোগাবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন, ‘সারাদিন খাটুনির পর এই রাত্রে ছুটোছুটি করবার উৎসাহ আমার নেই। গুজব সত্য কিনা দু-দিন পরেও পরীক্ষা করা যেতে পারে।’

সুরেনবাবু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কাল আমায় কলকাতায় ফিরতেই হবে, অতএব আজকেই আমি মন্দিরটা একবার দেখে আসতে চাই।’

মহেন্দ্রবাবু বললেন, ‘কিন্তু সুরেন, তোমাকে একলাই যেতে হবে, কারণ আমার এখানকার চাকর-বাকররা পর্যন্ত তাদের মনিবেরও হুকুমে ঐ মন্দিরের ত্রিসীমানায় যেতে রাজী হবে না।’

সুরেনবাবু বললেন, 'আমি কাপুরুষ নই, একলা যাবার সাহস আমার আছে। কিন্তু আমায় একটা বন্দুক দিতে পারো ?'

মহেন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'বন্দুক কি করবে ?'

হো হো স্বরে হেসে উঠে সুরেনবাবু বললেন, 'পাথরের মূর্তি যদি জ্যান্ত হয় তাহলে গুলি করে তাকে হত্যা করব! কি বলেন দারোগাবাবু, পাথরের মূর্তিকে হত্যা করতে চাইলে আপনাদের পুলিশের আইন বাধা দেবেন না তো ?'

দারোগাবাবু হেসে বললেন, 'আইনের কেতাবে জীবন্ত শিলা-মূর্তির কথা কোথাও লেখা নেই।'

মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে একটা দো-নলা বন্দুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সুরেনবাবু বললেন, 'আপনারা সকলে এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে ডিনার খাব।'

এক ঘণ্টা গেল, দুই ঘণ্টা গেল, তিন ঘণ্টা গেল। সুরেনবাবুর দেখা নেই। সকলে ভীত, বিস্মিত আর চিন্তিত হয়ে সেইখানে বসে রইলেন। আতঙ্ক এমন সংক্রামক যে, সদলবলে সকলে মিলে সেই রাত্রে মন্দিরের কাছে একবার যাবার ব্যবস্থা পর্যন্ত হলো না। পূর্বদিকে ভোরের আলো ফুটল—তখনো সুরেনবাবু অনুপস্থিত। তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার হলো সাহসের সঞ্চার। মহেন্দ্রবাবু দলবল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

মন্দিরে যাবার জন্যে একটিমাত্র সুপথ বা প্রধান রাস্তা আছে। পিছন দিক দিয়েও নাকি মন্দিরের ভিতরে আসা যায়, কিন্তু ওদিকে পথের মতো পথের কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক কাঁটাঝোপ, জঙ্গল আর বাঁশঝাড় ভেঙে ঐদিক দিয়ে মন্দিরে আসতে হয়, দিনের বেলাতেও তাই ওদিকে পথিক দেখা যায় না।

সুরেনবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গেল মন্দিরে যাবার প্রধান পথের উপরেই। তাঁর দেহে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন নেই, কেবল তাঁর

কণ্ঠদেশের ডানদিকে একটি সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম রক্তের দাগ! অর্থাৎ দেহের উপরে আলপিন্ বা সূচ বিঁধিয়ে দিলে সে-রকম দাগ হতে পারে! কিন্তু লাসের আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সূচের মতো কোন কিছু পাওয়া যায়নি। পরে ডাক্তারী-পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সুরেনবাবু মারা পড়েছেন বিষের ফলেই।

দারোগা কৈলাসবাবুর উপরই মামলার ভার পড়ল। কিন্তু মামলা হাতে নিয়ে তিনি কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না।

কৈলাসবাবু ভীতু লোক ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, শনি-মঙ্গলের কোন অলৌকিক কারণে ঐ মন্দির যে মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে, এই অদ্ভুত গুজবের মূলে কিছুমাত্র সত্য নেই। আর এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি পরের মঙ্গলবারের রাত্রে একলা লুকিয়ে মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। সেই হলো তাঁর শেষ যাত্রা। বুধবার সকালে তাঁরও মৃতদেহ পাওয়া যায় মন্দিরের ঐ প্রধান পথের উপরই। তাঁরও বাম হাতের উপরে তেমনি একটা সূচ-বেঁধার মতোন রক্তাক্ত দাগ আর তাঁরও দেহে পাওয়া যায় বিষের চিহ্ন। কেবল তাই নয়, ঠিক যে জায়গাটিতে সুরেনবাবুর লাস পাওয়া যায় কৈলাসবাবুর মৃতদেহও পড়েছিল ঠিক সেই স্থানটিতে।

তার পরের কথা আরও সংক্ষেপে সেরে নি। দ্বিতীয় ঘটনার পরের শনিবারেই আর একজন পুলিশ কর্মচারীও রাত্রে গোপনে মন্দিরের কাছে তদন্ত করতে গিয়ে ঠিক ঐ ভাবেই মারা পড়েছে। এবার সূচ-বেঁধার চিহ্ন ছিল তার বাম পায়ের উপরে। তারও মৃত্যুর কারণ বিষ, আর তারও দেহ পাওয়া যায় ঠিক সেই জায়গাটিতে।

এইবার মামলার ভার পড়েছে তোমাদের এই অভাগা সুন্দরবাবুর কাঁধের উপরে। কিন্তু ভায়া, আমার অতিশয় সন্দেহ হচ্ছে, এ-ভার আমি সহ্য করতে পারব না। এটা কি রকম মামলা? নরহত্যা-কারিণী ডাকাতে-কালীকে অপরাধিনীরূপে সামনে রেখে আমি

যদি মামলার তদন্তে নিযুক্ত হই. তাহলে আমার নাম শুনলেই সারা দেশ অট্টহাস্য করে উঠবে।

তারপর কেবল শনি আর মঙ্গলবারেই ঐ মন্দিরের কাছে যাওয়াটা বিপজ্জনক কেন? শুনেছি, তৃতীয় ঘটনার রাত্রে যে পুলিশ কর্মচারীটি মন্দিরের পথে নিহত হয়, সে নাকি শনি-মঙ্গলবার ছাড়া অন্যান্য দিনেও গোপনে ঐ মন্দিরের কাছে তদন্ত করতে যেত। কিন্তু অন্যান্য দিনে কোন দুর্ঘটনাই হয়নি, সে সন্দেহজনক কিছুই দেখেনি আর ফিরেও এসেছিল নিরাপদে। এই-ই বা কি রহস্য? তোমার কি মনে হয় না জয়ন্ত, এর মধ্যে যেন কেমন একটা ভুতুড়ে গন্ধ আছে?

প্রত্যেক হত্যার পিছনেই একটা কোন উদ্দেশ্য থাকে। এমন কি উদ্দেশ্য না পেলে আইন কোন হত্যাকারীকেই শাস্তি পর্যন্ত দিতে পারে না। উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ড নিয়ে মস্তিষ্কচালনা করা হচ্ছে নিতান্তই পণ্ডশ্রম। এ-মামলাটাও যেন সেই শ্রেণীর।

ধরো, মহেন্দ্রবাবুর মামাতো ভাই সুরেনবাবুর কথা। তিনি স্থানীয় লোক নন্। এখানকার কোন লোকেরই তাঁর উপর আক্রোশ থাকবার কথা নয়। তিনি মাত্র দুইদিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন। তিনি যে প্রথম ঘটনার রাত্রে হঠাৎ ঐ মন্দিরে যেতে চাইবেন, এ-কথাও বাইরের কেউ জানত না। যারা জানত তারা সকলেই সারারাত্রি বসে ছিল মহেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানার ভিতরেই তবু ঘটনাস্থলে গিয়ে কে তাঁকে হত্যা করলে, আর কেনই বা করলে? তাঁকে হত্যা করে কার কী লাভ?

তারপর ধরো, দু-জন পুলিশ কর্মচারীর কথা! তাদেরই বা কেন হত্যা করা হলো, তারা তো সন্দেহজনক কোন সূত্রেরই সন্ধান পায়নি! দ্বিতীয় পুলিশ কর্মচারী শনি-মঙ্গল ছাড়া অন্য অন্য বারেও যে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল, এ কথাটাও ভুলো না। এই মামলার ভিতরে যদি কোন মানুষ-খুনীর হাত থাকত, তাহলে সে অন্য অন্য

বারের সুযোগ পেয়েও পুলিশের লোককে ছেড়ে দিলে কেন ?

পুলিশের কেউ কেউ সন্দেহ করছে, কোন বিষধর জীবের দংশনেই তিনজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এ-যুক্তি মনে লাগে না। ঐ বিষধর জীব কি শনি-মঙ্গলবারেই ঠিক একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে অপেক্ষা করে ? এ কোন কাজের কথা নয়।

আর ঐ সূচ-বেঁধার ব্যাপারটাই বা কি ? কে সূচ বেঁধায়! লাসের সঙ্গে বা কাছে সূচ পাওয়া যায় নাই বা কেন ? আর এত অস্ত্র থাকতে সূচের মতোই বা অস্ত্র ব্যবহার করা হয় কেন ?

বড়ই জটিল ব্যাপার ভায়া, বড়ই জটিল ব্যাপার! এ-মামলাটা হাতে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে সেই 'মানুষ-পিশাচ' মামলাটার কথা। সন্দেহ হচ্ছে তার মতো এ-মামলাটার সঙ্গেও নিশ্চয় কোন ভৌতিক যোগাযোগ আছে! সেই ভয়াবহ অপরাধী নবাব আর তার অনুসারী জীবন্ত মৃতদেহগুলোর কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভুলে যাওনি ? আগে আমি ভূত-প্রেত কিছুই বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু সেই মানুষ-পিশাচদের পাল্লায় পড়ে আমি সে-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তারপর থেকে বুঝেছি পৃথিবীতে অপার্থিব অলৌকিক ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

জয়ন্ত, মানিক, এখন তোমাদের মত কি তাই বলো।"

কাহিনী শেষ করে সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু জয়ন্ত কোন কথাই বললে না, গম্ভীর ও স্তব্ধ ও স্থিরভাবে বসে রইল।

মানিক বললে, "তাই তো সুন্দরবাবু, আপনার জন্যে আমি দুঃখিত হচ্ছি।"

সুন্দরবাবু মানিকের দুঃখকে আমল দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "তোমার দুঃখ নিয়ে তুমিই থাকো বাপু, আমাকে আর জ্বালাতে এস না।"

নাছোড়বান্দা মানিক বললে, "যত-সব ওঁচা মামলার ভার পড়ে

আপনার উপরে! কেন, পুলিশে কি আর যোগ্য লোক নেই!"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে বললেন, "তা যা বলেছ! আমি যেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো!"

মানিক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, "বেচারা সুন্দরবাবু! মাথা-জোড়া টাক, একটু বেশি রোদ লাগলেই ফটাং করে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ; বামন হাতীর মতো নাদুস-নুদুস দেহ, দু-পা দৌড়তে গেলেই হাপরের মতোন হাঁপাতে থাকে ; বড় জাতের ধামার মতোন ভুঁড়ি, তার খোরাক যোগাতে যোগাতেই সারাদিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়—আর তার উপরেই কি না যত অত্যাচার!"

মহাক্রোধে সুন্দরবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তখনি আসন ত্যাগ করে তিনি বললেন, "জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসে আমি ভুল করেছি। যেখানে মানিক আছে সেখানে আর আমি নেই!" সুন্দরবাবু দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

জয়ন্ত বললে, "দাঁড়ান সুন্দরবাবু।"

—"দাঁড়াব? কেন দাঁড়াব? আরো বেশি অপমানিত হবো বলে?"

—"না, না, আর কেউ আপনাকে অপমান করবে না। আসন গ্রহণ করুন। এখন বলুন দেখি, আপনি খালি আমার পরামর্শ চান, না আমার সাহায্য চান?"

—"তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে রাজী হও, তাহলে তো আমার অনেক পরিশ্রমই হাল্‌কা হয়ে যায়!"

—"হ্যাঁ, আমি রাজী। কবে রতনপুর যাচ্ছেন?"

—"কাল।"

—"বেশ, কালই আমরা আপনার সঙ্গী হবো।"

—"কিন্তু মানিক কি না গেলেই নয়?"

—"না। মানিক যে আমার ডান হাত।"

## তৃতীয়

## রতনপুরের ডাকাতে-কালী

রতনপুর গ্রামখানি যে অত্যন্ত পুরাতন, দেখলেই তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। গ্রাম না বলে তাকে অবৃহৎ শহর বলাই উচিত। তার পথে পথে ছোট ও মাঝারি পাকা বাড়ির সংখ্যা তো কম নয় বটেই, অট্টালিকা আখ্যা পেতে পারে কয়েকখানা এমন বাড়িও চোখে পড়ে। কিন্তু একখানা ছাড়া বাকি সব অট্টালিকাই স্মরণ করিয়ে দেয় মান্ধাতার আমলের কথা। যে অট্টালিকাখানি পুরাতন নয় সেখানির অধিকারী হচ্ছেন মহেন্দ্রবাবু, তাঁর বৈঠকখানার মধ্যেই হয়েছে আমাদের এই কাহিনীর সূত্রপাত।

রতনপুরকে একটি ছোটখাটো শহর বলা চললেও তার অবস্থান হচ্ছে বেশ একটু অসাধারণ। তার চারিধারেই বিরাজ করছে বড়ো বড়ো প্রান্তর এবং পশ্চিম দিকের প্রান্তরের মাঝখানে পাওয়া যায় একটি রীতিমতো গহন বন। সেই বনের ভিতরের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকাতে-কালীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গ্রাম থেকে মন্দিরে যেতে গেলে পথের মাঝে পাওয়া যায় ছোট্ট একটি নদী। একটি কাঠের সাঁকোর সাহায্যে সকলে নদীর উপর দিয়ে আনাগোনা করে। রতনপুরের কাছ থেকে রেল লাইন আছে বেশ খানিকটা দূরে এবং সেই জন্যেই তাকে অনায়াসেই বলা চলে একটি বিচ্ছিন্ন গ্রাম বা শহর।

সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক ট্রেন থেকে নেমে পড়ে দেখলে, তাদের বহন করবার জন্যে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে একখানি মোটর গাড়ি। এই গাড়িখানির মালিক মহেন্দ্রবাবু নিজেই এগিয়ে এসে সুন্দরবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন।

নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পালা শেষ হবার পর সুন্দরবাবু

জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনি কি করে জানলেন যে আজ আমরা এখানে আসবো ?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'গ্রামে যে কাণ্ডটা হয়ে গেলো, তারপর সব খবর না রাখলে যে চলে না। থানায় গিয়ে জানতে পারলুম আজ এখানে আপনার আগমনের কথা। তাই আমি আপনাকে গ্রামে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করেছি।'

সুন্দরবাবু খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ করেছেন, খুব বন্ধুর কাজ করেছেন। স্টেশন থেকে গ্রাম নাকি পাঁচ ছয় মাইলের কম নয়। শুনেছি এখানে পাল্কী, গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোনরকম যান পাওয়া যায় না। ঘোড়ার গাড়িতে গেলেও কম সময় লাগতো না। আপনার মোটর আমাদের অনেকটা সময় বাঁচিয়ে দেবে।'

এই প্রাথমিক কথাবার্তার সময় জয়ন্তের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিলো মহেন্দ্রবাবুর উপরে। নূতন কোনো লোক দেখলেই জয়ন্তের সূক্ষ্মদৃষ্টি তার মনের অন্দর-মহল পর্যন্ত লক্ষ করবার চেষ্টা করতো, এটি হচ্ছে তার চিরকালের স্বভাব।

মহেন্দ্রবাবু লোকটি হচ্ছেন না-লম্বা না-বেঁটে, না-রোগা না-মোটা। তাঁর গায়ের রঙ ধব্‌ধবে ফর্সা, সাজ-পোশাকে রীতিমতো শৌখিনতার চিহ্ন। চোখে সোনার চশমা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, হাতেও একগাছা সোনায় বাঁধানো বেশ মোটা পাকা বাঁশের লাঠি। তাঁর শৌখিন সাজ-পোশাকের সঙ্গে ঐ পাকা বাঁশের লাঠিগাছা মানাচ্ছিলো না একেবারেই।

জয়ন্ত লক্ষ করলে, মহেন্দ্রবাবুর চেহারার তিনটি বিশেষত্ব প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : তাঁর অতি অমায়িক ভাব, তাঁর দু'টি সরল চক্ষু, তাঁর শিশুর মতোন মিষ্ট হাসি।

জয়ন্ত ও মানিকের দিকে দৃষ্টিপাত করে মহেন্দ্রবাবু শুধোলেন, 'ঐ দু'টি ভদ্রলোকও কি আপনার সঙ্গে এসেছেন ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁরা আমার বন্ধু আর দস্তুরমতো নামজাদা লোক। নাম শুনলে অন্তত ওঁদের একজনকে আপনি হয়তো চিনতে পারবেন।'

মহেন্দ্রবাবু কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, 'বটে, বটে? তা ওঁদের নাম জানতে চাইলে ওঁরা কোনো অপরাধ নেবেন না তো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বিলক্ষণ! অপরাধ আবার কিসের?'

মহেন্দ্রবাবু সঙ্কুচিত স্বরে বললেন, 'আজকাল আমি হচ্ছি পাড়াগেঁয়ে লোক, হালের শহুরে ফ্যাশানের কথা কিছুই জানি না তো! কারুর কারুর মুখে শুনেছি, গায়ে পড়ে নাম জানতে চাইলে আজকালকার শহুরে বাবুরা নাকি মুখভারী করেন।'

সুন্দরবাবু হো হো করে হেসে বললেন, 'আরে না না মশাই, ওরা মোটেই সে-জাতীয় মনুষ্য নয়। ওদের দেখতে ছোকরা বটে, কিন্তু ওরা আপনার আমার মতোই সেকেলে। আপনি কি শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত আর তার স্যাঙাৎ মানিকের নাম শোনেননি?'

মহেন্দ্রবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বলেন কি স্যর, তাও আবার শুনিনি? আপনি কি বলতে চান ওঁরাই হচ্ছেন জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। ওরা ঐ নামেই পরিচিত বটে।'

তাড়াতাড়ি জয়ন্তকে নমস্কার করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এতক্ষণে চিনতে পেরেছি। কাগজে যে আপনার ছবি অনেক বার দেখেছি। আপনার নাম জানে না বাংলাদেশে এমন কে আছে? দেশবিদেশেও যে আপনার নামে ওড়ে জয় পতাকা। আর মানিকবাবু, আপনার নামও—'

মানিক বাধা দিয়ে বললে, 'স্তব্ধ হোন মহেন্দ্রবাবু, স্তব্ধ হোন! অত্যুক্তি করে আপনি যদি আমাকেও আকাশে তোলেন তাহলে জানবেন যে, জয়ন্তচন্দ্রের পাশে আমি হচ্ছি একটি ক্ষুদ্র মানিক-তারকা মাত্র।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আপনি দেখছি সুন্দর ভাষায় বিনয় প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু—'

মানিক বাধা দিয়ে বললে, 'ও কিন্তু-টিন্তুর কথা; ছেড়ে দিন মহেন্দ্রবাবু! বাজে কথার দরকার নেই, কাজের কথা বলুন।'

মহেন্দ্রবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'কি কাজের কথা বলবো মানিকবাবু! আমি তো কিছুই জানি না, ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে আছি, আমার নিজের বলবার কথা কিছুই নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'আসুন, আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, গাড়িতে যেতে যেতেই বাকি কথা হবে।'

সকলে গাড়ির উপরে গিয়ে বসলেন। চালক গাড়ি চালিয়ে দিলে। জয়ন্ত চালকের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, আপনার ড্রাইভারটি দেখছি এদেশের লোক নয়।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এর মধ্যে সেটাও আপনি লক্ষ করেছেন? হ্যাঁ, আমার এই ড্রাইভারটির স্বদেশ হচ্ছে বোর্নিও। ও চমৎকার গাড়ি চালায় আর আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী। আমার জন্যে ও হাসি-মুখে প্রাণ দিতে পারে।'

তখন বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে মোটর গাড়ি। কোথাও ধু-ধু মাঠ, কোথাও তারই মাঝে মাঝে শ্যামল ও নিবিড় তরুকুঞ্জ, কোথাও নদী বা খাল-বিলের শীর্ণ ও সমুজ্জ্বল জলরেখা, এইসব দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে পিছনে ফেলে কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে মোটর গাড়ি।

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, যদি আমি দু-একটি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিতে আপত্তি করবেন না তো?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আপত্তি? কেন আপত্তি করবো? আমার তো আপত্তি করবার কোনোই কারণ নেই।'

জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, 'শুনলুম, প্রথমে যিনি মারা গেছেন, সেই সুরেনবাবু সম্পর্কে আপনার ভাই হন।'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'সুরেন আমার মেজো মামার ছেলে।'

জয়ন্ত বললে, 'সুরেনবাবু কি করতেন?'

—'সুরেন কিছুই করতো না। কারণ তার টাকার অভাব ছিলো না।

—'তাহলে বলতে হবে সুরেনবাবু একজন ধনী লোক?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সুরেনের মাসিক আয় ছিল আট হাজার টাকা।'

—'সুরেনবাবুর বাড়িতে কে আছে?'

—'কেউ নেই। সুরেন ছিল একেবারে একলা।'

—'তাঁর আত্মীয়স্বজন কে আছেন?'

—'আত্মীয়ই বলুন আর স্বজনই বলুন, আমিই হচ্ছি সুরেনের একমাত্র লোক। আমি ছাড়া এ-দুনিয়ায় সুরেনের আর কোনো আত্মীয়ই নেই।'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপর বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, ঐ কালী-মন্দিরের ব্যাপারটা কি বলুন দেখি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমারও অবস্থা তাই জানবেন। শুনে-ছিলুম একটা প্রবাদ, বন্ধুদের কাছে সেই গল্পই করেছিলুম। কিন্তু সেই গল্প থেকেই যে এমন ভীষণ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হবে, সেটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনি কি ঐ ভুতুড়ে গল্পে বিশ্বাস করেন?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আগে হয়তো ঠিক বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস না করে আর কি করি বলুন! পৃথিবীর খাতা থেকে একই ভাবে তিন-তিনটে মানুষের নাম কাটা গেলো! এর পর কি আর অবিশ্বাস করা চলে সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু আদালত তো আর ভূতের গল্প মানবে না!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানকার লোকেরাও এই কাহিনীকে

ভৌতিক কাহিনী বলে মনে করে না। তারা বলে এ-সব হচ্ছে দেবতার মাহাত্ম্য।'

—'হুম্! আরে মশাই, আমাদের মা-কালীরও যে ভূত-পেত্নী নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো অভ্যাস! যদি ঐ ঘটনাগুলো সত্য হয়, তাহলে তো আমরা নাচার! দুনিয়ায় এমন কোনো পুলিশ নেই, ভূত কি পেত্নীকে যে গ্রেপ্তার করতে পারে।'

মহেন্দ্রবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তাহলে এ-মামলাটা আপনারা হাতে করে নেবেন না?'

—'আরে কি যে বলেন, সরকারের হুকুম, আমি মামলা হাতে না নিলেও কমলী আমাকে ছাড়বে কেন? আগে তো তদন্ত শুরু হোক্, তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তবে কি জানেন, দেবদেবী নিয়ে কাণ্ড, এর ভেতরে মাথা গলাতেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছি না।'

গাড়ি রতনপুরের সীমানায় এসে পড়লো। দূর থেকে দেখা গেলো মস্ত বড়ো একখানা লাল রঙের বাড়ি প্রায় চার বিঘা জমি দখল করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারিধার বেড়ে রেলিং-ঘেরা ফল ও ফুল গাছের বাগান। ফটকের সামনে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে পোশাক-পরা দ্বারবান।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঐ হচ্ছে আমার বাড়ি। একবার ওখানে নামবেন নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি প্রথমেই দেখতে চাই ডাকাতে-কালীর মন্দির।'

—'সেখানে গিয়ে সব দেখতে-শুনতে হয়তো অনেক বেলা হয়ে যাবে। তার আগে দাসের এই গোলামখানায় পদার্পণ করে কিঞ্চিৎ জলযোগ আর চা পান করলে বেশি ক্ষতি হবে কি?'

সুন্দরবাবু নিজের ভুঁড়ির উপরে ডান হাতখানি রেখে বললেন, 'জয়ন্ত, ভদ্রলোক নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব করেননি।'

মানিক বললে, 'আমিও এই প্রস্তাবে সায় দিচ্ছি।'

জয়ন্ত বললে, 'বেশ, তবে তাই হোক্।'

মহেন্দ্রবাবুর নির্দেশে গাড়ি ফটকের ভিতরে ঢুকলো।

জয়ন্ত এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বাগানের গাছগুলো দেখছি অনেক কালের পুরানো!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় দেড়শো বছর আগে, আমার পূর্বপুরুষরা করেছিলেন এই বাগানের পত্তন। শুনেছি এখানকার কোনো কোনো গাছ প্রায় দুই শতাব্দীর হিসাব দাখিল করতে পারে। আমার এ-বাড়িখানিও পৈতৃক, এতো বড়ো বাড়ি তোলবার পয়সা আমার নেই। আমি কেবল ভার নিয়েছি মাঝে মাঝে মেরামত করবার, তাইতেই আমার খরচ হয়ে গেছে হাজার হাজার টাকা।'

একটি বড়ো গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে মোটর থামলো। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সকলে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

মহেন্দ্রবাবু একটা হলঘরে গিয়ে ঢুকে বললেন, 'আমার এই বৈঠকখানায় দয়া করে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করুন। ইতিমধ্যে আমি আপনাদের চায়ের ব্যবস্থাটা ঠিক করে আসি।'

সুন্দরবাবু একটি সুদীর্ঘ "আঃ" শব্দ উচ্চারণ করে একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বললেন, 'দেখবেন মহেন্দ্রবাবু, ব্যবস্থায় যেন বেশি বাড়াবাড়িটা না থাকে!'

—'না মশাই, আমরা হচ্ছি গেঁয়ো লোক, বাড়াবাড়ি করবার শক্তি আমাদের নেই। এই একটু চা আর একটু মিষ্টি, তাছাড়া আর কিছুই নয়' বলতে বলতে মহেন্দ্রবাবু ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মানিক হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দরবাবু, ঐ যে বাড়াবাড়ির কথা বললেন, ওটা কি আপনার আন্তরিক কথা?'

—'মানে?'

—'আয়োজনের বাড়াবাড়ি কি সত্যিই আপনি ভালোবাসেন

না? মহেন্দ্রবাবু যদি একখানার বদলে দু-খানা থালা ভরে মিষ্টান্ন এগিয়ে দেন, তাহলে কি আপনি সভয়ে পশ্চাৎপদ হবেন?'

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, 'মানিক, তুমি কি মনে করো আমি একটি মস্ত বড়ো উদর-পিশাচ?'

মানিক জিভ কেটে বললে, 'আরে ছ্যা ছ্যা, আপনাকে তো আমরা কেবল উদর-সেবক বলেই জানি।'

—'উদর-সেবক?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটি কি খারাপ নাম?'

—'হুম্!' বলেই সুন্দরবাবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে গুম্ হয়ে রইলেন।

জয়ন্ত এ-সব কথাবার্তা কিছুই শুনছিল না, তার দৃষ্টি ঘুরছিলো ঘরের এদিকে সেদিকে। ঘরখানি আধুনিক আদর্শে বেশ ভালো করেই সাজানো। সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার, পাথরের মূর্তি ও তৈলচিত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব নেই।

মহেন্দ্রবাবু আবার ফিরে এলেন, তাঁর পিছনে পিছনে দুইজন ভৃত্য এলো দু-খানা বড়ো বড়ো 'ট্রে'র উপরে আহার্যের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাপ্‌রে, এ-যে দেখছি রীতিমতো যজ্ঞির ব্যাপার! বিনা নোটিশে এক কথায় আপনি এতো বড়ো আয়োজনটা কেমন করে করলেন?'

মহেন্দ্রবাবু বিনীত কণ্ঠে বললেন—'দু-চারজন অতিথি-অভ্যাগত অধীনের বাড়িতে যখন তখন আসা-যাওয়া করে থাকেন, তাই আমাকে কিঞ্চিৎ প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। পল্লীগ্রাম কিনা, শহরের মতো বাজারে লোক পাঠালেই তো খাবার নিয়ে আসা যায় না।'

—'তাই তো, করেছেন কি, করেছেন কি?' বলতে বলতে সুন্দর-বাবু একখানা মস্ত ডালপুরীকে আক্রমণ করলেন বিপুল বিক্রমে।

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, ঘরের ঐ কোণে ঐ যে একটি বর্ম দাঁড় করানো রয়েছে, ওটি আপনি কোত্থেকে কিনেছেন?'

—'ওটি আমি কিনিনি, এক সাহেবের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। ওটি হচ্ছে সেকেলে বিলিতি বর্ম, আগ্নেয়াস্ত্র হবার আগে ইংরেজ যোদ্ধারা ঐ-রকম বর্মে আপাদমস্তক ঢেকে যুদ্ধযাত্রা করতো।'

সুন্দরবাবু এক গ্রাসে একটি বড়ো রসগোল্লা কোঁৎ করে গিলে ফেলে বললেন, 'বাস্ রে বাস্! অতো বড়ো ভারী লোহার বর্ম, ওর ভিতরে ঢুকলে যুদ্ধযাত্রা কি, আমি তো একটিমাত্র পদও অগ্রসর হতে পারতুম না!'

মানিক বললে, 'ওর ভিতরে আপনি ঢুকবেন? অসম্ভব!'

—'কেন, অসম্ভব কেন?'

—'নরহস্তীর জন্যে ও বর্ম তৈরি হয়নি।'

সুন্দরবাবু একবার কট্‌মট্ করে মানিকের দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

জয়ন্ত বললে, 'ও-বর্মের মধ্যে হয়তো আমার দেহের ঠাঁই হতে পারে। আর হয়তো বর্ম পরে চলাফেরা করতেও আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। কি বল হে মানিক?'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ জয়ন্ত, ও-বর্ম তোমারই উপযোগী বটে।'

জয়ন্ত বললে, 'ঐ চিত্তাকর্ষক বর্মটিকে ভালো করে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করবার আগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু আজ আর সময় নেই, সে-চেষ্টা আর একদিন করা যাবে। কি বলেন মহেন্দ্রবাবু, তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

—'আপত্তি? নিশ্চয়ই নেই!'

ওদিকে জয়ন্ত ও মানিকের অর্ধেক খাওয়া শেষ হবার আগেই সুন্দরবাবুর খাবারের থালা ও চায়ের পেয়ালা একেবারেই খালি হয়ে গেলো।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'একি সুন্দরবাবু, থালায় যে কিছুই নেই, আরো কিছু আনতে বলে দি'।

সুন্দরবাবু বাঁকা চোখে মানিকের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, সে মুখ টিপে টিপে দুষ্টুমির হাসি হাসছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'থাক্ মহেন্দ্রবাবু, সকালেই পেট ভারী করে খাওয়া ভালো নয়। তবে আর এক পেয়ালা চা খেতে আমার আপত্তি নেই।'

মানিক চুপি চুপি বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনার অদ্ভুত সংযম দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।'

সুন্দরবাবু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'স্টুপিড্!'

জলযোগ সেরে সকলে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি এবার ছুটলো সোজা কালী-মন্দিরের দিকে। মোটরে করে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে কালী-মন্দিরে গিয়ে পৌঁছতে আট-দশ মিনিটের বেশি লাগলো না।

মন্দিরটি সত্যই পুরাতন। তার উপর দিকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে এবং তার ফাটা জায়গাগুলো থেকে বাইরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অশথ ও বটগাছরা। একটা অশথ গাছ রীতিমতো বড়ো, মন্দিরের উপরের অনেক অংশ তার শাখা-প্রশাখার মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুরনো মন্দিরটা অতো বড়ো একটা গাছের ভার কি করে যে এখনো সহ্য করে আছে, সেটা ভাবলে বিস্ময় লাগে।

যে পথটা মন্দিরের চাতালে গিয়ে পড়েছে তার দুই দিকেই রয়েছে একটানা জঙ্গল। মন্দিরের পিছনেও অরণ্য, সেখানকার ঝোপঝাপ আরো বেশি নিবিড়। মন্দিরের চাতালের উপরেও আগাছার ভিড়।

বিজনতায় ও মানুষের যত্নহীনতায় এখানে কোনোদিকেই কোনো শৃঙ্খলা নেই বটে, কিন্তু বাহির থেকে দেখলে এই নিরিবিলি জায়গাটিকে বেশ শান্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। দিকে দিকে ছায়া-চিত্রের পাশে পাশে রোদ দিয়েছে সোনার আভাস ছড়িয়ে। গাঢ় সবুজের অন্তঃপুরে লুকিয়ে থেকে থেকে ডাকছে কপোত, ডাকছে

কোকিল, ডাকছে দোয়েল-শ্যামা! কোথা থেকে বাতাসে ভেসে আসছে অজানা কোন্ বনফুলের গন্ধ।

মানিক বললে, 'বাঃ, জায়গাটি আমার বেশ লাগছে!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানকার বাসিন্দা হলে আপনি বোধ হয় ও-কথা বলতে পারতেন না।'

—'কেন?'

—'দেখছেন না এতো কাছেই লোকালয়, তবু এখানে অরণ্য কতো নিবিড় হয়ে উঠেছে! লোকালয়ের কাছে এতো নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা আপনারা আর কোথাও দেখেছেন কি? এ ভয়াবহ ঠাঁই, কোন অতি-বড়ো ভক্তও ভরসা করে দেবীকে এখানে পূজা দিতে আসে না। মানুষের সঙ্গ হারিয়ে এ-জায়গাটা এখন যেন অভিশপ্ত হয়ে আছে।'

দু-দিকের জঙ্গলের দিকেই ঘন ঘন মুখ ফিরিয়ে সুন্দরবাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন অত্যন্ত সাবধানে।

মানিক হেসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আজ তো শনিও নয় মঙ্গলও নয়, আপনার অতোটা সাবধান না হলেও চলবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি জানি বাবা, বলা তো যায় না!'

জয়ন্ত বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, যারা মারা পড়েছে, তাদের তিনজনের লাস কোন্খানে পাওয়া গিয়েছে?'

সামনের একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঠিক ঐখানে।'

জয়ন্ত সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাম পাশের বনের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। বন সেখানে বেশ ঘন, ঝোপের পর দাঁড়িয়ে আছে ঝোপ, তাদের ঠেলে নজর চলে না।

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'জঙ্গলটার দিকে তুমি অমন করে তাকিয়ে আছো কেন জয়ন্ত?'

জয়ন্ত কোন জবাব না দিয়ে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হলো।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমরাও যাবো নাকি?'

'না' বলে জয়ন্ত ঝোপ ঠেলে বনের ভিতরে প্রবেশ করলে।

পাঁচ সাত দশ মিনিট কেটে গেলো। তখনো জয়ন্তের দেখা নেই।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্তের এই রকম সব খামখেয়ালি আমার কাছে যেন কেমন-কেমন লাগে। এতো জায়গা থাকতে ওখানে ঢুকে ও কি করছে? কী ওখানে আছে?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'ওখানে আছে কেবল বড়ো বড়ো বুড়ো গাছ, দলে দলে কাঁটা-ঝোপ আর দিনেও সন্ধ্যার মতো অন্ধকার। বলা বাহুল্য ওখানে কেউটে প্রভৃতি সাপও আছে অনেক।'

এমন সময় দেখা গেলো জয়ন্ত আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কি হে, কেমন খাওয়া খেয়ে এলে?'

জয়ন্ত সে-কথা যেন শুনতেই পেলে না। এগিয়ে এসে মহেন্দ্র-বাবুকে সে প্রশ্ন করলে, 'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

—'জিজ্ঞাসা করুন।'

—'এখানে শেষ দুর্ঘটনা হয় গত মঙ্গলবারে, কেমন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে কতো রাত্রে, সে কথা বোধহয় আপনি বলতে পারবেন না?'

—'আজ্ঞে না। তবে লাস পরীক্ষা করে ডাক্তাররা মত দিয়েছিলো, লোকটি মারা পড়েছে রাত বারোটার খানিক পরে।'

—'সেদিন কি এখানে বৃষ্টি পড়েছিল?'

মহেন্দ্রবাবু একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'এ-কথা আপনি, জানলেন কেমন করে?'

—'বনের ভিতরে এখনো অনেক জায়গায় ভিজে কাদা রয়েছে। ওখানে তো রোদ ঢুকতে পায় না, কাজেই জলকাদাও সহজে শুকোয় না।'

—'হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, সেদিন রাত ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খুব জোরে ঝড়-জল হয়ে গিয়েছিলো।'

—'পুলিশের লোকেরা এখানে তদন্তে এসে ঐ বনের ভিতরে গিয়েছিলো বোধ হয়?'

—'তা গিয়েছিলো বৈকি! কিন্তু তারা কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি।'

—'পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে কোনো লোক কি ঐ বনের ভিতরে ঢুকেছিলো?'

মহেন্দ্রবাবুর মুখে আবার ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব। খানিকক্ষণ ভেবে তিনি বললেন, 'তদন্তের সময়ে আমিও পুলিশের সঙ্গে ছিলুম। কিন্তু আমাদের কারুরই পা তো খালি ছিলো না! জুতো না পরে ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করাও নিরাপদ নয়।'

—'স্থানীয় লোকেরাও কি খালি পায়ে জঙ্গলের মধ্যে যায় না?'

—'কেউ না, কেউ না! বলেছি তো, এ-জায়গাটাকে সকলে অভিশপ্ত বলে মনে করে। একে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কুসংস্কারের অন্ত নেই, তার উপরে গত মঙ্গলবারের আগেই এখানে উপর উপরি দু-দু'টো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরও ঐ জঙ্গলে স্থানীয় লোকরা আসতে সাহস করবে? অসম্ভব মশাই, অসম্ভব!'

জয়ন্ত তার রুপোর শামুকের নস্যদানী বার করে নস্য গ্রহণ করতে লাগলো। মানিক বুঝলে, এটা সুলক্ষণ। জয়ন্ত খুব খুশী হলেই নস্য না নিয়ে পারে না। কিন্তু হঠাৎ তার এতো খুশী হবার হেতু কি?

সুন্দরবাবু টুপি খুলে মাথার ঘর্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন, 'জয়ন্ত ভায়া, তোমার প্রশ্নগুলো কেমন যেন খাপছাড়া বলে মনে হচ্ছে না?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আপনার তা মনে হতে পারে, কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে আমি কি দেখেছি জানেন?

—'হয় সাপ, নয় শেয়াল, নয় বন-বিড়াল!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এখানে মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও শোনা যায়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাঃ, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!'

জয়ন্ত বললে, 'ও-সব কিছুই নয়। জঙ্গলের ভিতরে আমি দেখেছি, কেবল পায়ের দাগ! গত মঙ্গলবার রাত্রে বৃষ্টি হবার পর খালি-পায়ে কোনো লোক ঐ জঙ্গলের এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, যেখান থেকে ঝোপঝাপের ফাঁক দিয়ে পথের এইখানটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল একটা পায়ের দাগ নয়, একই লোকের অনেক-গুলো পায়ের দাগ। কোন কোন দাগের গভীরতা দেখে আন্দাজ-করতে পেরেছি, লোকটি ঐখানে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলো। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানকার কাদা এখন অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, তাই পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতে আমার কিছুই কষ্ট হয়নি। খালি পায়ের দাগ নয়, আর একটা চিহ্নও আমি লক্ষ করেছি!'

—'কি?'

—'লোকটার হাতে ছিল একটা অদ্ভুত রকমের লাঠি!'

—'অদ্ভুত রকম!'

—'হ্যাঁ। কোন একটা ফাঁপা দণ্ড বা নলের মতোন জিনিসের একটা মুখ আপনি যদি ভিজে মাটির উপরে রেখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে কি রকম চিহ্ন পড়বে বলুন দেখি?'

—'ফাঁপা দণ্ড ভিজে মাটির উপরে চেপে ধরলে খানিকটা মাটি গোলাকার হয়ে বড়ির মতোন উপর দিকে উঠে পড়বে।'

—'ঠিক বলেছেন। ঐ রকম একটা ফাঁপা লাঠির একাধিক দাগ আমি মাটির উপরে লক্ষ করেছি।'

সুন্দরবাবু ভাবতে ভাবতে বললেন, 'ফাঁপা লাঠি? সে আবার কি? এক তো জানি গুপ্তি। ছোট তরোয়াল রাখবার জন্যে গুপ্তির ভিতরটা হয় ফাঁপা।

জয়ন্ত বললে, 'না, এ গুপ্তির দাগ নয়। গুপ্তির ভিতরটা ফাঁপা হলেও তার দু-দিকের মুখই থাকে বন্ধ।'

—'তবে তুমি কিসের দাগ দেখেছো?'

—'সেইটেই এখনো ধরতে পারছি না। কিন্তু ঐ লোকটা কে? দিনের বেলাতেই যেখানে মানুষের চলাচল নেই, দুর্যোগের রাত্রে—বিশেষ করে দুর্যোগময় মঙ্গলবারের রাত্রে—ঝড়-বৃষ্টির পরেও কোনো দুঃসাহসী লোক কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নগ্নপদে অদ্ভুত একগাছা লাঠি বা অন্য কিছু নিয়ে ঐ গভীর জঙ্গলের ভিতরে এসে অপেক্ষা করেছিলো? ঐ লোকটিকে যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তাহলেই বোধহয় সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

সুন্দরবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সাবাস্ ভায়া, সাবাস্! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? ঘটনাস্থলে পদার্পণ করতে না করতেই তুমি যে একটা মস্ত বড়ো সূত্র আবিষ্কার করে ফেললে হে!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'এটা যে কি রকম সূত্র আমি বুঝতে পারছি না। গেলো মঙ্গলবারের রাত্রে অমন দুর্যোগের পরেও কোন মানুষ যে ঐ ভয়ঙ্কর জঙ্গলে বেড়াতে আসতে পারে, এ-কথা কিছুতেই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! কেবল ডাকাতে-কালীর সর্বনাশা ক্ষুধা নয়, সত্য সত্যই ঐ বনের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে শত শত বিষধর সর্প আর বন্য বরাহের দল। মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র এসেও তার অস্তিত্ব জানিয়ে যেতে ভোলে না। ঐ বনে অমন সময়ে যে মানুষ আসবে, সে দুঃসাহসী নয়, সে হচ্ছে বদ্ধ পাগল। এমন পাগল এ-অঞ্চলে কেউ আছে বলে আমি জানি না। তারপর ঐ ফাঁপা লাঠি! ফাঁপা লাঠি আবার কি জিনিস? তা দিয়ে কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে?'

জয়ন্ত বললে, 'যা দেখেছি তাই বলছি। সম্ভব-অসম্ভবের কথা নিয়ে এখন আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনি যদি এখন জোর করে বলেন যে, ঐ পদচিহ্ন মানুষের পদচিহ্ন নয়, তাহলে আমিও এখন জোর করে আপনার কথার প্রতিবাদ করতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'ও বাবা, এ আবার কি রকম কথা হলো? মানুষের পদচিহ্ন নয়? কিন্তু এতকাল পুলিশে চাকরি করছি, কখনো তো শুনিনি ভূতের পদচিহ্নের কথা।'

মানিক বললে, 'ভৌতিক ইতিহাসে আমিও এমন কথা পাঠ করিনি। তারপর ঐ ফাঁপা লাঠি! ভূতেদের লাঠি ফাঁপা হয় নাকি?'

জয়ন্ত বললে, 'আপাতত ভূত আর মানুষ দু-এরই কথা ভুলে যাও। চলো, আমরা মন্দিরের ভিতরটা দেখে আসি।'

সকলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো। এবং যেতে যেতে দেখা গেলো একটা নতুন ব্যাপার।

একটা ছোট সাপ ধরেছে একটা মস্ত ব্যাঙকে! ব্যাঙটাকে সে গলাধঃকরণ করতেও পারছে না, মুখ থেকে বার করে ফেলে দিতেও পারছে না। সাপটা ঘন ঘন ব্যাঙটাকে মাটির উপরে আছাড় মারছে, কিলবিল করে সমস্ত দেহ দিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে এবং ব্যাঙটাও চীৎকার করছে প্রাণপণে! মানুষ দেখেও সাপটা পালাবার চেষ্টা করতে পারলে না, সুন্দরবাবু তাঁর হাতের লাঠি চালিয়ে সাপটার মাথা গুঁড়ো করে দিয়ে বললেন, 'হুম্! পৃথিবী থেকে একটা পাপ বিদেয় হলো!'

মানিক বললে, 'কিন্তু পৃথিবীর অনেক পাপই লুকিয়ে আছে এই বনের আনাচে-কানাচে। আপনি সে-সব দিকেও নজর রাখতে ভুলবেন না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নজর আমার কম-জোরি নয় হে! তুমি নিজের চরকায় তেল দেবার চেষ্টা করো।'

আগাছা-ভরা চাতাল পার হয়ে সকলে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চাতালের উপরেই অপরিসর রোয়াক, কিন্তু রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির ধাপগুলো গেছে ভেঙে।

মন্দিরের ভিতরে আধা আলো আধা অন্ধকার। সামনের দিকে

তাকিয়েই খানিক স্পষ্ট ও খানিক অস্পষ্টরূপে যে মূর্তি দেখা গেলো, তা অবর্ণনীয় বললেও চলে।

জয়ন্তের মতোন সাহসী মানুষেরও হৃৎপিণ্ড সে-মূর্তি দেখে ধড়ফড় করে উঠলো।

বাংলাদেশের সর্বত্র কালী-মূর্তি আছে অগুন্তি। কিন্তু সে-সবের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করী হচ্ছে, বঙ্গাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত "যশোরেশ্বরী" মূর্তি। সে-মূর্তির মুখ দেখলে মনের মধ্যে ভক্তির আগে জেগে ওঠে বিষম আতঙ্কের ভাব। কিন্তু তাকেও টেক্কা দিয়েছে রতনপুরের এই ডাকাতে-কালী, এ-মূর্তির বীভৎসতা কল্পনাতেও আনা সহজ নয়।

কষ্টিপাথরে গড়া আট-নয় হাত উঁচু উলঙ্গ দেবীর মূর্তি! মাথার পিছনদিকে আগে বোধ হয় সত্যিকার কেশদাম ছিল, সে কেশদামের কিছুই এখন নেই, দেবী মুণ্ডিতমস্তক। চক্ষু কি দিয়ে যে গড়া ঝাপসা আলোয় সেটা বোঝা গেলো না, কিন্তু সকলেরই মনে হলো মূর্তির দুই উগ্র চক্ষু যেন উৎকট রক্ত পিপাসায় জীবন্ত হয়ে ধক্‌-ধক্‌ করে জ্বলছে! শ্বাপদ জন্তুর মতো নিষ্ঠুর করাল দন্ত এবং ততোধিক নির্দয় লক্‌লকে রক্তাক্ত জিহ্বা! মূর্তির গলায় রয়েছে যে মুণ্ডমালা তা পাথরের তৈরি নয়, সত্যিকার মনুষ্য-শিশুর মুণ্ড দিয়েই তা তৈরি করা হয়েছে। নিচেকার বাম হস্তেও ঝুলছে রক্ত-মাংসহীন একটি আসল মানুষের মুণ্ড। প্রায় কুণ্ডলীকৃত মহাদেবের দেহের উপরে মূর্তি যে ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে পদনিক্ষেপ করে দণ্ডায়মান, তা দেখলেও বক্ষের ভিতরে জাগে বিষম একটা আতঙ্কের ঝড়।

সকলেই খানিকক্ষণ স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জড় পাষাণ-প্রতিমা যে এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করতে পারে এটা হচ্ছে ধারণার অতীত।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন মহেন্দ্রবাবু। বললেন, 'শুনেছি, ডাকাতরা আগে প্রতি রাত্রে নরবলি দিয়ে দেবীর হাতে নিত্য নূতন

নরমুণ্ড ঝুলিয়ে দিতো। হয়তো আজ আমরা দেবীর হাতে যে মাংস-হীন মুণ্ড দেখছি সেটা হচ্ছে এই মন্দিরের শেষ নরবলিরই নিদর্শন!'

নিস্তব্ধ মন্দিরের ছাদের তলায় জেগে উঠলো হঠাৎ কতকগুলো শব্দ!

সুন্দরবাবু সভয়ে একটি লম্ফত্যাগ করলেন। সে-শব্দ শুনে মনে হলো অসীম নিস্তব্ধতা আচম্বিতে যেন জাগ্রত হয়ে মুখরিত হয়ে উঠলো ধ্বনির পর ধ্বনি সৃষ্টি করে।

মহেন্দ্রবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, 'ও কিসের শব্দ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আর এখানে নয়! জয়ন্ত, এসো, আমরা সবেগে পলায়ন করি!'

জয়ন্ত একবার হাসলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রকৃতিস্থ হোন্। ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে বাসা বেঁধেছে বাদুড়রা। মানুষের সাড়া পেয়ে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাবা, বাদুড়-ফাদুড় আমি জানি না। আমি আর এক মিনিট এখানে থাকতে রাজী নই। এই কি দেবীর মূর্তি? দানবীর মূর্তি তাহলে কী রকম? যেখানে এমন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর এতো হতভাগ্য মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে, সেখানে যা-কিছু অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে। জয়ন্ত বনের ভিতরে যে-সব পায়ের দাগ দেখেছে, সেগুলো কখনোই মানুষের পায়ের দাগ নয়। এই মন্দিরের ত্রিসীমানায় মানুষ আসতে পারে না। এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

জয়ন্ত বললো, 'এখানে আমাদের আর কিছু দেখবার নেই! চলো, এখনকার মতো এই পর্যন্ত।'

হঠাৎ মন্দিরের কোণ থেকে আর একটা বিশ্রী শব্দ জেগে উঠলো।

সুন্দরবাবু মানিককে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আর তো পারি না, ও-আবার কী?'

মানিক বললে, 'তক্ষক!'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'আমারও আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। জয়ন্তবাবু, আমি এখন বাইরের হাওয়ায় বেরিয়ে একটু হাঁপ ছাড়তে চাই।'

জয়ন্ত বললে, 'সেই কথাই ভালো।'

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### সুন্দরবাবুর বিপদ

মহেন্দ্রবাবুর ইচ্ছা ছিলো সুন্দরবাবুরা তাঁরই আতিথ্য স্বীকার করেন। সুন্দরবাবু হয়তো তাতে খুশীই হতেন, কারণ সকালের জলযোগের আয়োজনটা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন যে, ওখানে থাকলে দক্ষিণ-হস্তের কর্তব্যটা খুব ভালো করেই পালিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মহেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে রাজী হতে পারলেন না। কারণ, থানার লোকেরা ইতিমধ্যেই তাঁর জন্যে বাসার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো।

তাঁদের এই নতুন বাসা-বাড়িখানির অবস্থান হচ্ছে গ্রামের অপর প্রান্তে, বড়ো রাস্তার উপরে। বাড়িখানি সরকারী, কোন রাজ-কর্মচারী এ-অঞ্চল পরিদর্শন করতে এলে ঐখানেই তাঁরা বাঁধতেন অস্থায়ী বাসা। দোতলা বাড়ি, সব ঘরই সংসারের পক্ষে দরকারী আসবাব-পত্তর দিয়ে মোটামুটি সাজানো। বাড়ির উপরের ঘরে বসলে গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিচালনা করা যায়। এমন কি কালী-মন্দিরের অরণ্য পর্যন্ত চোখের আড়ালে থাকে না।

রতনপুরে তাদের একদিন কাটলো। কালী-মন্দির থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত জয়ন্ত এখানকার মামলা নিয়ে কারুর সঙ্গে কোনো আলোচনা করেনি। সে চুপচাপ বসে বা শুয়ে আছে বটে, কিন্তু মনে মনে সর্বদাই যে শনি-মঙ্গলের রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তার মুখ দেখে মানিক এটুকু বেশ বুঝতে পারলে। সে জানতো জয়ন্ত যখন চিন্তা করে তখন বাক্য উচ্চারণ করে না; তাই মামলা নিয়ে জয়ন্তের কাছে সেও কোন কথা তোলেনি।

কিন্তু সুন্দরবাবু এক মিনিটও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। তিনি

বারংবার থানায় বা মহেন্দ্রবাবুর ও গ্রামের অন্যান্য লোকের বাড়িতে ছুটোছুটি করছেন; নানা লোকের মুখ থেকে হত্যা-রহস্য সম্পর্কিত নানা কথা সংগ্রহ করে নিজের ডায়েরির পাতার-পর-পাতা ভরিয়ে ফেলছেন। এবং মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে জয়ন্তের কাছে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছেন, 'হুম্, ভয়ঙ্কর জটিল মামলা! যতোই তদন্ত করছি, রহস্য যেন ততোই বেড়ে উঠছে! যতোই তদন্ত করছি, ততোই যেন অগাধ জলের আরো নিচে তলিয়ে যাচ্ছি!'

জয়ন্ত একটু হাসে, জবাব দেয় না।

মানিক বলে, 'প্রিয় সুন্দরবাবু, আপনি আর বেশি তলাবার চেষ্টা করবেন না। যদি আরো বেশি তলিয়ে যান, আমরা আর আপনাকে টেনে উপরে তুলে আনতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু বলেন. 'আমি তোমাদেরই মুখ চেয়ে বসে আছি নাকি? উপরে ভেসে ওঠবার শক্তি আমার নিজেরই আছে।'

মানিক জোড়হাত করে বলে, 'তাহলে দয়া করে ভেসে উঠে আমাদের চমৎকৃত করে দিন দেখি।'

সুন্দরবাবু বলেন, 'তোমাদের চমৎকৃত করবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। আমি হচ্ছি সরকারী কর্মচারী, এখানে এসেছি সরকারের হুকুম তামিল করতেই।'

মানিক বললে, 'তাহলে করুন আপনি হুকুম তামিল। বারবার ছুটে এসে কানের কাছে বক্‌বক্ করে আমাদের আর জ্বালিয়ে মারবেন না।'

সুন্দরবাবু অসহায়ভাবে জয়ন্তের দিকে ফিরে বলেন, 'দেখো জয়ন্ত, দেখো। মানিক কি রকম শক্ত শক্ত কথা বলছে, শোনো একবার।'

জয়ন্ত আবার হাসে, কিছু বলে না।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে তাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিলো।

সন্ধ্যার সময়ে ইউনিফরম ছেড়ে সুন্দরবাবু নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যে শৌখিন সাজ-পোশাক পরবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় জয়ন্ত ডাক দিলে, 'সুন্দরবাবু!'

—'বলো ভায়া।'

—'আজ আমাদের নিমন্ত্রণে যাওয়া হবে না।'

—'সে কি কথা? কেন?'

—'বিশেষ দরকারে আজ আমাদের অন্যত্র যাত্রা করতে হবে।'

—'আমাদের এমন কি বিশেষ দরকার আছে যা আমি নিজেই জানি না?'

—'আজ শনিবার!'

—'হ্যাঁ, সে-কথা আমিও ভুলিনি।'

—'আজ নাকি পাথরের কালী জ্যান্ত হয়ে ওঠেন।'

—'ও-কথাও আমি জানি।'

—'আজ রাত্রে আমরা জীবন্ত দেবী-দর্শনে যাত্রা করবো।'

সুন্দরবাবু চমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'মানে?'

—'আমি তো কোনো দুর্বোধ্য কথা বলছি না। মানেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ নীরবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলেন জয়ন্তের মুখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জয়ন্ত!'

জয়ন্ত বললে, 'আমার মস্তিষ্ক-যন্ত্র মোটেই বিকল হয়নি। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি বুঝতে পেরেছি, শনি-মঙ্গলের রহস্য ভেদ করতে গেলে ঐ-দুই নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে কালী-মন্দিরে গিয়ে হাজির থাকতে হবে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এ-কথাটা তোমার আগেও আরো দু-জন পুলিশ কর্মচারী বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বুঝেও তাঁদের কি লাভ হয়েছে জানো তো?'

—'জানি। তাঁরা লাভ করেছেন মৃত্যুকে।'

—'জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি কি আমাদেরও নির্বোধের মতোন আত্ম-হত্যা করতে বলো?'

জয়ন্ত ভালো করে সোজা হয়ে বসে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমাদের অগ্রবর্তীরা যে-ভুল করেছিলেন, আমরা তা করবো না। প্রথমত, তাঁরা মন্দিরে পাহারা দিতে গিয়েছিলেন একা একা, আর আমরা তিনজনেই যাবো একসঙ্গে। একজোড়া চোখের চেয়ে তিন জোড়া চোখ একসঙ্গে ঢের বেশি কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, মন্দিরে যাবার চলতি পথটাই তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বিপদ ওৎ পেতে থাকে ঐ চলতি পথটারই কোনো এক জায়গায়। তাই আমি স্থির করেছি, মন্দিরের পিছনে যে অরণ্য আছে, তারই ভিতর দিয়ে চুপি চুপি আমরা যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হবো।'

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'বাবা, সেও তো এক অসম্ভব ব্যাপার!'

—'কেন?'

—'সে-হচ্ছে নিবিড় অরণ্য, আর আজ হচ্ছে অমাবস্যার রাত, দুনিয়া আজ একেবারেই অন্ধ হয়ে থাকবে।'

—'আমরা সঙ্গে করে টর্চ নিয়ে যেতে ভুলবো না।'

—'বনে থাকে আরো কতো বিভীষিকা।'

—"বিভীষিকাকে ভয় করলে গোয়েন্দাগিরি চলে না সুন্দরবাবু!'

সুন্দরবাবু পড়ে গেলেন অতিশয় ফাঁপরে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। সহসা বিপদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহ তাঁর হয় না। আসল বিপদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে থেকে কেবল জোর-তদন্তের দ্বারাই তিনি কার্যোদ্ধার করতে চান। কিন্তু জয়ন্ত চায় একেবারে বিপদের উপর গিয়ে পড়ে অন্ধকার থেকে বিপদকে বাইরের আলোকে টেনে আনতে। এইখানেই তাঁর সমূহ

আপত্তি। কিন্তু জয়ন্তের কাছে কোনদিনই তাঁর কোনো আপত্তিই টেকেনি, আজও টিকল না।

অবশেষে দুর্বল কণ্ঠে তিনি তাঁর শেষ যুক্তির কথা জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি মহেন্দ্রবাবুর কথা একবারও ভেবে দেখেছো না জয়ন্ত। ভদ্রলোক সারাদিন ধরে আমাদের জন্যে হয়তো আজ কতো আয়োজনই করে রেখেছেন, তুমি কি সমস্তই পণ্ড করতে চাও? তাহলে কাল তাঁর কাছে আমরা মুখ দেখাবো কেমন করে?'

—'কাল তাঁর কাছে মুখ দেখাতে আমার একটুও লজ্জা করবে না। তাঁর আয়োজনের চেয়ে আমাদের আজকের কর্তব্যটা হচ্ছে গুরুতর। আপনি কোনো চাকরকে ডেকে এখুনি তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে, অত্যন্ত জরুরী দরকারের জন্যেই আমরা আজ তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবো না।'

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'বেশ, তাই হবে।'

মানিক বললে, 'হায় সুন্দরবাবু, হায় রে অদৃষ্ট! কোথায় রইলো ভূরিভোজন, চললুম কিনা শূন্যোদরে অরণ্যে রোদন করতে?'

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## শনিবারের রাত্রি

চিরদিন যেমন আসে, তেমনিভাবে আজও এলো অমাবস্যার কালো রাত্রি পৃথিবীর বুকে কৃষ্ণ যবনিকাপাত করে।

রাত বারোটার ঢের আগেই ঘুমিয়ে পড়লো রতনপুর গ্রাম। তার পথে এবং গৃহে পথিক এবং গৃহস্থের কোনো সাড়াই আর জেগে নেই। সম্প্রতি বিশেষ করে শনি-মঙ্গলবারেই রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে রতনপুরের চারিদিকে সঞ্চারিত হয়ে যায় কেমন একটা অপার্থিক থম্‌থমে ভাব। সকলেই যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে নূতন কোনো মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্যে।

গ্রামান্তরের লোকেরা সন্ধ্যাদীপের শিখা জ্বলবার আগেই তাড়াতাড়ি গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে মাঠের উপর দিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলে এবং চলতে চলতে মাঝে মাঝে সচমকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে যায় কুবিখ্যাত কালী-মন্দিরের অভিশপ্ত অরণ্যের দিকে। যদিও মন্দিরের বিপদ কোনো দিন গ্রামের মধ্যে আবির্ভূত হয়নি, তবু দোকানীরা সন্ধ্যার খানিক পরেই দোকানে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে সেদিনের মতো ছুটি নিয়ে সরে পড়ে। পঞ্চানন তলায় প্রতিদিন বসতো পরচর্চার এবং তাস-দাবা-পাশার মস্ত আসর। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে চলতো খেলাধুলো, গল্পগুজব এবং হৈ-চৈ। কিন্তু আজকাল রাত ন-টার সময়েই দেখা যায় আসরের ভিতরে আর জনপ্রাণী নেই।

রাত জাগে কেবল গ্রামের ভিতরে কুকুরগুলো এবং গ্রামের বাইরে শৃগালের দল। তারা মানুষের ভাষা বোঝে না, শনি-মঙ্গলের গল্প তাই তারা জানতে পারেনি। এবং তাই থেকে থেকে বিকট স্বরে চীৎকার করে তারা বিদীর্ণ করে দেয় রাত্রির স্তব্ধতাকে। আর জেগে থাকে শূন্যে বাদুড় ও পেচকের দল—মানুষ যাদের জানে নিশাচর বিভীষিকার বন্ধু বলে।

কিন্তু রতনপুরের বাসিন্দারা জানে না, গ্রামের বাইরে আজ এখানে রাত জাগছে তিনটি অপরিচিত মনুষ্য-মূর্তি। মাঠের ঘোর অন্ধকারে গা ঢেকে তারা অগ্রসর হয়ে প্রবেশ করলে কালীমন্দিরের পিছনকার অরণ্যের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে।

অরণ্যের মধ্যে সমস্তই একাকার! অন্ধকার এবং অরণ্যের মধ্যে নেই কোনোই পার্থক্য, টর্চ না থাকলে সেই দুর্ভেদ্য তমিস্রার প্রাচীর ভেদ করে এক পা অগ্রসর হবার উপায় নেই।

কোথাও মস্ত বাঁশগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও একাধিক শতাব্দীর প্রাচীন সুবৃহৎ বটবৃক্ষ চারিদিকে শত শত ঝুরি নামিয়ে বিশাল অরণ্যের মধ্যে যেন আর একটা ক্ষুদ্রতর অরণ্য রচনা করেছে, কোথাও শত শত লতা অনেকগুলো গাছের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত এমন সুদৃঢ় জাল তৈরি করেছে যে অস্ত্রের দ্বারা তাদের ছিন্নভিন্ন না করলে পথ চলা অসম্ভব। কোথাও খাল, ডোবা বা নালা এবং কোথাও বা অরণ্যের নিম্নভূমি পরিণত হয়েছে জলাভূমিতে। এবং সমস্ত স্থান জুড়ে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুপ্সি কাঁটা-ঝোপগুলো। কোনরকম সাবধানতার দ্বারাই তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না—হিংস্র জন্তুর মতো তারা ওৎ পেতে আছে, মানুষকে দংশন করে রক্তাক্ত করে দেবেই। তার উপরে সর্বত্রই বিরাজ করছে সেই একই রকম অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! উপরে অন্ধকার, নিচে অন্ধকার, এ-পাশে ও-পাশে, সামনে, পিছনে, যেদিকে তাকাও দেখবে যেন অনাদি অসীম অন্ধকারকেই! এই অন্ধকার কি অরণ্যের? না এই অরণ্যই হচ্ছে অন্ধকারের?

মিনিট চার-পাঁচ যেতে না যেতেই সুন্দরবাবু ধপাস্ করে মাটির উপরে বসে পড়ে বললেন, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন, আমি আর এগুতে পারবো না!'

মানিক তাঁর দেহকে উপরে টর্চের শিখা নিক্ষেপ করে বললে, 'কি হলো সুন্দরবাবু?'

—'হুম্, হবে আবার কি, একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড! চেয়ে দেখো, কাঁটার কামড়ে খালি আমার পোশাক নয়, আমার গা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে! তার ওপরে—ওরে বাপ রে, গেছি রে!' বিকট চীৎকার করে এক লাফে সুন্দরবাবু দাঁড়িয়ে উঠে রীতিমতো তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিলেন।

জয়ন্ত বললে, 'একি সুন্দরবাবু, অমন ধেই ধেই করে নাচছেন কেন?'

কিন্তু সুন্দরবাবু নাচ থামাবার নাম করলেন না। জয়ন্ত ভাবলে সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছেন।

মানিকও প্রথমটা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। তারপর সে জোর করে সুন্দরবাবুর নাচ থামিয়ে দিতে গেলো।

কিন্তু সুন্দরবাবু থামলেন না। তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, কাঁকড়া-বিছে। আমার ভুঁড়ির উপরে মস্ত একটা কাঁকড়া-বিছে উঠেছে!'

—'কাঁকড়া-বিছে উঠেছে তো অতো নাচছেন কেন?'

—'আমি নাচছি না মূর্খ, আমি লাফাচ্ছি। লাফিয়ে ঝাঁকুনি মেরে বিছেটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছি।'

মানিক আবার সুন্দরবাবুর দেহের উপরে টর্চের আলো ফেলে বললে, 'ও তাণ্ডব-নৃত্যে পৃথিবীর মাটি টলে যায়, কাঁকড়া-বিছে কি আর আপনার দেহের উপরে থাকতে পারে!'

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নৃত্য বন্ধ করে নিজের পোশাক ঝাড়তে ঝাড়তে সুন্দরবাবু বললেন, 'দেখছো তো জয়ন্ত, কেন যে আমি রাতে এই জঙ্গলে আসতে মানা করেছিলুম, এখন বুঝতে পারছো কি?'

জয়ন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি, আজ রাতে আমরা চুপি চুপি মন্দিরে যাবো ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি এমন ভীষণ চীৎকার করেছেন যে এক মাইলের ভিতর সমস্ত প্রাণীর ঘুম বোধহয় ভেঙে গেছে।'

—'কি করবো বলো ভায়া, বুনো কাঁকড়া-বিছে কামড়ালে আমি কি আর বাঁচতুম? চ্যাঁচাতে হয়েছে নিতান্তই প্রাণের দায়ে।'

—'এখন আমাদের সঙ্গে আসবেন, না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন?'

—'চলো ভাই, চলো! "পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!" চলো ভাই চলো!'

সকলে আবার কোথাও মাথা হেঁট করে, কোথাও কাঁটা-ঝোপকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও বা রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো মন্দিরের দিকে।

সুন্দরবাবু মানিকের কানে কানে বললেন, 'ভায়া, আমার বড্ডো অস্বস্তি হচ্ছে!'

—'কেন, আবার কি হলো?'

—'মনে হচ্ছে কাঁকড়া-বিছেটা নিশ্চয়ই আমার একটা পকেটের ভিতরে ঢুকে বসে আছে!'

মানিক তাঁর জামার পকেট দু'টো টিপে টিপে দেখে বললে, 'না সুন্দরবাবু, পকেটে বিছে-টিছে কিছুই নেই।'

সুন্দরবাবু কিছুদূর গিয়ে বললেন, 'উঃ! আমি জীবনে কখনো এমন অন্ধকার দেখিনি! মনে হচ্ছে, এই অন্ধকারের ছোপ লেগে আমাদের সকলেরই গায়ের রঙ কাফ্রীর মতো কালো কুচ্‌কুচে হয়ে যাবে!'

হঠাৎ জয়ন্ত বললে, 'চুপ!'

সকলে নীরবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। খানিক পরে শোনা গেলো অন্ধকারের ভিতরে খানিক তফাতেই একটা শব্দ হচ্ছে। তারপর গাছের ডালপালা নাড়া দিতে দিতে শব্দটা ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগলো।

মানিক বললে, 'বোধ হচ্ছে কোনো একটা জীব এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে!'

জয়ন্ত আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'বোধ হয় ওটা বাঁদর কি হনুমান। আমাদের সাড়া পেয়ে সরে পড়লো।'

সুন্দরবাবু বুকে হাত দিয়ে বুকের দুপ্‌দুপুনি থামাবার চেষ্টা করে বললেন, 'হুম্! হনুমানই হোক আর বাঁদরই হোক, আমাতে আর আমি ছিলুম না! আমি ভেবেছিলুম মা-কালীর সাঙ্গোপাঙ্গদের কেউ বুঝি আমাদের আদর করতে আসছে!'

মানিক বললে, 'কিন্তু ওটা যে কি, ঠিক করে তো বোঝা গেলো না। বাঁদর আর হনুমান কি রাতের অন্ধকারেও চোখে দেখতে পায়? আমার তো বিশ্বাস অন্ধকারে ওরা মানুষেরই মতো অন্ধ।' এই বলেই সে নিজের হাতের জোরালো টর্চ-এর আলো বনের উপর দিকে নিক্ষেপ করলে।

বেশ খানিকটা তফাতে দেখা গেলো, একটা খুব বড়ো গাছের ডালপালায় জেগে আছে সন্দেহজনক চাঞ্চল্য। কিন্তু কোনো জীবের অস্তিত্ব কারুর নজরেই পড়লো না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কারুর কোনো চর কি গাছের উপরে বসে বনের ভিতরে পাহারা দিচ্ছিলো? আমাদের সাড়া পেয়ে সে কি এখন যথাস্থানে খবর দিতে গিয়েছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর ও-সব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। কেউ যদি আমাদের সত্যি সত্যিই দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলে আর উপায় কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'উপায় আছে বৈকি! আমাদের এখন উচিত মানে মানে এখান থেকে সরে পড়া—নইলে শেষটা আমাদেরও বিষাক্ত স্ূচের খোঁচা খেয়ে পটল তুলতে হবে।' তিনি ভীত চক্ষে অন্ধকারের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো, জঙ্গলের চারিদিকেই তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো অমানুষিক ছায়াচর, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁদের আক্রমণ করবার জন্যে তারা রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই আছে। অরণ্যের দিকে দিকে জ্বলছে, নিবছে, উপরে উঠছে এবং নিচে নামছে অসংখ্য জোনাকি; সুন্দর-বাবুঁর মনে হলো ওরাও বিশ্বাসযোগ্য জীব নয়, ওরাও যেন অন্ধকারে আলো জ্বেলে কোনো ভয়ঙ্করের সামনে তাঁদের তিনজনকে দেখিয়ে এবং ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে!

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি বারবার টর্চ জ্বেলো না। আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে আমাদের এই নৈশ অভিযান নয়। আমরা মন্দিরের পাশেই এসে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। বন এখানে আর ঘন নয়, উপর দিকে তাকিয়ে দেখো, অন্ধকার ওখানে পাতলা। হ্যাঁ, ঐ যে তারাগুলো ওখানে টিপ্ টিপ্ করছে! ও হচ্ছে আকাশ। এদিকটাতেও চেয়ে দেখো, নিশ্চয়ই ওটা কালী-মন্দিরের ছায়া। আর জোরে কথা কওয়া নয়, পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো, চোখ-কান সজাগ রাখো আর হাতে নাও রিভলভার।'

পায়ের তলাকার জমি এমন এবড়ো-খেবড়ো যে, পদে পদে হোঁচট খেয়ে 'পপাত ধরণীতলে' হবার উপক্রম। তখন তিনজনে হাঁটু

গেড়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হাত এবং পায়ের সাহায্যে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? সুন্দরবাবুর হাতে পটাস্ করে বিঁধে গেলো কাঁটান মতোন কি। তিনি প্রথমটা তাকে বিষাক্ত সূচের খোঁচা মনে করে বিকট কণ্ঠে আর্তনাদ করতে উদ্যত হয়েই আবার নিজেকে সামলে নিলেন অনেক কষ্টে।

এখানটা মনে হচ্ছে মন্দিরের চাতাল। আগাছার জঙ্গল, কোথাও তা তিনফুট-চারফুট উঁচু। তারই ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে তিনজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো।

ঝিঁঝিপোকাদের অশ্রান্ত আর্তনাদ ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। বাতাসও যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে আছে! সেখানেও অন্ধকারের মধ্যে শত শত অগ্নিকণার ইঙ্গিতের মতো শূন্য দিয়ে ছুটোছুটি করছে পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি। এখানকার ভাবটা হয়ে উঠেছে এমন অসাধারণ যে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে যেন এর কোনো কিছুই মেলে না।

হঠাৎ জয়ন্তের পায়ের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে চলে গেলো যেন একগাছা জীবন্ত মোটা দড়ি! তুষারের মতো কন্‌কনে ঠাণ্ডা তার স্পর্শ! নিশ্চয় সেটা সাপ। কিন্তু জয়ন্ত কোনরকম চাঞ্চল্যই প্রকাশ করলে না, স্থির হয়ে বসে রইলো নির্বিকারের মতো।

তারপরই অদূরে শোনা গেল বার কয়েক বিশ্রী হিস্‌হিস্ শব্দ!

সুন্দরবাবু শিউরে বলে উঠলেন, 'বাবা, গোখ্‌রো কি কেউটের গর্জন!'

জয়ন্ত নিম্ন অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'চুপ'!

সর্পের গর্জন আর শোনা যায় না, কিন্তু তার পরিবর্তে কোথায় সজাগ হয়ে উঠলো তক্ষকের কণ্ঠস্বর! সে-স্বর যেন ডেকে আনতে চাইছে আসন্ন কোনো অমঙ্গলকে!

তারপরেই মন্দিরের অদূরেই জাগ্রত হলো শৃগালদের বহু কণ্ঠে আর্তনাদের মতো চীৎকার!

এতক্ষণ সেখানটা ছিলো মৃত্যুপুরীর মতোন একান্ত নিস্তব্ধ, আচম্বিতে সেখানে উপরি-উপরি এই শব্দের পর শব্দতরঙ্গ অল্পক্ষণের জন্যে অন্ধকার-তরঙ্গকে যেন আলোড়িত এবং ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে আবার নীরব হয়ে গেলো।

সুন্দরবাবু চুপিচুপি কম্পিত স্বরে বললেন, 'জয়ন্ত, এবার আমার সত্যিই ভয় করছে!'

জয়ন্ত বললে, 'চুপ'!

মিনিট চারেক সকলে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে সেইখানেই বসে রইলো। মাথার উপরে কালো আকাশ অগুন্তি তারকাচক্ষু বিস্ফারিত করে যেন এই তিনটি প্রাণীর দিকে তাকিয়ে আছে মৌন, বিপুল বিস্ময়ে। মন্দির চূড়ার উপরকার অশথ বটের ডালপালার ভিতরে নিদ্রিত বাতাস হঠাৎ একবার জেগে উঠে যেন ঘুমের ঘোরেই আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো একবার!

মানিক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জয়ন্তের গা টিপলে।

সুন্দরবাবুও উৎকর্ণ হয়ে আরো একটু উঁচু হয়ে বসলেন।

সেই তিমিরাবৃত গভীর নীরবতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে আর একটা অভাবিত ধ্বনি! মরা, ঝরা, শুকনো পাতাদের ভিতরে জীবন সঞ্চার করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে যেন অতি সাবধানী পায়ের শব্দ!

তিনজনে রুদ্ধশ্বাসে শুনলে, পদশব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে চাতালের ঠিক মাঝখানে এসে থেমে গেলো। খানিকক্ষণ আর কিছুই শোনা যায় না। যেন যে এসেছে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে নিক্ষেপ করছে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি! শব্দটা যেখানে এসে থেমেছিলো, অনুমানে মনে হয় সেখানটা জয়ন্তদের কাছ থেকে পনেরো-ষোলো হাতের বেশি দূর হবে না।

মাটির উপরে আবার জাগলো শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি! অন্ধকার ভেদ করে এই নিশাচর অতিথি আবার ফিরে চলে যাচ্ছে! কিন্তু এবারে সে ধীরে ধীরে যাচ্ছে না, এবারে সে ছুটছে রীতিমতো

দ্রুতবেগে! সে যেন বুঝতে পেরেছে, এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কোন গোপন বিপদ!

জয়ন্ত হঠাৎ লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে তার 'টর্চ'-এর চাবি টিপলে। তীব্র আলোক রেখার মধ্যে ধরা পড়লো একখানা অদ্ভুত মুখ। পর-মুহূর্তেই তিমির-তরঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেলো সেই অপার্থিব মুখখানা।

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'ও কে? ও কে? জয়ন্ত, জয়ন্ত? তুমি ওর মুখখানা দেখেছো?'

জয়ন্ত বললে, 'দেখেছি। আর দেখেছি ওর হাতের লম্বা লাঠি-গাছা!'

মানিক উত্তেজিত স্বরে বললে, 'ও কার মুখ জয়ন্ত, ও কার মুখ? ও মুখ তো মানুষের মুখ নয়?'

জয়ন্ত সহজ ভাবেই বললে, 'ও মুখ মানুষের হোক আর অমানুষেরই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের ভয়ে ঐ মুখের অধিকারী যে পলায়ন করেছে এইটেই হচ্ছে ভাববার কথা। আজ আমাদের পণ্ডশ্রম হলো, এই অন্ধকারের রাজ্যে ওকে আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

সুন্দরবাবু কাতর স্বরে বললেন, 'জীবনে আমি ও-রকম অসম্ভব মুখ আর কখনো দেখতেও চাই না। আমি এখন এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই!'

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### রক্তাক্ত জয়ন্তের কাহিনী

পরদিনের প্রভাত।

সূর্য জানলা-পথে ঘরের ভিতরে এসে মানিকের চোখের পাতার উপরে কিরণ-অঙ্গুলি বুলিয়ে দিতেই তার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসে ঘরের ওপাশের বিছানার দিকে তাকিয়ে সে দেখলে, জয়ন্ত এর মধ্যে শয্যাত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছে। সুন্দরবাবুর ঘরে জয়ন্তকে পাওয়া যাবে ভেবে সেও শয্যাত্যাগ করে বেরিয়ে সুন্দরবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, 'সুন্দরবাবু! অ সুন্দরবাবু! বলি দাদা, এখনো ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

বন্ধ দ্বারের ওপাশ থেকে গর্জন স্বরে শোনা গেলো, 'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিই বটে! কাল তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমার যে হাল হয়েছে!'

মানিক বললে, 'দরজাটা একবার খুলেই দিন না দাদা, তারপর আপনার সব ইতিহাস শুনবো তখন!'

'উঃ', 'আঃ' প্রভৃতি আর্তধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দরজার খিলটা খুলে দিলেন সুন্দরবাবু।

মানিক দেখলে সত্য সত্যই তাঁর অবস্থা দস্তুরমত শোচনীয়। তাঁর মুখ, হাত, পা এবং দেহের যেখানেই চোখ বুলানো যায় সেইখানেই নজর পড়ে, ছোট বড় মলমের পটির পর পটি।

মানিক বললে, 'একি ব্যাপার সুন্দরবাবু?'

—'আবার ইয়ে করা হচ্ছে, ব্যাপার কি বুঝতে পারছো না বুঝি? জঙ্গলে যত কাঁটা ছিল, সব এসে বাসা বেঁধেছে আমার দেহে! কাল কি আর ঘুমিয়েছি? যেটুকু রাত বাকি ছিলো, কেটে গেছে এই পটি লাগাতে লাগাতে!'

মানিক বললে, 'আমার দেহও অবশ্য অক্ষত নেই, কিন্তু আপনার

মতোন দুরবস্থা তো আমার হয়নি? আপনার দেহখানি শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে যে।'

সুন্দরবাবু গজ্‌গজ্‌ করতে করতে যেন আপন মনেই বললেন, 'বনবেড়ালেরা বনে বেড়ালেও কাঁটাগাছ তাদের কিছুই করতে পারে না। আমি হচ্ছি শহুরে সভ্য মানুষ, আঁধার রাতে বনে বনে দাপাদাপি করে বেড়ানো আমার কি পোষায়? হেঃ!'

—'কিন্তু জয়ন্ত কোথায় গেলো বলুন দেখি?'

—'কেন? সে কি ও-ঘরে নেই?'

—'না।'

—'ভারী আশ্চর্য তো! এত ভোরে উঠে সে কোথায় যেতে পারে?'

—'আমিও তো তাই ভাবছি!'

—'হুম্‌, সে আবার সেই সর্বনেশে মন্দিরে যায়নি তো?'

—'যেতেও পারে, তার কথা কিছুই বলা যায় না!'

সুন্দরবাবু সভয়ে বললেন, 'বাপ্‌ রে, রাতের বেলায় আমি আর কখনো ও-মুখো হচ্ছি না!'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আবার জিজ্ঞাসা করছো, কেন? কখনো না, কখনো না! চাকরি যদি যায় তাও ভালো, তবু আমি আর কখনো সেখানে যাবার নাম মুখে আনবো না!'

—'তুচ্ছ কাঁটা-ঝোপের জন্যে এতো ভয়!'

—'কাঁটা-ঝোপের জন্যে নয় হে, কাঁটা-ঝোপের জন্যে নয়।'

—'তবে?'

—'ভূতের ভয়ে!'

—'ভূত?'

—'হ্যাঁ, ভূত ছাড়া আর কি বলতে পারি? টর্চ-এর আলোতে এক মুহূর্তের জন্যে যে মুখখানা আমরা দেখেছিলুম, তার কথা মনে আছে? তুমিও দেখেছো তো?'

—'তা দেখেছি বৈকি!'

—'সেখানা কি মানুষের মুখ?'

মানিক নীরব হয়ে রইল।

—'চুপ করে রইলে কেন? বলো না, সেখানা কি মানুষের মুখ?'

মানিক একটু ইতস্তত করে বললে, 'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মুখখানা অমানুষিক বটে, কিন্তু ওর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারি না।'

—'তোমরা মচ্ কাবে কিন্তু ভাঙবে না, ঐ তো তোমাদের দোষ!'

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, চিরকালই শুনে আসছি ভূত দেখলে মানুষ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ দেখে ভূত যে পালিয়ে যায়, এমন কথা কখনো শুনেছেন কি?'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'মানিক, তোমার এ-যুক্তিটা আমারও মনে লাগছে বটে, কিন্তু এটাও তো হতে পারে, সে আমাদের দেখে পালিয়ে যায়নি?'

—'তবে কাকে দেখে পালিয়ে গেছে?'

—'আলো দেখে। যারা ভূত নামায়, টেবিল চালায়, তাদের মুখে শুনেছি ভূতেরা আলো সহ্য করতে পারে না। তারপর ঐ বুনো ভূতটা আবার যে সে আলো দেখেনি, তার চোখ ঝল্‌সে গেছে টর্চ-এর তীব্র আলোর ধাক্কায়। জয়ন্ত ছোকরা টর্চ জ্বেলে বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। সে টর্চটা না জ্বাললে ভূত বেটা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে যো পেয়ে বোধ হয় আমাদের সকলকেই বধ করতো।'

মানিক হেসে বললে, 'তাহলে আপনি বনে যেতে আর ভয় করছেন কেন?'

—'ও বাবা, ভয় করবো না? কেন ভয় করবো না শুনি?'

—'ভূত তাড়াবার তো খুব সুন্দর উপায় আপনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন! ভূত দেখলেই আলো জ্বালবেন।'

সুন্দরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা অতো সহজ নয়

মানিক! ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা করতে আমি রাজী নই। এই ভুতুড়ে মামলার ভার আমি ছেড়ে দেবো বলে মনে করছি।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমার কি ইচ্ছা জানেন? এই বিচিত্র রহস্যের ভিতরে আরো ভালো করে প্রবেশ করবার জন্যে আমার মনে জেগে উঠেছে বিষম আগ্রহ। কে এই খুনের পর খুন করছে? প্রতি শনি ও মঙ্গলবারের রাত্রে কে ঐ মন্দিরের আনাচে-কানাচে, ঐ বনের সাপ আর বাঘের সঙ্গে হিংস্র রক্তলোভী জন্তুর মতো পাহারা দিয়ে বেড়ায়? কেন সে বিনা কারণে নরহত্যা করে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'এই সব হত্যার ভিতরে কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না বলেই তো আমি হতাশ হয়ে পড়েছি! আর সেইজন্যেই তো মনে হচ্ছে এ-সব হয় ভুতুড়ে কাণ্ড, নয় দৈবী লীলা!'

—'সুন্দরবাবু, আর একটা কথা মনে রাখবেন। অপরাধতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন, সব অপরাধের ভিতর থেকেই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যায় না। এমন অনেক হত্যাকারীর কথা শোনা গিয়েছে, যারা কেবল হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে। এর একটা বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইংরেজ হত্যাকারী জ্যাক্ দি রিপার। হত্যা করে তার কোনই লাভ হোত না, আর সে পুরুষকেও হত্যা করতো না, কিন্তু একেবারে অকারণেই নারীর পর নারীকে হত্যা করতো। মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলেন, এই শ্রেণীর হত্যাকারীরা বিশেষ এক রকম উন্মাদগ্রস্ত। অন্য সব বিষয়েই তাদের হাবভাব আচার-ব্যবহার ঠিক সাধারণ মানুষের মতোন, কেবল হত্যা করবার সুযোগ দেখলেই তারা আর আত্মসংবরণ করতে পারে না। কে বলতে পারে কালী-মন্দিরের এই মামলাটার ভিতরে সেই রকম কোন হত্যাকারীর হাত আছে কি না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু কালী-মন্দিরে আমরা যাকে দেখেছি সেই-ই যদি হত্যাকারী হয়, তাহলে তো তোমার এ সব যুক্তি কোনই কাজে লাগবে না!'

—'কেন ?'

—'যাকে আমরা দেখেছি, আমি কিছুতেই তাকে মানুষ বলে স্বীকার করবো না। কারণ সে-রকম বিভীষণ মুখ নিয়ে কোন মানুষই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি!'

—'কিন্তু তাকেই আপনি হত্যাকারী বলে মনে করছেন কেন ?'

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, 'মনে করবো না ?'

—'না করতেও পারেন!'

—'তুমি এ-কথা বলছো কেন!'

—'যাকে আমরা দেখেছি সে হত্যাকারী না হতেও পারে।'

—'তুমি কী বলছো হে ?'

—'হয়তো যাকে আমরা দেখেছি সে হচ্ছে কোন উন্মাদগ্রস্ত বাজে লোক, রাত-বেরাতে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই তার স্বভাব, হয়তো কোন ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে তার মুখ হয়ে গেছে অমন ভয়ানক-ভাবে বিকৃত! কে বলতে পারে, আসল হত্যাকারী এখনো এই গভীর রহস্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে নেই ?'

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'মানিক, তোমাকে প্রশংসা করতে আমি বাধ্য, তুমি আমার সামনে একটা নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়ে দিলে। ঠিক বলেছো! ঐ মন্দিরের আশেপাশে ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ নয়, কোন বিকৃত মুখ উন্মাদগ্রস্ত মানুষ থাকলেও থাকতে পারে। আর তার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো আর কোন মানুষ-অপরাধীই এই সব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করছে!'

এই রকম সব কথাবার্তা কইতে কইতে আরো খানিকক্ষণ কেটে গেলো।

তারপরই সিঁড়ির উপরে জাগলো পদশব্দ!

মানিক বললে, 'জয়ন্ত আসছে। ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি।'

পদশব্দ সিঁড়ি পার হয়ে দরজার সামনে এসে থামলো, তারপর দেখা গেল জয়ন্তকে।

জয়ন্তের মুখ, জামা, কাপড় সমস্তই রক্তে আরক্ত। কিন্তু তার ওষ্ঠাধরে বিরাজ করছে রহস্যময় হাস্যের লীলা!

মানিক তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ভীত ও বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়! জয়! তোমার এ কী চেহারা? তুমি কোথায় ছিলে? তোমার এমন দশা করেছে কে?'

জয়ন্ত ঘরের ভিতর ঢুকে এক জায়গায় বসে পড়ে বললে, 'মানিক, চিন্তিত হয়ো না। রক্তের আতিশয্য দেখছো বটে, কিন্তু ভগবানের দয়ায় আঘাত আমার বেশি লাগেনি, খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গিয়েছে মাত্র!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, 'জয়ন্ত, এই অবস্থায় তোমায় দেখে আমি যে কি বলবো, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

জয়ন্ত বললে, 'আপনার কিছুই বলবার দরকার নেই সুন্দরবাবু! এইবার বলবার পালা হচ্ছে আমার।'

মানিক জয়ন্তের কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'জয়, আগে তোমার রক্ত ধুয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দি' এসো।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, আগে আমার সব কথা শোনো। আমি বলছি, আমার বিশেষ কিছুই হয়নি।'

মানিক বললে, 'বেশ, তুমি যা ধরবে তা ছাড়বে না জানি। তাহলে আগে তোমার কথাই বলো।'

জয়ন্ত বলতে লাগলো, 'মানিক, তুমি কিছু মনে করো না। তোমাকে কোন কথা না বলেই আমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলুম! আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কালকের রাত্রের ব্যাপারের পর মানুষের দেহের অবস্থা যে কি রকম হয়, সেটা আমার ধারণাতীত নয়। সেই জন্যেই তোমাকে বিশ্রাম করবার অবসর দিয়ে আবার আমি বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলুম। কোন রকম বিপদের ভয় আমি করিনি, কারণ কালকের ব্যাপারের পর আমি মনে করতে পারিনি যে, আর কোনো

রকম নতুন বিপদের আশঙ্কা আছে। আমার মনে ছিলো কতকগুলো খট্‌কা। কাল রাতে যে চেহারা দেখেছিলুম, তাতে এখানকার ঘটনাগুলোকে অলৌকিক বলে মনে করবার কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেই অপার্থিব মূর্তির হাতে ছিল একগাছা লম্বা লাঠি, এ-কথা তোমাদের মনে আছে তো? আর একটা কথাও নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ আছে, প্রথম দিন ঘটনাস্থলে এসেই আমি মাটির উপরে আবিষ্কার করি এমন কোন মানুষের পদচিহ্ন যার হাতে ছিলো একগাছা ফাঁপা লাঠি বা চোঙের মতো কোনো জিনিস।

কালকে রাতের সেই অমানুষিক মূর্তিটাকে আমিও হয়তো অমানুষিক বলেই ধরে নিতে পারতুম, যদি তার হাতে সেই লম্বা লাঠিগাছা না থাকতো। আমি এক দৃষ্টিতেই দেখে নিয়েছিলুম, সেই লাঠিগাছা সাধারণ লাঠির মতোন নয়, লাঠির মতোন দেখতে সেটা হচ্ছে অন্য কোন রকম জিনিস।

জেগে উঠেছিলো আমার কৌতূহল। মানিক, তাই তুমি যেই ঘুমিয়ে পড়লে, আমি তোমার ঘুম ভাঙাবার কোন রকম চেষ্টা না করে শেষ-রাতেই আবার বেরিয়ে পড়লুম। এখান থেকে ঘটনাস্থলে যেতে না যেতেই পূর্বদিকের আকাশে ফুটে উঠলো ঊষার রাঙা হাসির লীলা।

তারপর আবার সেই মন্দিরের চাতালে গিয়ে দাঁড়ালুম, আবার দেখলুম একটা কেউটে সাপকে, আমাকে দেখেই সে কালো বিদ্যুতের মতোন চাতালের আগাছার ঝোপের ভিতরে কোথায় লুকিয়ে পড়লো বুঝতেও পারলুম না। মন্দিরের চাতালে দ্রষ্টব্য কোন কিছুর সন্ধান না পেয়ে আবার ফিরে এলুম মন্দিরে যাবার সেই পথের উপরে—যেখানে উপর-উপরি তিন তিনটি নরহত্যা হয়েছে।

তখন সূর্য উঠেছে। পথের উপরে কোন অন্ধকার নেই—যদিও দুই পাশের জঙ্গলের ভিতরে অন্ধকারকে তার রাজত্ব থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারেনি। কারণ দুপুর বেলাতেও সে-বনের ভিতরে সূর্যের প্রবেশ নিষেধ।

যেখানে পদচিহ্ন দেখেছিলুম, আবার সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সূর্যের আলোক পায়নি বলে সেখানকার মাটি এখনো কাঁচা অবস্থাতেই আছে। প্রথম দিনেই সেখানকার মাটির উপরে কতকগুলো পায়ের দাগ ছিল, সেটা আমি গণনা করেছিলুম। কিন্তু আজ আমি দেখলুম সেখানে অনেকগুলো নতুন পায়ের ছাপ পড়েছে। তার মানে, কাল শনিবারের রাতে এখানে এসে আবার কোন লোক অপেক্ষা করেছিলো। শুধু পায়ের দাগ নয়, সেই সঙ্গে পেলুম পায়ের দাগের পাশে আবার ফাঁপা লাঠি বা চোঙের মতো কোন জিনিসের ছাপ!

তারপরেই আমার কি মনে হলো জানো? মনে হলো কোন অদৃশ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে আমার পানে তাকিয়ে আছে! তৎক্ষণাৎ সচমকে রিভলভার বার করে এদিকে-ওদিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু কারুকে দেখতেও পেলুম না, কারুর সাড়াও পেলুম না। সেখানকার জঙ্গল এমন ঘন যে, প্রভাতেও মনে হলো আমি যেন রাত্রির অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে আছি।

কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার চললুম মন্দিরের দিকে। কিন্তু যেতে যেতে সন্দেহ জাগলো, আমার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো কেউ পাশের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। হাতের রিভলভার প্রস্তুত রেখেই আমি অগ্রসর হলুম—কোনদিকে বনের পাতাও যদি একটু কাঁপে তখনি সেইখানে গুলি ছুঁড়বো বলে। কিন্তু পথের উপরে রিভলভার ব্যবহার করবার কোনই দরকার হলো না।

ভাবলুম অদৃশ্য শত্রুকে দেখছি আমি মনের ভুলে। তাই আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে চাতাল পেরিয়ে আবার সেই মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

সেই ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার নামে এ-অঞ্চলে এতো সব অসম্ভব বিজ্ঞাপন, অথচ আমি দেখলুম কোন দুরাত্মার কল্পনার আদর্শে জড় প্রস্তরে গড়া কুৎসিত এক দানবী মূর্তি! আমি হিন্দু। আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না যে, যাঁকে

আমি মা বলে ভালোবাসি, ভক্তি করি, তাঁর মূর্তি হতে পারে এতো হিংস্র, এত নিষ্ঠুর !

দাঁড়িয়ে ভাবছি, হঠাৎ মন্দিরের তলায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলো বিষম চঞ্চল হয়ে উঠলো ! তাদের ডানার ঝট্‌পটানি শব্দে মন্দিরের ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো—মনে হলো যেন তারা কোন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে !

উপর দিকে মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, আচম্বিতে মনে হলো মন্দিরের ছাদটার একটা জায়গা কেমন দুলে দুলে উঠলো ! পর মুহূর্তে দেখলুম ছাদের একটা অংশ সশব্দে ভেঙে পড়েছে ! তাড়াতাড়ি একদিকে সরে গেলুম—কিন্তু পারলুম না নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে। মাথার উপরকার ছাদ নিচে নেমে আমার মুখের খানিকটা মাংস আঁচড়ে বার করে নিয়ে গিয়ে সশব্দে মাটির উপরে এসে পড়লো। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি দেখে নিয়েছি যে, তোমাদের ঐ ডাকাতে-কালীর মূর্তি বোধ হয় ছাদের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মনে হলো সমস্ত মন্দিরটা এখনি ধসে পড়বে। বিদ্যুৎবেগে বাইরের সেই চাতালে এসে দাঁড়ালুম। তারপর লক্ষ করলুম, মন্দিরের ছাদের খানিকটা অংশই ভেঙে পড়েছে। যখন ভাবছি এর কারণ কি, তখন হঠাৎ শুনলুম মন্দিরের পিছনকার অরণ্যে একটা সন্দেহজনক শব্দ। যেন কে তাড়াতাড়ি ছুটে গভীরতর অরণ্যের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। নিজের রক্তের আস্বাদ পেয়েছি, বুঝতে পারছি আমার মাথার উপর থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। তখনো আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিনি—ভাবলুম, হয়তো আমি আর বাঁচবো না—কিন্তু দেখে নেবো কে এখান থেকে ছুটে ওদিকে চলে যাচ্ছে। তড়িৎবেগে এ-কথাটাও মনে হলো, ওখান দিয়ে যে ছুটে চলে যাচ্ছে, আমার মাথার উপরে ছাদ ভেঙে পড়বার কারণ হচ্ছে সেই-ই !

ঝোপঝাপের চাঞ্চল্য লক্ষ করে আমিও তীরের মতোন সেইদিকে ছুটে চললুম ! এবং যেতে যেতেই আমার এই 'অটোমেটিক' রিভলভার থেকে গুলিবৃষ্টি করতে লাগলুম ঘন-ঘন।

কিন্তু বিফল হলাম আমি! যাকে ধরবার বা মারবার চেষ্টা করছিলুম তাকে পারলুম না ধরতে বা মারতে। তারপর আর কোনো কথাই বলবার নেই। হতাশ ভাবে আবার এখানে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### মঙ্গলবারের রাত্রি

আজ মঙ্গলবারের প্রভাত।

সুন্দরবাবু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করছেন একখানি সংবাদপত্র এবং জয়ন্ত ও মানিক আপন আপন আসনে বসে শ্রবণ করছে। এমন সময় এসে হাজির হলেন মহেন্দ্রবাবু। এসেই বললেন, 'সব খবর শুনেছেন বোধ হয়?'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর?'

—'সেই অপয়া কালী-মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়েছে? তবে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন? শিবের মূর্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু সেই ডাকাতে-কালীমূর্তির বিশেষ কোনোই ক্ষতি হয়নি!'

জয়ন্ত বললে, 'তাই নাকি?'

এতক্ষণ পরে মহেন্দ্রবাবু ভালো করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। চমকে উঠলেন 'একি জয়ন্তবাবু, একি! আপনার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন?'

জয়ন্ত একটু হেসে বললে, 'একটা দুর্ঘটনায় মাথায় কিছু চোট লেগেছে।'

—'বলেন কি!'

—'ব্যস্ত হবেন না, বিশেষ কিছুই নয়। সামান্য আঘাত।'

—'কালী-মন্দির ভেঙে পড়ার কথা আজ সকালেই আমি শুনেছি। ওদিকে তো কোন লোক পা বাড়াতে সহজে ভরসা করে না! আজ সকালে একটা রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে যে, কালী-মন্দিরের উপর দিকটা নাকি একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে। তাই শুনে লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখলুম রাখাল মিথ্যা বলে নি। মন্দিরের ছাদের খানিকটা গাছপালা-

সুদ্ধ ভেঙে পড়েছে। দেবীর মূর্তিও রাবিশের দ্বারা আবৃত। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, অতো রাবিশের চাপেও দেবীমূর্তির বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয়নি! ভেঙে গুঁড়ো হয়েছে কেবল শিবের মূর্তির খানিকটা।'

জয়ন্ত ও মানিক পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনই কথা বললে না।

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনাদের দেবী বোধ হয় এতো সহজে মরতে রাজী নন্। তিনি হয়তো আরো নরবলি চান!'

মহেন্দ্রবাবু শিউরে উঠে সভয়ে বললেন, 'আপনার অনুমানই সত্য বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক্। আমি আজ এখানে কেন এসেছি জানেন?'

—'না বললে জানবো কেমন করে।'

—'আজ রাত্রে আমার ওখানে আপনাদের আহার করতে হবে, নিমন্ত্রণ করলেও আপনারা নারাজ হন্, কিন্তু আজ আর কোন আপত্তিই শুনবো না।'

জয়ন্ত বললে, 'মাপ করবেন মহেন্দ্রবাবু। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে নিমন্ত্রণে যাত্রা করবার শখ আমার নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি একটা জিনিস লক্ষ করছি মহেন্দ্রবাবু। ঠিক বেছে বেছে শনি আর মঙ্গলবারেই আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন।'

মহেন্দ্রবাবু নীরবে একটুখানি রহস্যময় হাসি হাসলেন।

মানিক বললে, 'আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে, প্রকাশ করে বলবো কি?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সন্দেহ? কি সন্দেহ?'

—'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন মহেন্দ্রবাবু? শনি আর মঙ্গলবারে আপনি বোধহয় নিমন্ত্রণ করতে আসেন সাংঘাতিক বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্যেই।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ আপনি বোধ হয় চান না শনি আর মঙ্গলবারে কৌতূহলী হয়ে রাত্রিবেলায় আমরা ঐ মন্দিরের কাছে যাই। কারণ, আপনি দেখেছেন, ঐরকম কৌতূহলের ফলে ওখানে গিয়ে এর আগেই তিনজন লোকের জীবন গিয়েছে।'

মহেন্দ্রবাবু লজ্জিতভাবে মৃদু হেসে বললেন, 'মানিকবাবু, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। আগে আমি ঠিক বিশ্বাস করতুম না যে এখানকার প্রবাদের মূলে আছে কোন সত্য, কিন্তু এখন আমার সে-বিশ্বাস আর নেই! আবার যে বেপরোয়ার মতো কেউ ঐ মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে, এটা আমি চাই না। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, তাই, এই পল্লীগ্রামে এসে শেষ-জীবনটা নির্বিবাদে উপভোগ করতে চাই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! আপনার সুবুদ্ধি দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি, শনি আর মঙ্গলবারে ও-মন্দিরের নামও আমি আর মনে আনবো না। আজ রাত্রিবেলায় আমি নিশ্চয় আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো! মানিকের কি মত?'

মানিক বললে, 'আমারও কোনই আপত্তি নেই।'

মহেন্দ্রবাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, 'কিন্তু জয়ন্তবাবু বলছেন, উনি নাকি আমার বাড়িতে যাবেন না।'

জয়ন্ত বললে, 'অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমি একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবো। কিন্তু আজ আমার অবস্থা দেখেছেন তো? এ-অবস্থায় নিমন্ত্রণ রাখতে আমি অভ্যস্ত নই।'

—'কিন্তু সন্ধ্যার পরে এখানে একলা বসে থাকতে আপনার ভালো লাগবে?'

—'আপনি যদি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে আজকের সন্ধ্যাটা আমি একলা বসে অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবো।'

—'বলুন, কি অনুরোধ?'

—'আপনার সেই বিলাতী বর্মটি যদি দয়া করে আজ আমার এখানে পাঠিয়ে দেন, তাহলে একলা থাকতে আমার কোনই কষ্ট হবে না।'

—মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বললেন, 'সে বর্মটা নিয়ে আপনি কি করিবেন?'

—'সেই বর্ম আর শিরস্ত্রাণের কলকব্জাগুলি আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ভারতবর্ষের অনেক রকম প্রাচীন বর্ম পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু বিলাতী বর্ম পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। নতুন কিছু পেলেই তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবার জন্যে আমার মনে জেগে ওঠে আগ্রহ। আপনি কি আমার এ অনুরোধটি রক্ষা করতে পারবেন?'

মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'কেন পারবো না, নিশ্চয়ই পারবো! আজ বৈকালেই বর্মটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

—'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!'

—'আমি ধন্যবাদের ভিখারী নই জয়ন্তবাবু, আপনারা তুষ্ট হলেই আমি হবো আনন্দিত। তাহলে সুন্দরবাবু, মানিকবাবু, অন্তত আপনারা আজ সন্ধ্যার পর আমার দীনধামে পদার্পণ করতে রাজী আছেন তো?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে গেলো মাসেই ডিস্‌পেপশিয়া রোগ থেকে কোনরকমে আমি আত্মরক্ষা করেছি, ভোজ্য দ্রব্যের তালিকাটা বেশি দীর্ঘ না হলেই বাধিত হবো।'

মহেন্দ্রবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'এই পল্লীগ্রামে দীর্ঘ তালিকার কথা ভেবে আপনার চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই! ছোটখাটো ভাজাভুজির কথা ছেড়ে দিন, তার ওপরে আমি আয়োজন করেছি যৎসামান্য! এই দু-একখানা 'ওমলেট', দু-একখানা মাছের 'ফ্রাই', দু-একখানা 'ফাউল কাটলেট', আর 'ফাউল রোস্ট', দু-চারখানা লুচি আর যৎকিঞ্চিৎ পোলাওয়ের আয়োজন করেছি, আশা করি তাতে আপনার আপত্তি হবে না?'

সুন্দরবাবু গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ফাউলে আমার কোন আপত্তিই নেই। ডাক্তার আমাকে রোজই ফাউল খেতে বলেছেন। ফাউল নাকি পেটে পড়লেই হজম হয়ে যায়।'

মানিক সুন্দরবাবুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। সুন্দরবাবুর ভয় হলো, পাছে সে আবার কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে! কিন্তু মানিক এ-যাত্রা তাঁকে মুক্তি দিলে, বাক্যবাণের দ্বারা আঘাত করবার কোনই চেষ্টা করলো না!

মহেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সুন্দরবাবুর সঙ্গে মানিক যখন বাসায় ফিরে এলো, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু দোতলায় উঠে জয়ন্তের পাত্তা পাওয়া গেলো না। তার শয্যা শূন্য।

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঞ্চিত করে বললেন, 'হুম্! এর মানে কি?'
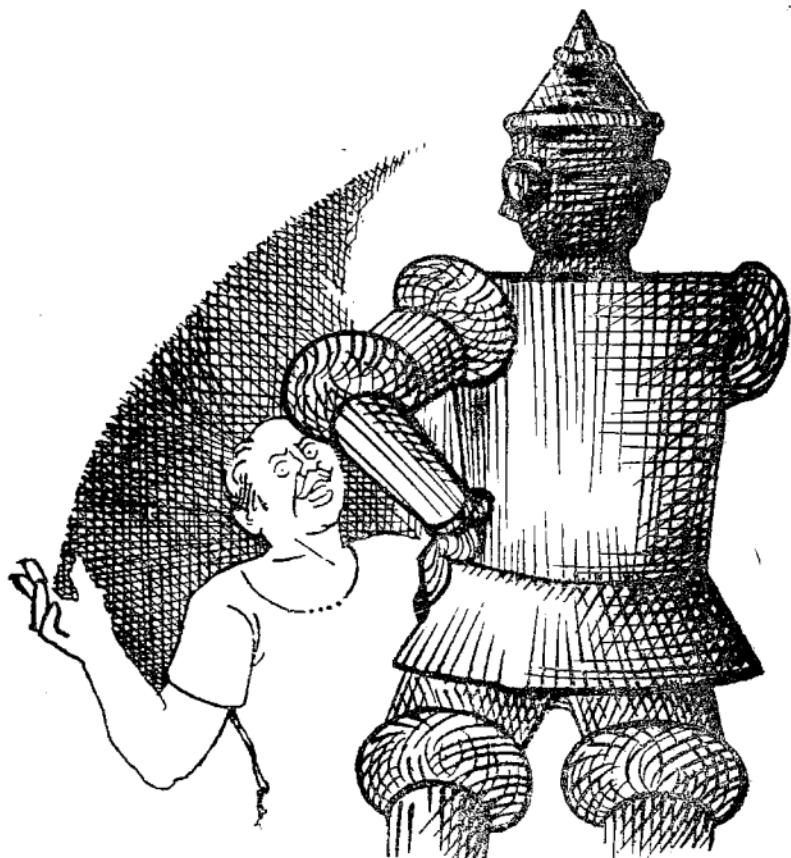
মানিক জানতো জয়ন্তের অভ্যাস। সে কখন কি করে কাকপক্ষীও টের পায় না। বিনা কারণে জয়ন্ত অদৃশ্য হয়নি নিশ্চয়ই! অতএব সে নিশ্চিন্ত ভাবেই বললে, 'জয়ন্ত বোধহয় একটু বেড়াতে গিয়েছে। আসুন আমরা শুয়ে পড়ি।'

সুন্দরবাবুর চক্ষু তখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছিলো। চারখানা 'ওমলেট,' আটখানা মাছের 'ফ্রাই', গোটা দশ-বারো চপ-কাটলেট, দুটো 'ফাউল রোস্ট,' ষোলখানা লুচি এবং এক থালা পোলাও খাবার পর কোনো মানুষই বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। অতএব তিনি আর বাক্যব্যয় না করে জামাকাপড় বদলে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

গভীর রাত্রে হঠাৎ সুন্দরবাবুর ঘুম গেলো ভেঙে। ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে তিনি শুনলেন, তাঁর ঘরের দরজার বাহির

থেকে কে ঘন-ঘন কঠিন আঘাত করছে। যেন ঠোকাঠুকি হচ্ছে কাঠে লোহায় !

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিদ্রাজড়িত চক্ষে আলো জেলে দরজা খুলে দিয়েই তিনি বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন।

বিষম ভারী ভারী লৌহময় পা ফেলে ভিতরে এসে ঢুকলো, ভয়াবহ এক মূর্তি।

বিস্ময়ে এবং ভয়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে যত পিছিয়ে আসেন, মূর্তি ততই এগিয়ে আসে তাঁর দিকে!

অবশেষে সুন্দরবাবু মহা চিৎকার করে ডাকতে বাধ্য হলেন, 'মানিক! মানিক! মানিক!'

কিন্তু ইতিমধ্যেই মানিকেরও ঘুম গিয়েছিল ভেঙে। সেও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে বললে, 'কি হয়েছে সুন্দরবাবু? ব্যাপার কি?'

আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে সুন্দরবাবু হাত তুলে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'চেয়ে দেখ মানিক, চেয়ে দেখ! মহেন্দ্রবাবুর সেই বর্মটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! এ আমরা কোন্ দেশে এলুম রে বাবা, এখানে সবই অলৌকিক।'

জীবন্ত বর্ম তার শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেললে এবং তারপরই আত্ম-প্রকাশ করলো জয়ন্তের সুপরিচিত মুখ।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'তুমি? জয়ন্ত!'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, মৃত বর্মের ভিতরে আমি হচ্ছি জ্যান্ত জয়ন্ত! এখনো আর কোনো সন্দেহ আছে নাকি?' এই বলে জয়ন্ত একে একে বর্মের অন্যান্য অংশগুলো নিজের দেহের উপর থেকে খুলে ফেলতে লাগল।

মানিক এতক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিল জয়ন্তের দিকে। এখন দু-পা এগিয়ে এসে বললে, 'জয়, এ আবার কি ব্যাপার? তোমার একি অদ্ভুত শখ? এই নিশুত রাতে ঐ সেকেলে ভারী বর্মটা পরে কোথায় তুমি বেড়াতে গিয়েছিলে?'

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললে, 'ডাকাতে কালীর ভাঙা মন্দিরে!'

—'আবার তুমি সেখানে গিয়েছিলে!'

—'হ্যাঁ মানিক।'

—'কিন্তু কেন?'

'আজ যে মঙ্গলবারের রাত্রি! আজ নাকি ডাকাতে কালী জাগ্রত হন, এ-কথা কি ভুলে গিয়েছ?'

মানিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ঐ বিপজ্জনক জায়গায় বারবার কেন তুমি একলা যাতায়াত করছো? এরকম দুঃসাহস অত্যন্ত অন্যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার দুঃসাহসের মধ্যে সুযুক্তির অভাব নেই। এই সেকেলে বর্মটা একালেও দুর্ভেদ্য। তার উপরে আমি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য নিতেও ভুলিনি। অনেক ভেবে-চিন্তেই আজ আবার আমি মন্দিরের দিকে গিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'বল কি হে, ঐ ভারী বর্মটা পরে হাঁটতে তোমার জিভ বেরিয়ে পড়েনি?'

—'না, জিভ আমার মুখের ভিতরেই ছিল। যে বর্ম পরে মানুষ একদিন যুদ্ধযাত্রা করতে পেরেছে, সেটা পরে আজ আমিই বা মন্দিরে যাত্রা করতে পারব না কেন? আমিও কি মানুষ নই?'

—'সেখানে গিয়ে আজও নতুন কিছু দেখতে পেয়েছ নাকি?'

—'তা পেয়েছি বৈকি!'

মানিক আগ্রহ ভরে বললে, 'আজ আবার কি দেখেছ জয়ন্ত?'

জয়ন্ত বলতে লাগল:

'গোড়া থেকেই সব শোনো। বর্মটাকে আমি কোন বাজে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে মহেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিইনি। আমার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল।

তোমরা চলে যাবার পর আমি বেশ খানিকক্ষণ এইখানে বসেই অপেক্ষা করলুম। তারপর বর্মটাকে পরে যখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম, আকাশ-পট থেকে তখন অদৃশ্য হয়েছে তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রকলা। কিন্তু চাঁদ অস্ত গেলেও শনিবারের রাত্রির মতোন আজকের পৃথিবীও তেমন অন্ধকারের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল না।

কিন্তু মন্দিরের কাছটা আজকেও তেমনি পৃথিবী-ছাড়া একটা অভিশপ্ত স্থানের মতোন দেখাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে মন্দিরের প্রধান পথটার উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলুম, আজ এই বিপজ্জনক পথ দিয়েই মন্দিরের ভিতরে

প্রবেশ করবার চেষ্টা করবো। যে কোন মুহূর্তে যে কোন বিপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রিভলভারটাকে আমি বাগিয়ে ধরলুম। বলা বাহুল্য, আমার আপাদমস্তক বর্ম ঢাকা থাকলেও আমার দৃষ্টিপথ ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। সমস্তই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম—অবশ্য ঐ অন্ধকারে যতখানি স্পষ্ট দেখা সম্ভবপর।

তারপর সেই সাংঘাতিক জায়গাটার কাছে এসে পড়লুম, যেখানে বারবার মানুষের প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে চিরনিদ্রার দেশে।

চারিদিক স্তব্ধ, এমন কি বাতাসও যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে গাছ-পালাগুলোকে একেবারে নিঃসাড় করে দিলো।

ঠক্ করে একটা শব্দ হলো আমার বর্মের উপরে, বাম দিকে! যদিও আমি কিছুই অনুভব করতে পারলুম না, তবু সেই শব্দ শুনেই আমার বুঝতে দেরি লাগল না যে, একটা কোন জিনিস এসে আঘাত করেছে আমার বর্মকে!

পর মুহূর্তেই 'অটোমেটিক্' রিভলভার থেকে গুলির পর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলুম অরণ্যের সেই নির্দিষ্ট ঝোপের ভিতরে, যেখানে দেখেছিলুম ফাঁপা লাঠির দাগ এবং পদচিহ্ন। 'টর্চ'-এর আলো জ্বেলেও আজও কারুকে দেখতে পেলুম না, বনের ভিতরে শুনলুম খালি অতি দ্রুত পদধ্বনি।

পায়ের শব্দের দিকে আরো গোটাকয়েক গুলি নিক্ষেপ করে আবার ফিরে পথের উপরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর পথের দিকে আলোকপাত করে খুঁজে পেলুম একটি অতি তুচ্ছ জিনিস। সেই জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আবার আমি বাসায় ফিরে এসেছি।'

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে জিনিসটি কি জয়ন্ত?'

সেটিকে দুই আঙুলে ধরে জয়ন্ত নিজের হাতখানা সুন্দরবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—'ওটা তো দেখছি খুব সরু লিক্‌লিকে একগাছা কাঠি!'

—'হ্যাঁ, কাঠিই বটে!'

সুন্দরবাবু ফস্ করে হাত বাড়িয়ে কাঠিটা ধরতে গেলেন।

জয়ন্ত চট্ করে নিজের হাতখানা টেনে এনে বললে, 'সাবধান সুন্দরবাবু, এ-কাঠিটি হচ্ছে কেউটে সাপের মতোন বিষাক্ত!'

সুন্দরবাবু ভুঁড়ি দুলিয়ে পিছন দিকে একটি লম্ফত্যাগ করে বললেন, 'হুম্। বলো কি হে?'

—'হ্যাঁ, সুন্দরবাবু, এটি সাধারণ কাঠি নয়। শনি আর মঙ্গলবারের রাত্রে এখানে তিনজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, এই রকম মারাত্মক কাঠির আঘাতেই।'

সুন্দরবাবু বলেন, 'কাঠি দিয়ে নরহত্যা? বাবা, এমন বেয়াড়া কথাও তো কখনো শুনিনি!'

—'এটাকে কাঠিই বা বলছি কেন? এটা হচ্ছে কাঠের তৈরি বিষাক্ত শলাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপরে খানিকটা টিনের পাতও আছে। আমি মেপে দেখেছি, লম্বায় এটি নয় ইঞ্চি আর এর বেড় হচ্ছে এক ইঞ্চির দশভাগের এক ভাগ মাত্র। প্রচ্ছন্ন হত্যাকারী এই শলাকা নিক্ষেপ করে আজ আমাকেও দুনিয়া থেকে সরাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার বর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছে তার সে চেষ্টাকে।

আজ আমার উপরে যে আক্রমণ হবে এটা আমি জানতুম, তাই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলুম এই লৌহবর্ম পরিধান করে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'যাক্, রহস্যের একদিকটা পরিষ্কার হলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এখানে শনি-মঙ্গলবারে যে কাণ্ডগুলো হয়েছে তার মধ্যে অলৌকিক কিছুই নেই। তবু অনেকগুলো জিজ্ঞাসার কোনই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। ধরো, প্রথম জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কেবল শনি আর মঙ্গলবারেই অপরাধী এখানে নরহত্যা করে কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'অপরাধী যে অন্য অন্য বারেও মানুষ মরতে চায়, সে প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি! ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমার মাথার

উপরে পড়ো-পড়ো মন্দিরের ছাদটাকে ফেলে অপরাধী যেদিন আমাকে বধ করতে চেয়েছিল সে দিনটা ছিল রবিবার ?'

—'তা তো বটে, মনে পড়েছে ! কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কোথায় ? এইসব হত্যার উদ্দেশ্য কি ?'

—'অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলেই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে বিলম্ব হবে না।'

—'তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন করছি। অপরাধী কে ? সে তো এখনো অগাধ জলের মকরের মতোন অতলে ডুবে আছে !'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'অপরাধী যে কে সে বিষয়েও আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আমার অনুমান সত্য কিনা, কাল সকালেই তা জানতে পারা যাবে। আপাতত চলুন, নিদ্রা-দেবীর আরাধনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।'

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### স্কুপিটান

পরের দিন খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠেই সুন্দরবাবু দেখলেন, সাজ-পোশাক পরে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্ত এবং মানিক।

জয়ন্ত বললে, 'আরে মশাই, আপনাকে ডেকে ডেকে আমাদের গলা যে ভেঙে গেল, কিন্তু আপনার নাক-ডাকা যে বন্ধ হতে চায় না কিছুতেই!'

মানিক বললে, 'তুমি ভুল বলছ জয়ন্ত! আমাদের গলা সুন্দর-বাবুকে ডাকছিলো, কিংবা সুন্দরবাবুর নাক ডাকছিলো আমাদের, সেইটেই আগে স্থির হোক! ওঃ, ধন্যি সুন্দরবাবু! হিপোপটেমাসের নাকও বোধহয় এমন উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে পারে না।'

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'মানিক সকাল বেলাতেই তুমি একটা অপয়া জানোয়ারের সঙ্গে আমার তুলনা করছ!'

—'কখ্খনো নয়। হিপোপটেমাস যে একটা অপয়া জীব, আগে সেইটেই আপনি প্রমাণ করুন।'

সুন্দরবাবু শয্যাত্যাগ করে বললেন, 'প্রমাণ আমি কিছুই করতে চাই না। আমার ইচ্ছা, দয়া করে তুমি স্তব্ধ হও!'

জয়ন্ত বললে, 'এখন এ-সব বাজে কথা আমার ভালো লাগছে না। সুন্দরবাবু, আপনি চটপট হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোন।'

—'কেন, কিসের এত তাড়াতাড়ি?'

—'এখান থেকে কলকাতার প্রথম ট্রেন ছাড়ে বেলা আটটার সময়।'

—'তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি?'

—'আমরা সরকারের চাকর নই আমাদের হয়তো কিছুই আসে-

যায় না, কিন্তু তাড়াতাড়ি না করলে পরে হয়তো আপনাকেই অনুতাপ করতে হবে।'

—'মানে?'

—'কলকাতার প্রথম ট্রেন যখন ছাড়বে, তখন স্টেশনে হাজির থাকা দরকার।'

—'তোমার এ-কথাটাও যেন কেমন হেঁয়ালির মতোন শুনতে হলো না?

জয়ন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রত্যেক কথায় আমি আর এত জবাবদিহি করতে পারবো না। কালকেই আপনাকে বলেছি, আমি যা অনুমান করেছি তা সত্য কিনা আজ পরীক্ষা করে দেখবো। আমি আর মানিক এখন আগেই স্টেশনের দিকে চললুম—কারণ যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। ইচ্ছা করেন তো, আপনি পরে স্টেশনে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। যদি যান তো, দয়া করে সঙ্গে দু-জন চৌকিদার নিয়ে যেতে ভুলবেন না।'

হতভম্ব সুন্দরবাবু বোকার মতোন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু আপন মনেই বললেন, 'দু-জন চৌকিদার নিয়ে যেতে বললে কেন? জয়ন্ত কি তাহলে রহস্যভেদ করতে পেরেছে? স্টেশনে গিয়ে কারুকে কি গ্রেপ্তার করতে হবে? নাঃ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, জয়ন্ত-ছোকরা পেটের কথা মোটেই ভাঙতে চায় না—ঐ হচ্ছে তার মস্ত একটা দোষ! দেখছি আমারও না গিয়ে উপায় নেই—কিন্তু এ-সব ধুমধাড়াক্কা আমারও আর পোষায় না! ভোরের বেলায় উঠে কোথায় দু-তিন পেয়ালা চা আর জলখাবার খাব, না, ছোটো এখন ঘোড়ার মতোন স্টেশনের দিকে! আবার ডবল্ চৌকিদার! কেন রে বাবা, হঠাৎ চৌকিদারের দরকার হলো কেন? হুম্!'

জয়ন্ত ও মানিক স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই ট্রেন এসে হাজির হলো সশব্দে।

মানিক কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'জয়ন্ত, এখনো তুমি আমাকেও কিছু বলনি। ব্যাপারখানা কি? কেন আমরা এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে এলুম?'

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, তুমিও সুন্দরবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করবার চেষ্টা করো না! ট্রেনের ঐ দিকে ছুটে যাও, আমি যাচ্ছি এইদিকে।'

—'তারপর?'

—'আমরা এখানে দেখতে এসেছি, মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভার কলকাতার দিকে যাবার চেষ্টা করে কিনা! অর্থাৎ সে এখান থেকে পালাতে চায় কিনা!'

দুইজনে দ্রুতপদে দুইদিকে ধাবমান হবার উপক্রম করলে, কিন্তু তার পরমুহূর্তে দু-জনেই দেখতে পেলে, যার অন্বেষণে তারা এখানে এসেছে, মহেন্দ্রবাবুর সেই ড্রাইভারই টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে আবির্ভূত হলো!

জয়ন্ত সানন্দে চুপিচুপি বললে, 'মানিক, আমার অনুমানই সত্য! আমি কালকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, ঐ লোকটা আজ এখান থেকে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। ঐ দেখ, ও-লোকটাও আমাদের দেখতে পেয়েছে। লক্ষ করছ কি, ওর মুখের ভাবটা কি রকম ম্লান হয়ে গেলো! চলো, এখন আমরা ওর দিকেই অগ্রসর হই। ও-লোকটা বোর্ণিওর বাসিন্দা বটে কিন্তু এখানে এসে বাংলা শিখেছে, সুতরাং ওর সঙ্গে কথা কইতে কোন অসুবিধা হবে না। সুন্দরবাবু না আসা পর্যন্ত বাজে কথায় ওকে আটক রাখতে হবে।'

জয়ন্ত ও মানিক সেই লোকটার কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, 'তুমি মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভার না?'

সে বললে, 'হাঁ হুজুর!'

—'তোমার নাম তো আলি?'

—'হাঁ হুজুর!'

—'তুমি এত সকালে স্টেশনে এসেছ যে ?'

—'আমাকে কলকাতায় যেতে হবে।'

—'কলকাতায় ? কেন ?'

—'সেখানে আমার জরুরী কাজ আছে।'

—'মহেন্দ্রবাবুর কাজ নয়, তোমার কাজ ?'

—'হাঁ হুজুর। আমারই কাজ।'

—'তুমি চলে গেলে মহেন্দ্রবাবুর কোন অসুবিধে হবে না ? তাঁর কি আরো ড্রাইভার আছে ?'

—'না হুজুর।'

—'তবে !'

—'আমি বাবুজীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি।'

ঠিক সেই সময় শোনা গেল ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাধ্বনি।

আলি তাড়াতাড়ি ট্রেনের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু জয়ন্ত আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললে, 'শোনো আলি !'

আলি জয়ন্তকে সুমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললে, 'হুজুর, এখন আর কিছু শোনবার সময় নেই। গাড়ি এখনি ছেড়ে দেবে।'

—'বেশ তো, তুমি পরের গাড়িতে যেয়ো না ! তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু কথা আছে।'

—'আমার আর কোন কথা শোনবার সময় নেই হুজুর। পরের গাড়িতে গেলে আমার চলবে না।' আলির চোখে-মুখে ফুটে উঠলো বিদ্রোহের ভাব।

জয়ন্ত এইটেই আশা করছিলো। সে কঠিন কণ্ঠে বললে, 'আলি, তোমাকে পরের গাড়িতেই যেতে হবে ! আগে তুমি আমার কথা শোনো।'

আলি ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'বাবুজী কি আমাকে জোর করে

ধরে রাখতে চান ?'

'যদি বলি তাই চাই ?'

হঠাৎ আলির দেহ হয়ে উঠল সোজা এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে গেল তীব্রবেগে !

জয়ন্ত অসতর্ক ছিল না। কিন্তু সে কোন রকম ব্যস্ততাই দেখালে না, অত্যন্ত শান্ত ও সহজ ভাবেই আলির মুষ্টিবদ্ধ হাত দু খানা নিজের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করে বললে, 'বাপু, এইবারে পারো তো তুমি আমার হাত এড়িয়ে যাও !'

সঙ্গে সঙ্গে আলির হাতের মণিবন্ধের উপরে জয়ন্তের হাতের চাপ লোহার মতোন কঠিন হয়ে উঠলো। আমাদের এই জয়ন্তের সঙ্গে আগে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন তার অমানুষিক শক্তির কথা। তার হাতের টানে লোহার গরাদও বেঁকে যায় সীসের দণ্ডের মতো, সুতরাং আলির অবস্থা যে কি রকম হলো, এখানে তা বিশেষ করে উল্লেখ করবার দরকার নেই।

আলি বিকৃত মুখে আর্তস্বরে বললে, 'হুজুর, ছেড়ে দিন !'

—'ছেড়ে দিলে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।'

—'কেন আপনি আমাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন হুজুর ?'

—'তোমাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

গাড়ি তখন স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আলি হতাশ ভাবে বললে, 'গাড়ি ছেড়ে দিলো। বলুন, আপনি কি জানতে চান ?'

—'রতনপুরে এসে 'ব্লো-পাইপ' ব্যবহার করছো কেন ?'

আলি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে, 'কি বললেন হুজুর ?'

—'আমি 'ব্লো-পাইপ'-এর কথা বলছি।'

—'সে আবার কি হুজুর ?'

—'ও, তুমি বুঝি 'ব্লো-পাইপ'-এর নাম শোনোনি? আচ্ছা, তুমি তো বোর্নিওর লোক। 'সুম্পিটান'-এর নাম শুনেছো তো?'

—'সুম্পিটান্?'

—'আলি, আমার সঙ্গে ন্যাকামি করো না। বোর্নিওতে আমরাও গিয়েছি। সেখানে 'সুম্পিটান'-এর নাম জানে না এমন লোক কেউ আছে কি?'

—'হুজুর কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'বেশ, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। 'সুম্পিটান' হচ্ছে সুদীর্ঘ লাঠির মতোন একটা জিনিস, যার ভিতরটা হচ্ছে ফাঁপা। তার এক মুখে থাকে অনেক সময়ে বর্শা-ফলক, তাকে তখন অনায়াসেই বর্শার মতোন ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তার ভিতরে থাকে সাগুকাঠে তৈরী একটি নয়-দশ ইঞ্চি সূক্ষ্ম শলাকা, আর সেই শলাকায় মাখানো থাকে 'ইপো', গাছের তীব্র বিষ। তার যে-মুখে বর্শার ফলক নেই, সেই মুখে মুখ দিয়ে সজোরে ফুঁ দিলে ভিতরকার শলাকাটি তীর-বেগে বহুদূরে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে। তারপর কোন জীবজন্তুর দেহে গিয়ে সেই শলাকা যখন বিদ্ধ হয়, তখন তার জীবনের কোন আশাই আর থাকে না। কেমন, এইবারে 'সুম্পিটান' কাকে বলে বুঝতে পেরেছ কি?

আলি কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নতদৃষ্টিতে।

জয়ন্ত বললে, 'আলি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না। আমি বেশ জানি, তুমি এই বিষাক্ত শলাকা ছুঁড়ে তিনজন মানুষকে হত্যা করেছো। তারপর তুমি কালী-মন্দিরের পড়ো-পড়ো ছাদ কোন রকমে ফেলে দিয়ে আমাকেও যমালয়ে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলে। কেবল তাই নয়, তারপর তুমি আমাকে লক্ষ্য করেও শলাকা ত্যাগ করেছিলে। কিন্তু আমি আন্দাজে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। সাগুকাঠের সেই শলাকা আমার বর্মের উপরে 'ইপো' গাছের বিষ ছড়িয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আর তার আগেও গেলো

অমাবস্যার রাতে মন্দিরের চাতালে দেখেছিলুম তোমার আর এক অপার্থিব মূর্তি। মূর্খ! আমি অতো সহজে ভোলবার ছেলে? আমি বেশ বুঝতে পারছি, সে রাত্রে তুমি মুখে পরেছিলে একটা অতি কদর্য মুখোশ। কেমন, আমি কি ঠিক বলছি না?'

আলি হঠাৎ মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কাতর স্বরে বললে, 'হুজুর, আপনি যখন সব জানেন, তখন আমাকে আর এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'সব কথা হয়তো এখনো আমি জানতে পারিনি। তাই তোমাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। মিথ্যা উত্তর দিও না, কারণ মিথ্যা উত্তরে আমি ভুলবো না।'

আলি বললে, 'হুজুর, আর আমার মিথ্যা বলবার ইচ্ছা নেই। আপনি যা করতে চান, করুন।'

—'কেন তুমি এখানে নরহত্যা করো?'

—'সে-কথাও কি বলতে হবে? আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি?'

—'খানিক খানিক বুঝতে পেয়েছি বৈকি! কিন্তু এই সব নরহত্যার ফলে তোমার কি লাভ?'

—'বিশ্বাস করুন, আমার কোনই লাভ নেই।'

—'আচ্ছা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করছি। কিন্তু তুমি অপরাধ স্বীকার করছো তো?'

—'অস্বীকার করবার আর তো কোন উপায় নেই হুজুর।'

এমন সময়ে দেখা গেল দুইজনের বদলে চারজন চৌকিদারের সঙ্গে সুন্দরবাবু তাঁর বিপুল ভুঁড়ি নিয়ে হাঁস্‌ফাঁস্ করতে করতে স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করছেন অতি দ্রুতপদে!

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে আলিকে দেখেও সুন্দরবাবু প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে দেখছি, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেরেণ্ডা ভাজছ কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আলির সঙ্গে একটু গল্প-টল্প করছি।'

—'বটে! এখন আমাকে কি করতে বলো?'

—'আপনিও আলির সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করুন না!

—'এইজন্যেই কি আমাকে এখানে আসতে বলেছো?'

—'ঠিক তাই।'

—'এটা কোন্-দেশী ঠাট্টা?'

—'মোটেই ঠাট্টা নয়।'

সুন্দরবাবু কট্‌মট্‌ করে তাকালেন জয়ন্তের মুখের পানে।

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমরা আলির সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই স্টেশনে এসেছি।'

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'মানে?'

—'আলিকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি শনি-মঙ্গলের গুপ্তকাহিনী শুনতে পাবেন।'

—'হ্যাঁ আলি, এ-কথা কি সত্য?'

আলি হেঁটমুখে চুপ করে রইল।

জয়ন্ত বললে, 'চলুন, আলিকে নিয়ে আমরা মহেন্দ্রবাবুর কাছে যাই। তার কাহিনীটা মহেন্দ্রবাবুকেও শোনানো দরকার।'

আলি সঙ্কুচিত ভাবে বললে, 'বাবুজীর কাছে কি আমাকে নিয়ে না গেলেই নয়?'

—'না। তোমার কীর্তির কথা শুনে তোমার মনিব কি বলেন, সেটাও আমাদের জানা দরকার!'

## নবম পরিচ্ছেদ

### শেষ-দৃশ্য

জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু প্রভৃতি যখন মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলো, তিনি তখন স্বহস্তে করছিলেন ফুলগাছের সেবা।

জয়ন্তের পানে তাকিয়ে মহেন্দ্রবাবু সহাস্যে বললেন, 'একি, মেঘ না চাইতে জল। আপনি এসেছেন অনাহুত অতিথির মতো!' তারপরেই দলের আর সবাইকে দেখে তাঁর মুখে ফুটে উঠল অধিকতর বিস্ময়ের রেখা।

জয়ন্ত বললে, 'আলিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন বুঝি?'

—'তা একটু হয়েছি বৈকি!'

—'কেন?'

—আমার কাছে ছুটি নিয়ে আলি আজ সকালের গাড়িতেই কলকাতায় যাবে বলেছিল।'

—'আলির আজ কলকাতায় যাওয়া হলো না।'

—'ও, তাই নাকি?'

—'আলি বোধহয় এ-জীবনে আর কখনো কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পাবে না।'

—'কেমন করে জানলেন?'

—'আলির কাহিনী শুনলে আপনিও ঐ-কথা বলবেন।'

মহেন্দ্রবাবু একবার আলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। আলির মুখে ভাবান্তর নেই।

জয়ন্ত বললে, 'আলি, এইবার তোমার কাহিনী আমরা সবাই মিলে আর একবার শুনব।'

মহেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে আলিরও এমন কাহিনী আছে যা আমি জানি না? বেশ, বেশ, আমি শুনতে রাজী!

কিন্তু আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে—দেখছেন, আমার হাতে লেগেছে মাটি আর কাদা? বাড়ির ভিতরে গিয়ে আগে হাত-দুটো ধুয়ে ভদ্রলোক হয়ে আসি, কি বলেন?'

মহেন্দ্রবাবু প্রস্থান করবার উপক্রম করলেন। জয়ন্ত তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'হাত ধোবার জন্যে অতটা ব্যস্ত হবেন না মহেন্দ্রবাবু।'

মহেন্দ্রবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ-কথা কেন বলছেন!'

—'এখন হাত ধুয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না। কারণ আলির কাহিনী শোনবার আগে আপনাকে আমার কাহিনীও শুনতে হবে।'

—'ও, আপনারও কাহিনী আছে বুঝি? বেশ, হাত ধুয়ে এসে তাও শুনব।'

—'উঁহু!'

—'মানে?'

—'হাত না ধুয়েই আপনাকে আমার কাহিনী শুনতে হবে!'

—'এ যে অভদ্র আবদার।'

—'এখন ভদ্রতা করতে গেলে পরে পস্তাতে হবে।'

—'কী বলছেন!'

—'এখন বাড়ির ভেতরে হাত ধুতে গেলে আপনাকে আর খুঁজে পাবো না!'

—'আমি কি কর্পূর? উপে যাব?'

জয়ন্ত রুক্ষস্বরে বললে, 'আপনার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করতে পারব না। ঐখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কথা শুনুন!'

আচম্বিতে পিছনে একটা গোলমাল উঠল—'পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো! আসামী ভাগ্‌তা হায়!'

জয়ন্ত চমকে পিছন ফিরে দেখলে, বাগানের ফটকের দিকে আলি দৌড় মেরেছে হরিণের মতো এবং তার পিছনে পিছনে ছুটছে চৌকিদাররা, মানিক এবং সুন্দরবাবু!

তারপরেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখলে মহেন্দ্রবাবুও বেগে ধাবিত হয়েছেন নিজের বাড়ির দিকে। জয়ন্তও তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করতে দেরি করলে না।



মহেন্দ্রবাবু বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন—পিছনে পিছনে জয়ন্ত।

মহেন্দ্রবাবু দোতলায় উঠে একখানা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন সশব্দে। বন্ধ দ্বারের উপরে গিয়ে জয়ন্ত মারলে এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

এক, দুই, তিন ধাক্কার পর দড়াম করে খুলে গেল দরজা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা সোফার উপরে বসে মহেন্দ্রবাবু হাসছেন শিশুর মতো সরল হাসি!

জয়ন্ত তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'মহেন্দ্রবাবু, অতঃপর?'

—'অতঃপর কি?'

—'অতঃপর ধরা দেবেন, না আরো কিছু কার্দানি দেখাবেন?'

মহেন্দ্রবাবু নীরবে হাসতে লাগলেন।

—'ও হাসি দেখে আমি আর ভুলব না।'

—'কি করবেন?'

—'আপনাকে গ্রেপ্তার।'

—'পারবেন?'

—'গ্রেপ্তার তো করেছি!'

—'না!'

—'এখনো পালাবার আশা রাখেন?'

—'রাখি বৈকি!'

—'বটে!'

—'হ্যাঁ, ঐ দেখুন!'

মহেন্দ্রবাবু মেঝের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখলে সেখানে পড়ে আছে একটা খালি শিশি।

—'আপনি বিষ খেয়েছেন?'

—'ঠিক!' মহেন্দ্রবাবু দুই চোখ মুদে সোফার উপরে এলিয়ে পড়লেন।

—'মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্রবাবু!'

ক্ষীণকণ্ঠে ক্ষীণতর হাস্য করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না। এই আমি পালালুম!'

ঘরের ভিতরে যখন সুন্দরবাবু এবং মানিকের আবির্ভাব হলো, মহেন্দ্রবাবু তখন ইহলোকে দেহ ফেলে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছেন।

—'হুম্, মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছ দেখছি!'

—'না, ধরতে পারি নি।'

—'ঐ তো মহেন্দ্রবাবু!'

—'না, ওটা মহেন্দ্রবাবুর মৃতদেহ।'

—'মৃতদেহ!'

—'হ্যাঁ। মহেন্দ্রবাবু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।'

সুন্দরবাবু অবাক!

—'মানিক, আলি ধরা পড়েছে?'

—'পড়েছে। বলে, সে নিজে পালাবার জন্যে পালায় নি, আমাদের অন্যমনস্ক করে মহেন্দ্রবাবুকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই সে নাকি পলায়নের চেষ্টা করেছিল।'

—'খুব সম্ভব সে মিথ্যা বলে নি। মহেন্দ্রবাবু নিজেই বলেছিলেন, আলি এমন প্রভুভক্ত যে তাঁর কথায় সে প্রাণ দিতে পারে। আর এই মামলাটাই আলির প্রভুভক্তি বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করবে। কারণ সে যে মানুষের পর মানুষ খুন করেছে কেবল তার প্রভুর হুকুমেই, এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই!'

সুন্দরবাবু বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'বাপ্, দেখে-শুনে আমার আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে। এ-সব কী! কোথায় ডাকাতে-কালীর মন্দিরে ভৌতিক কারখানা, আর কোথায় এই আলি, আর কোথায় ঐ মহেন্দ্রবাবু! এখনো আমি বুঝতে পারছি না, এগুলোর মধ্যে যোগাযোগ আছে কোথায়! জয়ন্ত, অন্ধকারে তাড়াতাড়ি আলো দেখাও!'

জয়ন্ত বলতে লাগল:

'গোয়েন্দার পয়লা নম্বরের কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমেই সকলকেই সন্দেহ করা!

আমি গোড়া থেকেই মহেন্দ্রবাবুর বড় বাড়ি, মোটর গাড়ি, মোটা ব্যাঙ্কের খাতা আর শিশুর মতোন সরল হাসিখুশি-মাখা মুখ দেখে ভুলিনি। আপনার মনে আছে কি, আমার প্রশ্নের উত্তরে মহেন্দ্রবাবু

নিজেই বলেছিলেন তাঁর মামাতো ভাই সুরেনবাবুর তিনি ছাড়া আর কোন আত্মীয়ই নেই? আর সুরেনবাবুর মাসিক আয় ছিল যে আট হাজার টাকা সেটাও আপনি শুনেছেন।

আমার অনুমান করতে দেরি লাগল না যে, সুরেনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হবেন মহেন্দ্রবাবুই। অতএব ধরে নিলুম যে সুরেনবাবুর মৃত্যুতে মহেন্দ্রবাবুরই লাভ হবে সব চেয়ে বেশি। এই মামলায় মহেন্দ্রবাবুর কোন হাত যদি থাকে তাহলে হত্যাকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, গোড়া থেকেই আমি মহেন্দ্রবাবুকে কেন্দ্র করে মামলাটাকে সাজাবার চেষ্টা করেছি মনে মনে।

কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই মামলার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব বলেই বোধ হয়েছিল। কারণ প্রথমত, সুরেনবাবু যখন হত্যাকারীর হাতে মারা পড়েন, মহেন্দ্রবাবু যে তখন অনেক সাক্ষীর সামনে নিজের বাড়িতেই বসেছিলেন, এটা জানতে পারা গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঘটনাস্থলে কেবল মহেন্দ্রবাবুর মামাতো ভাই সুরেনবাবুই নিহত হন নি, পরে আরো দু-জন পুলিশ কর্মচারীকেও সেইখানে প্রাণ দিতে হয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির পরেও অকারণে দু-দুজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে তিনি নিজের বিপদ তিনগুণ বাড়িয়ে তুলতে চাইবেন কেন? তৃতীয়ত, মামলাটার সঙ্গে রয়েছে একটা প্রাচীন প্রবাদ আর অলৌলিক কাণ্ডের সম্বন্ধ। ঐ প্রবাদ মহেন্দ্রবাবুরও জন্মের আগে এ-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাই এখানকার লোকেরা শনি-মঙ্গলবারের রাতে কখনো ঐ মন্দিরের ছায়া মাড়াতেও ভরসা করত না। উপরন্তু প্রবাদেই প্রকাশ. আগেও নাকি কেউ কেউ শনি-মঙ্গলবারের রাতে প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্যে ঐ মন্দিরে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

সুন্দরবাবু, আপনি যে কল্পনাশক্তিকে বরাবরই নিন্দা করে এসেছেন, আর আমি যাকে বরাবরই বলে এসেছি গোয়েন্দার পক্ষে

অপরিহার্য, সেই কল্পনাশক্তিকেই প্রাণপণে ব্যবহার করবার চেষ্টা করলুম। গোড়ার দিকে তা প্রকাশ করলে সকলেই যে তাকে উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিতেন, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

মামলাটাকে আমি সাজালুম এইভাবে ঃ

মহেন্দ্রবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকতেও পারেন। তাঁর হুকুমে অন্য কোন লোক গিয়ে নরহত্যা করতে পারে।

হত্যাগুলো যে হচ্ছে কোন অলৌকিক কারণে, সকলের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলবার জন্যে ঘটনাস্থলে হত্যার পর হত্যা করা হয়েছে কেবল দুই নির্দিষ্ট দিনে!

তার ফলে কারুর দৃষ্টি আসল অর্থাৎ প্রথম হত্যার উদ্দেশ্যের দিকে আকৃষ্ট হবে না।

চলতি ও পুরানো প্রবাদটাকে মহেন্দ্রবাবু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অত্যন্ত চতুরের মতোন ব্যবহার করেছেন। কালী-মন্দিরের প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করতে গিয়ে আরো কেউ কেউ যে মৃত্যুমুখে পড়েছে খুব সম্ভব এটা হচ্ছে একেবারে বাজে কথা। ও-ভাবে লোকের মৃত্যু রূপকথাতেই শোভা পায়, বাস্তব জীবনে নয়।

কল্পনায় এই যে আমি একটা কাঠামো গড়ে তুললুম, মামলার মধ্যে ভালো করে প্রবেশ করবার পর তা একেবারে অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সেজন্যে আমি হতাশ হলুম না। নতুন নতুন বিরোধী সূত্র পেলে আমি আবার কল্পনায় নতুন নতুন কাঠামোই গড়বার চেষ্টা করতুম। কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রথম কাঠামো হয়নি ব্যর্থ।

এইবার ঘটনাগুলো একবার পরে পরে ভেবে দেখুন। খুব সম্ভব বাইরে ঐশ্বর্যের জাঁকজমক থাকলেও ভিতরে ভিতরে মহেন্দ্রবাবুর অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়েছিল। কারণ তা নইলে কেউ এমন বিপজ্জনক হত্যার পর হত্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না।

অতএব ধরে নিন্, অর্থকষ্ট ঘোচাবার জন্যে মহেন্দ্রবাবুর কুদৃষ্টি

পড়ল সুরেনবাবুর উপরে—যে সুরেনবাবুর মৃত্যু হলেই তাঁর বিপুল বিত্তের মালিক হবেন তিনিই।

মহেন্দ্রবাবু জানতেন, সুরেনবাবু হচ্ছেন অত্যন্ত সাহসী, বেপরোয়া আর একরোখা লোক—কোন রকম কুসংস্কারকেই তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, বরং কুসংস্কার যে মিথ্যা সেইটেই দেখিয়ে দিতে চান হাতে-নাতে।

অতএব এক শনিবারের রাত্রে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে হলো সুরেনবাবুর নিমন্ত্রণ। চারিদিকে বহু সাক্ষী—এমন কি একজন পুলিশ কর্মচারীও যখন উপস্থিত, মহেন্দ্রবাবু তখন সুরেনবাবুকে উত্তেজিত করবার জন্যে প্রবাদ কাহিনীটিকে উজ্জ্বল ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন। কারণ তিনি জানতেন, তাঁর কাহিনী শুনলেই সুরেনবাবু প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবেন না। ইতিপূর্বেই তাঁর চর ছিল মন্দির-পথে যথাস্থানে গিয়ে হাজির।

মহেন্দ্রবাবু যা ভেবেছিলেন তাই হলো। সুরেনবাবু মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু আর ফিরে এলেন না।

মহেন্দ্রবাবু জানতেন হত্যার পরেই ঘটনাস্থলে হবে পুলিশের আবির্ভাব। নিশ্চয়ই বিশেষ করে ঐ দুই নির্দিষ্ট দিনেই পুলিশের লোক যাবে সেখানে তদন্ত করতে। কিন্তু তদন্তে প্রবাদের সত্যতা বজায় রাখবার জন্যে তারা যাতে ফিরে না আসে সে ব্যবস্থাও হলো।

সুন্দরবাবু, আপনি জানেন, পাছে শনি-মঙ্গলের রাতে আমরাও মন্দির-পথে যাই, সেই ভয়ে মহেন্দ্রবাবু বেছে বেছে ঐ দু-দিনেই আমাদের করতেন নিমন্ত্রণ। আমি আন্দাজ করলুম আমাদের মতোন বিখ্যাত ( আমরা যে বিখ্যাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ) লোকদের প্রবাদের সত্যতা প্রমাণিত করবার জন্যে তিনি যদি হত্যা করতে বাধ্য হন, তাহলে চারিদিকে উঠবে বিষম আন্দোলন—আর সেটা হবে তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই তিনি চেষ্টা করতেন, এই দুই সাংঘাতিক দিনে আমাদের বন্দী করে রাখতে।

যাক্, আমার কল্পনার কথা ছেড়ে দিন, এইবারে বাস্তব জগতে ফিরে আসাই ভালো।

সুন্দরবাবু, আপনি কলকাতায় প্রথম দিন আমার কাছে গিয়ে এই মামলা সম্পর্কীয় যে অলৌকিক আবহের কথা বলেছিলেন, আমি তা মোটেই আমলে আনিনি! তবে আপনার বর্ণনার ভিতর থেকে আমি আবিষ্কার করেছিলুম একাধিক সূত্র।

আপনি বলেছিলেন, যে-তিনজন লোক নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই দেহের বামদিকে ছিল ক্ষত চিহ্ন। আর তারা নাকি নিহত হয়েছিল ঠিক একই জায়গায় গিয়ে। তাই থেকেই আমি ধরে নিলুম, মৃত্যুর কারণ এসেছে বাম দিক থেকেই। সেইজন্যেই প্রথম যেদিন আমরা মন্দির-পথের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন আমি আর কোন দিকে না তাকিয়েই একেবারে প্রবেশ করলুম বামদিকের জঙ্গলে। আমার আন্দাজ যে ব্যর্থ হয়নি, এ-কথা আপনি জানেন। জঙ্গলের ভিতরে খানিকটা অগ্রসর হয়েই একজায়গায় দেখতে পেলুম অনেকগুলো পদচিহ্ন। আমি তখনি বুঝতে পারলুম, খুনী অপেক্ষা করে এইখানে এসেই। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে আমি মন্দিরে যাবার পথটা দেখবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম, জঙ্গলের অল্প একটু ফাঁক দিয়ে সেখান থেকে মন্দির-পথের উপরে অনায়াসেই দৃষ্টি রাখা যায়। আন্দাজে বুঝলুম, এই ফাঁক দিয়েই হত্যাকারী তার মৃত্যু-অস্ত্র নিক্ষেপ করে।

কিন্তু সে অস্ত্রটা কি? প্রত্যেক লাসের বামদিকে পাওয়া গিয়েছে খুব সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন। প্রত্যেক মৃতব্যক্তির দেহে প্রকাশ পেয়েছে বিষের চিহ্ন। সুতরাং বুঝে নিলুম খুনী এমন কোন বিষাক্ত অস্ত্র ব্যবহার করে, যার কথা অনুমান করা কঠিন। সে অস্ত্রটা কি? পদচিহ্নগুলোর পাশে-পাশে দেখতে পেলুম অদ্ভুত সব ফাঁপা লাঠির দাগ, এই কি খুনীর অস্ত্র? কিন্তু সে যে কি রকম অস্ত্র অনেক ভেবেও তা আন্দাজ করতে পারলুম না।

তারপর এক শনিবার রাত্রে মন্দিরের চাতালে গিয়ে আমরা দেখতে পেলুম একটা অদ্ভুত মূর্তিকে—যার মুখ হচ্ছে অমানুষিক আর যার হাতে আছে একটা লাঠি। যদিও সে লাঠিটা আসলে যে কি জিনিস তখন আমি সেটা ধরতে পারিনি, কিন্তু তার অমানুষিক মুখের জন্যে দায়ী যে কোন বীভৎস মুখোশ, সেটা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন হলো না।

হত্যাকারী আর তার প্রভু বুঝলে, জয়ন্ত নামে কোন শৌখীন গোয়েন্দা শনিবারের রাত্রে ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। কেবল তাই নয়, ছদ্মবেশ ধরলেও হত্যাকারীকে সে দেখতে পেয়েছে সচক্ষে।

তাদের টনক নড়ল। তাই রবিবার প্রভাতেও দুরাচার জয়ন্তকে এমনভাবে হত্যা করবার চেষ্টা হলো, লোকে যাতে ভাবে সেটা দৈব-দুর্ঘটনা।

ইতিমধ্যে আমি আবার আমার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করলুম। তার ফলে অনুমান করলুম, হত্যাকারী যে অস্ত্র ব্যবহার করে দেখতে তা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড নয়। সূক্ষ্ম ক্ষত, অতএব সূক্ষ্ম অস্ত্র এবং খুব সম্ভব নীরব বিষাক্ত অস্ত্র। কোমল মাংস ভেদ করতে পারলেও কঠিন জিনিস ভেদ করবার শক্তি তার নেই। তাই পরের মঙ্গলবারের রাত্রে সুকঠিন লৌহবর্ম পরিধান করে ঘটনাস্থলে হলো জয়ন্তের আবির্ভাব।

যা ভেবেছিলুম হলো তাই! একটা শলাকা এসে আমার বর্মকে ভেদ করতে না পেরে সশব্দে মাটির উপরে পড়ে গেল। আগে আগে অস্ত্র প্রয়োগ করে হত্যাকারী সেইখানেই অপেক্ষা করত। তারপর বিষের প্রভাবে যখন আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতো তখন সে জঙ্গলের বাইরে এসে শলাকাটি ক্ষতস্থান থেকে খুলে নিয়ে আবার হতো অদৃশ্য।

কিন্তু এবারে তা আর হল না। তার অস্ত্র যেই আমার বর্মের উপরে এসে পড়ল, তখনি আমার রিভলবার ঘন-ঘন উদ্গার করতে

লাগল উত্তপ্ত 'বুলেট'। হত্যাকারী প্রাণভয়ে পলায়ন করলে। আমি খুঁজে পেলুম সেই শলাকাটিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। সে-শলাকা আমি চিনি—কারণ আমি বেড়িয়ে এসেছি বোর্নিও দ্বীপে! সে শলাকা হচ্ছে 'ব্লো-পাইপ'-এর মৃত্যুবাণ।

ভাবতে লাগলুম। ভারতবর্ষে 'ব্লো-পাইপ'-এর ব্যবহার কখনো তো শোনা যায়নি। এটা কি করে সম্ভবপর হলো।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল মহেন্দ্রবাবুর ড্রাইভারের কথা। তিনি নিজেই বলেছিলেন, তাঁর মোটর গাড়ির চালকের জন্মভূমি হচ্ছে বোর্নিও দ্বীপ।

আমার কল্পনা যে-কাঠামো গড়ে তুলেছিল তাই কোন জায়গাই আর অপূর্ণ রইল না। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল ছবির পর ছবি!

আর একটা সত্য আন্দাজ করলুম। হত্যাকারী যা কখনো করেনি আজ তাই করেছে। অর্থাৎ তার মৃত্যুবাণটিকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখেই সে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে! আর সেই মৃত্যুবাণ যে জয়ন্তের হস্তগত হয়েছে, তার পক্ষে সেটুকু অনুমান করাও কঠিন নয়। অস্ত্র যখন পুলিশের হস্তগত, কোন রকম অলৌকিক আবহই তখন আর কাজে লাগবে না।

এতএব মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন,—'আলি, তুমি এইবেলা পলায়ন করো। কালকের সকালের ট্রেনেই এই ক্ষুদ্র গ্রাম ত্যাগ করে তুমি ভারতবর্ষের মানব-সাগরে তলিয়ে যাও! তোমাকে আবিষ্কার করতে না পারলে পুলিশ আমার ছায়াকেও স্পর্শ করতে পারবে না।'

দেখছেন সুন্দরবাবু, এ-বাণীও আমি শুনেছিলুম কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে? কিন্তু বাস্তব জগতে এসেও আমার কল্পনা যে বিফল হয়নি, তার প্রমাণ তো পেয়েছেন আপনি আজ সকালেই স্টেশনে গিয়ে? আলি বাধ্য হয়ে অপরাধ স্বীকার করেছে। মহেন্দ্রবাবু

বাধ্য হয়ে পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে আত্মহত্যা করেছেন আর আপনিও এখন বাধ্য হয়ে শ্রবণ করছেন বাস্তব জগতে কতখানি কাজ করতে পারে এই বহু-নিন্দিত কল্পনা!

বলুন, আপনার আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

দুই বাহু বিস্তার করে জয়ন্তকে আলিঙ্গন করে সুন্দরবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'হুম্। তুমি হচ্ছ 'জিনিয়াস্'—অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী। তোমার কাছে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে ভাই, আমি আগে ছিলুম তোমার অনুরাগী—আজ থেকে হলুম তোমার গোঁড়া ভক্ত!'